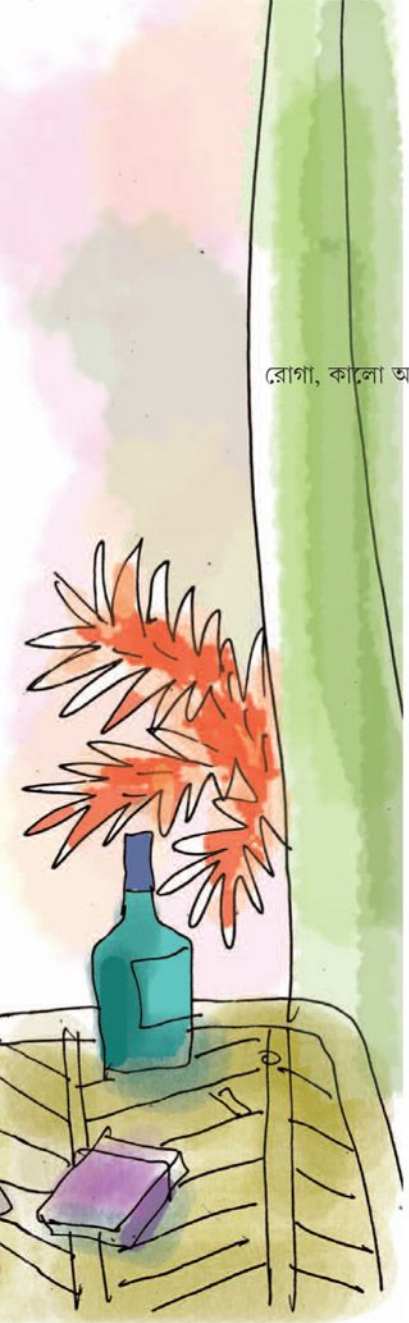

কবি ও কাহিনি

পারমিতা ঘোষ মজুমদার

রোগা, কালো আর বেঁটে মেয়েদের নাকি ভাল বিয়ে হয় না। তাহলে ঋষিকার

'ভাল বিয়ে' হল কী করে! যতই হৃদয়-টিদয় দিয়ে মন্তর পড়া হোক, আসলে মেয়েদের বিয়ে মানে তো এক এলেমদার, টাকাওয়ালা, বডিগার্ড পাকড়াও, যে কি না সারা জীবন ভাল খাওয়াবে, পরাবে। ঋষিকার বিয়ে সে অর্থে যথার্থ ভাল এক বিয়ে। ঋষিকার স্বামী সমুদ্র একাধারে হ্যান্ডসাম ও সফল। নিউ আলিপুরে জম্পেশ বাড়ি। চাকরি করে সেক্টর ফাইভে। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সেই কিনে ফেলেছে আট লাখ টাকার গাড়ি। স্থাবর সম্পত্তি বলতে এসব। কিন্তু বাঙালির সহজে মন ভরে না। স্থাবরের সঙ্গে অস্থাবর ও অন্যান্যও দাবি করে। কাঠখোট্টা ভাবনায় ডুবে থাকা মানুষ বাঙালির মতে ইনসেনসিটিভ ও ক্রুড। একছটাক কালচার, পোয়াটাক সাহিত্য-শিল্পবোধ, সিকিটাক অনুভবী মন...এসবও বাঙালির মতে অপরিহার্য। তা যাই হোক, সমুদ্র এই সব ধোঁয়াটে পরীক্ষাতেও রীতিমতো সসম্মানে উত্তীর্ণ। তার সব বিষয়ে অপার কৌতূহল। তাই হাতে সময় পেলে সে ঠিক নাটক-নভেল না-পড়ে একটু ভারী বই নাড়াচাড়া করতে ভালবাসে। যেমন, ব্রেখটীয় নাট্যপদ্ধতি নিয়ে ইদানীং সে মেতে উঠেছে। বাড়িতে কিনে নিয়ে আসছে নাট্যকলা বিষয়ের নানা ধরনের বই। তার বাড়িতে ওয়ার্ল্ড সিনেমার দুরন্ত কালেকশন দেখে যে-কোনও নাকউঁচু সিনেমা-বোদ্ধাও ভ্রু কপালে তুলবেন। তাছাড়াও তার অন্তত তিনজন বাঙালি কবির সঙ্গে পরিচয় আছে এবং একজনকে সে বেশ কাছ থেকেই চেনে। তাকে অত সহজে সদা লাভ-লোকসান কষে চলা, শিল্প-নির্লিপ্তর ল্লাটে ফেলবে কে!

বাঙালি যেসব চিহ্ন দেখে কোনও অধমকে ইন্টেলেকচুয়াল বলে মেনে নিতে রাজি হয়, সমুদ্রের মধ্যে সেসব গুণ বেশ ভালমতোই আছে। তবে সমুদ্রর মাথায় টাক নেই। নেই মুখভর্তি বেসামাল দাড়িও। তার ওপর সে কথা বলতে-বলতে চুপ করে গিয়ে সুদূরে তাকিয়ে থাকে না। এবং সেই চেয়ে থাকার সুযোগে মেয়েও দেখে না! বোঝাই যাচ্ছে প্রকৃত আঁতেলদের অতি পরিচিত কয়েকটি গুণাবলি তার মধ্যে অনুপস্থিত। কিন্তু ঋষিকার আবার এই মেয়ে না-দেখাটা ঠিক পছন্দ নয়। ওর মনে হয়, এত বেশি-বেশি আর ভাল-ভাল একটু অস্বাভাবিক নয় কি? ওর আরও অপছন্দ সমুদ্রের দু'টো অভ্যাস। এক, নিজের শার্ট নিজে ভাঁজ করা আর ট্যুরে যাওয়ার আগে নিজের ব্যাগ নিজে গোছানো। কোনও আদেশ, আবদার নেই তার ঋষিকার প্রতি। এও কি ভাল! নাঃ, ঋষিকার ভাল লাগে না। যতই সবাই মেনে নিক, বিয়ের বাজারে রোগা ও কালো ঋষিকা সফল, ঋষিকার এই বিয়েতে কেমন যেন দমচাপা লাগে। বা একটু ঘুরিয়ে বললে, এক্ষেত্রে ঋষিকার সফল বিয়েই তার অসুখের কারণ। নিন্দুকেরা অবশ্য ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারে না। তারা ভাবে, এ ঋষিকার ন্যাকামি। বায়বীয় দুঃখ-বিলাস। কিন্তু ঋষিকা মনে-মনে বিশ্বাস করে, সে বিয়ের বাজারে দাঁও মেরে ঠিক কাজ করেনি। এত ভাল বিয়ে বোধহয় তার না হলেই ভাল ছিল। আসলে শেষ বিচারে হারজিত মনের অঙ্ক। ঋষিকা নিজেই নিজেকে হেরো ভাবতে অভ্যস্ত। তাই দশে দশ সমুদ্রর পাশে নিজেকে সে মনে-মনে দশে সাড়ে তিন দিয়ে রেখেছে।

সমুদ্রর কিন্তু এসব নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই। বউকে সে ভালবাসে। তাকে নিয়ে বউয়ের কমপ্লেক্সের কথা সে মাঝেমাঝে অনুভব করলেও ইচ্ছে করেই প্রসঙ্গটা কখনওই তোলে না। এড়িয়ে যায়। সে

জানে, এ সব ব্যাপার খুব জটিল। কথায় কথা বাড়বে, সমাধান হবে না কিস্যু। ব্যস্ত পুরুষ মানুষের এই এক সুবিধে। কাজের মধ্যে ডুবে থেকে তারা অনেক কিছু ভুলে থাকতে পারে। তাতে মন খারাপের সুরাহা না হলেও, ঝামেলা থেকে দূরে থাকা যায়। ঋষিকারও ব্যস্ততা আছে। তবে সমুদ্রর মতো অত ব্যস্ত নয়, যে নিজের জীবন নিয়ে ভাবার সময় পায় না। ঋষিকা টিভি সিরিয়ালের চিত্রনাট্য লেখে। বাড়িতে থেকেই লেখে বেশির ভাগ সময়। ইদানীং কিছু-কিছু অভিনয় করছে বলে শুটিংয়েও যেতে হয়। আর সব কাজের মাঝে তার মনটা কেমন করে ওঠে... বিয়েটা অসম... আরও সাধারণ কোনও ছেলেকে বিয়ে করলে সে হয়তো আরও বেশি সুখী হত... সে দশে তিন সাড়ে তিন! বিধ্বংসী, মনভার করা ভাবনা সময়-অসময় মানে না। যখন-তখন ভাড়াটে খুনির মতো সন্তর্পণে হানা দেয়, তছনছ করে আহ্লাদ আর সুখ।
এই আজও যেমন এল।

ঋষিকা, যাকে সিরিয়াল-বাজার আদর করে ডাকে 'ঋ' বলে, আলোছায়া শুটিং ফ্লোরে বসে বসে নিজের লেখা একটা এপিসোড সাজাচ্ছিল। বিয়ে, সংসার, প্রেম নিয়েই কারবার তার। ডায়লগ-জুড়ে সাদা বনাম কালোর লড়াই। সতীর জিৎ, অসতীর হার। তার মাঝে নিরীহ ডোরবেলের মতো ডাক দিয়ে গেল সমুদ্রর মেসেজ। ঋষিকার মন এলিয়ে পড়ল ফের।
সমুদ্রর আবার একটা প্রোমোশন হয়েছে। আর কত উপরে উঠবে ও! কাগজের ওপর তার কলম থেমে যায়। অন্যমনস্ক ঋ 'ভদকা' লিখতে গিয়ে 'ভরদীয়' লিখে ফেলে! কাগজ, কলম রেখে ঋ উঠে পড়ে ফ্লোরের বাইরে যাবে বলে। হাওয়া খাবে, মাথা থেকে কমপ্লেক্স তাড়াবে—এই ছিল উদ্দেশ্য।
তা অবশ্য হল না।
সিরিয়ালের প্রোডাকশন ম্যানেজার শম্ভু সামন্ত খবর দিল, বিতান বসু মারা গিয়েছেন। সকাল সাড়ে ন'টায়। ম্যাসিভ সেরিব্রাল অ্যাটাক। কবির মৃত্যুর কোনও আঁচ এমনিতে স্টুডিও-পাড়ায় পড়ার কথা নয়। পড়েওনি। কিন্তু বিতানের চেনাশোনার পরিধি ছিল ছড়ানো। শম্ভু সামন্ত, যার সঙ্গে কবিতার কোনও যোগাযোগ নেই, সেও দাবি করল, বিতানকে সে নাকি কাছ থেকে চিনত। চোখ ছলছল না করলেও, শম্ভু মিয়ানো গলায় জানাল, এসব লোকেরা দুম করেই মরে। কয়েকদিন আগে দিঘা ঘুরে এসেছে সে আর বিতান। ঋ-র মনে হল, ডিসেম্বরের আকাশটা দুম করে মেঘলা হয়ে গেল। সত্যিই বিতানদা নেই। কবিতার শহর কলকাতা একজন কবির মৃত্যুতে আকাশ থেকে রং মুছে দিল?
সমুদ্রর সঙ্গে বিতানের ভাল পরিচয় আছে, বিতান, দু'-একবার তাদের বাড়িতেও এসেছে। তাছাড়া বিতান একসময় উত্তরবঙ্গে ছিল বেশ কয়েকদিন। ঋ জলপাইগুড়ির মেয়ে। এই উত্তরবঙ্গ কানেকশনের জন্যও বিতানের সঙ্গে তার সখ্য ছিল। সমুদ্রকে খবরটা জানাবে বলে ফোন বের করেছিল ঋ, দেখল সিরিয়াল ডিরেক্টর থমথমে মুখে ওর দিকেই আসছে। ডিরেক্টরের নাম জাগরী লোধ। সবাই ছোট করে তাকে 'জে-লো' বলে ডাকে।
"শুটিং প্যাক-আপ। বিতানদা আর নেইরে ঋ," বলতে-বলতে জে-লোর গলা কেঁপে উঠল। জে-লোর সঙ্গে বিতানের সম্পর্কের কথা সবাই জানে। ঋও। তবু জে-লোর গলা কেঁপে যাওয়াটা ঋ বিশ্বাস করে না। সে মৃদু মাথা নাড়ল সমুদ্রকে মেসেজ লিখতে-লিখতে।
জে-লো যৌবনে কবিতা লিখত। লিটল ম্যাগাজিনও বের করত। সেই সূত্রেই কবির সঙ্গে ভাব হয়েছিল তার এক সময়। গাঢ় বন্ধুত্ব। শহর আর শহরতলির শীতকালীন কবিতা উৎসবে সে তখন সাদা টাঙাইল, সুরেলা গলা, বিতানের লতানে বন্য উদ্ভিদ! বয়স তেইশ। কবিতা, লিটল ম্যাগাজিন আর কবির সঙ্গে প্রেম, কোনওটাই অবশ্য টেকেনি। এখন জে-লো একজন জবরদস্ত সিরিয়াল মেকার। মানি, মেদ ও মদের মোহজালে খরখরে গলার মধ্যযৌবনা। তবু জে-লোর সঙ্গে বিতানের যোগাযোগটা থেকেই গিয়েছিল। পুরনো সম্পর্কের খাতিরে জে-লোর জন্য খান দু'য়েক টেলিফিল্মও লিখেছিল বিতান। বাজার অবশ্য সেসব নেয়নি।
বিতান বসু নব্বইয়ের দশকে ব্যাপক বিখ্যাত হয়েছিল তার রাজনৈতিক কবিতার জন্য। বামপন্থী এই কবির কবিতার লাইন দেখা যেত মিছিলের ব্যানারে, কলেজের দেওয়ালে বা রাজনৈতিক ইস্তেহারে। তবে ইদানীং এই কবিকে আর তেমন দেখা যাচ্ছিল না কোথাও। বাইরে প্রায় বেরতই না বিতান। ছটফটে, ছুরি চমকানো লাইনও বিতানের লেখায় আর তেমন পাওয়া যাচ্ছিল না। তবু বিতানের মৃত্যু একটা খবর বটে। তার ওপর প্রাক্তন প্রেমিক কাম কবিতা-সহযাত্রী। কবির প্রয়াণের খবরে শুটিং প্যাক আপ হয়ে যাবে, এতে খুব অবাক হওয়ার কিছু নেই। গলাকাঁপা মিথ্যে হোক অথবা সত্যি!
জে-লো আজ কালোর ওপর লাল টি-শার্ট আর সবুজ বারমুডা পরে শুটিংয়ে এসেছে। ঋ-র কাঁধে হাত রেখে হতাশ গলায় জে-লো বলল, "এই ড্রেস পরে কী করে যাই বলতো? ওখানে সব চ্যানেল থাকবে, আমার বাইট নেবে... ইস্! কী যে করি! বাড়ি গিয়ে চেঞ্জ করে যেতে-যেতে দেরি হয়ে যাবেরে... মুশকিল হল।"
সিরিয়ালের ড্রেসার নন্দনদা বুদ্ধি দিলেন। সাদা শাড়ি, ম্যাচিং ব্লাউজ় বেরল ড্রেসারের মুশকিল আসান ঝোলা থেকে। হাল্কা লিপস্টিক, মিউটেড আই মেকআপ আর ছোট্ট টিপের মৃত্যু-সই পোশাক পরে নিল জে-লো। সে এখনই বেরিয়ে পড়তে চায় কবির বাড়ির উদ্দেশে, সল্টলেকের উপান্তে। রুক্ষ হাতে চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে বলল, "এ বছর বিতানদার একটা ফাঁড়া ছিল। একত্রিশে ডিসেম্বরের পার্টিতে দেখা হবে কথা হয়েছিল... ওঃ ভাবতেই পারছি না রে... বিতানদা সত্যিই নেই!"
"তুমি কি তোমার গাড়ি নিয়ে যাচ্ছ?" জে-লোর পরিপাটি সাজ দেখে প্রশ্ন করল ঋ।
"হ্যাঁ। কেন? তুই যাবি?"
"না মানে, ভাবছিলাম..."
"চল না। তোর সঙ্গে তো ভালই বন্ধুত্ব ছিল। তোর বাড়িতে মাল-ফাল খেতে গেছে তো কয়েকবার। চল-চল। ইস বিতানটা এত তাড়াতাড়ি চলে গেল কেন রে? উফ, এত মন খারাপ লাগছে!"
মেকআপ সেরে, ডিও স্প্রে করে জে-লো নিজের ও ঋ-এর সর্বাঙ্গে। তারপর গাড়িতে বসে বলল, "কার যে কবে ডাক আসবে! কপাল... কপাল... বুঝলি না, সবই কপাল!"
ঋ কোনও কথা বলল না। জে-লো বলেই চলেছে, "রাজা ছিল রে লোকটা! সম্রাট! মস্তানের মতো বেঁচেছে। আর মস্তানের মতো মরল।"
ঋ ভ্রু কুঁচকে সমুদ্রর উন্নতির কথা ভাবতে-ভাবতে বলল, "রাজা-টাজা নয়। জুয়াড়ি। বিতানদা জীবন নিয়ে জুয়ে খেলেছে। আর ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, হেরেছেও বিস্তর।"

বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধে হচ্ছিল। জে-লো বিভিন্ন লোককে ফোন করতে-করতে ধরে ফেলল তার প্রাক্তন স্বামী, চিরদীপকে। চিরদীপ কবির বাড়িতেই রয়েছে। সে তাদের ফোনে-ফোনে ডিরেকশন দিয়ে কবির বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কাজটা নিল। চিরদীপ নিজে একজন মাঝারি মাপের কবি হলেও সে এসেছে একটা চ্যানেলের তরফ থেকে। ফোনের ফাঁকে-ফাঁকে জে-লো আবার ফেঁদে বসল চিরদীপকে নিয়ে তার মন খারাপ করা-কাহিনি।

চিরদীপের চ্যানেল নাকি জে-লোকে কোনও অনুষ্ঠানে ডাকে না। বলতে থাকে জো-লো, "এ সমাজটা পুরুষ-শাসিত। আমাকে কেউ আমার পরিচয়ে চিনতে চায় না। সবাই আমায় চিরদীপের প্রাক্তন স্ত্রী ভাবতেই অভ্যস্ত।"

ঋষিকা চুপ করে শুনে গেল। মুখে কাঁচুমাচু ভাব। জে-লোর গাড়ি, জে-লোর পেট্রল। শোনা ছাড়া তার উপায় কী! সে একবারও মনে করিয়ে দেয় না তার ডিরেক্টরকে যে, চিরদীপের বউ থাকাকালীন জে-লো তার 'বউ' আইডেনটিটি যথেষ্টই ব্যবহার করেছে এই মাধ্যমে ফুটহোল্ড পাওয়ার জন্য। প্রয়োজনে আমি ওই পুরুষের বউ আবার প্রয়োজন শেষ হলে আমি স্বাধীন নারী—এই অঙ্কটা সবাই বোঝে। এ এমন কিছু কঠিন কোনও তাত্ত্বিক বিষয় নয়। তবে বলার সময় জে-লো এত দরদ দিয়ে বলে যে, ঋষিকা কেমন যেন ধন্দে পড়ে যায়! যত বার শোনে, তত বারই। আজকেও ধন্দ জাগল। তার সঙ্গে মিলল শোক। আর তার নিজস্ব নাছোড় মনভার করা ভাবনা। সব মিলিয়ে ভারী ব্যাজার হল ঋষিকা।

কবি বিতান বসুর বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল চিরদীপ একা নয়, তার সঙ্গে তার বর্তমান প্রেমিকাও আছে। তাকে দেখে জে-লো ফিসফিস করে ঋকে বলল, "দেখেছ, কেমন মেরুনশাড়ি পরে এসেছে... কোনও সেন্স নেই।"

ঋ কোনও কথা না বলে চারপাশ দেখছিল। অনেক লেখক ও কবি একত্র হলে সিগারেটের ধোঁয়া কিছু বেশি হয়, তার ওপর স্যাঁতস্যাঁতে দিন। বাড়ির বেশির ভাগ জানলাই বন্ধ। দু'-একটা খোলা পাল্লা দিয়ে ঢুকছে কুয়াশা। ঋ-র দমবন্ধ হয়ে আসছিল। হাল্কা কাঁপুনিও হল দু'-একবার। কেউ একজন ইনিয়ে-বিনিয়ে কেঁদে চলেছে। শব্দের কুচি মন দিয়ে শুনে ঋষিকা বুঝল, ইনি কবির রাত-দিনের কাজের লোক। আঙুলে ভাগ্য-দোষ কাটাতে আংটি পরা এক কবি চিৎকার করে এলইডি বনাম প্লাজ্মা টিভির গুণপনার বিবরণী দিয়ে চলেছেন, সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক উঠতি ফিল্ম হিরোকে—ঋষিকা কেমন হকচকিয়ে গেল।

এমন পরিবেশ সে আশা করেনি। বিতানের বন্ধুরা তাহলে তত ভেঙে পড়েনি। বাড়িতে পা দেওয়া মাত্র জে-লো কোথায় হাওয়া হয়ে গেল, ঋ খেয়াল করেনি। উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক দেখছিল সে। এখানে জমায়েত হওয়া কবি, সাহিত্যিক বা কবির সঙ্গীদের কাউকেই চেনে না ঋ। সদর দরজা পেরিয়ে খানিকটা গিয়ে সামনে একটা ফাঁকা ঘর। সেখানে দাঁড়িয়ে ঋষিকা একবার ভাবল বিতানদার মৃতমুখ দেখে আসবে একবার? শেষবারের মতো? গত মাসেই তো বিতানদার সঙ্গে একটা শুটিং ফ্লোরে দেখা হয়েছিল তার। আকণ্ঠ মদ খেয়ে বিতানদা একদম উল্টোপাল্টা বকছিল। আর কথা বলতে-বলতে বেদম হাঁফাচ্ছিল। ঋ-র খুব কষ্ট হয়েছিল সেদিন বিতানদাকে দেখে। কোথায় গেল বিতানদার সেই দেবদুর্লভ রূপ, ইস্পাতের মতো তীক্ষ্ণ মেধা আর চাবুকের মতো লেখনী? ঋ সেদিন হাঁ করে তার একদা প্রিয় কবিটিকে দেখছিল আর বোঝার চেষ্টা করছিল, মানুষকে কে খায়? সময়? ভবিতব্য? নাকি আরও গভীর, আরও রহস্যময় কিছু, যা বুঝতে-বুঝতে জীবন পেরিয়ে যাই আমরা! বিতানদার অত্যধিক মদ খাওয়া বা নারীসঙ্গ করা নিয়ে ঋ-র কোনও দিন কোনও মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু নেশার চক্করে লেখাই যদি বরবাদ হল, তাহলে তা বড় অপচয়। কিংবা নেশা-টেশা অজুহাত মাত্র। বিতানের লেখা হয়তো এমনিই ফুরিয়ে গিয়েছিল। তবু, অগণিত গুণমুগ্ধের মতো, ঋ বিশ্বাস করতে চাইত, তার প্রিয় কবি আবার একবার জ্বলে উঠবে। কিন্তু তা আর হল কোথায়? 'লোকটা একসময় ভাল লিখত' তকমা নিয়েই বিতানদার এই মরে যাওয়া বড় করুণ অবসান।

"তুমি কেমন আছ বিতানদা?" ঋ দু'পা এগিয়ে গিয়ে বিতানের হাত ধরে বলেছিল। বিতান প্রথমটায় চিনতেই পারেনি তাকে। তারপর হাসল, "ও তুই। খ, লি এ, ঐ! কেমন আছিস রে? তুই তো শুনি আজকাল শাশুড়ি-বউ স্পেশ্যালিস্ট হয়েছিস। ভালই হল তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। জানিস তো খ, আমি আর বেশি দিন বাঁচব না।" ইন্ডাস্ট্রির অনেকেই ঋষিকাকে ঋ বলে ডেকে থাকে। কিন্তু বিতানদা সবসময় ডাকত খ, লি, এ ঐ—এভাবেই। আর মাঝেমাঝে বলত, "খ, লি, এ, ঐ, কী করে কী করি/ কবিফবি পাত্তা দাও না, এই বুঝি মরি!"

বিতানদার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অনেক কথাই শুনেছে ঋষিকা। তিনটে বিয়ে, সারি-সারি মৃত প্রেমের স্তূপ পেরিয়ে বিতানদার বেহিসেবি বেঁচে থাকা। ঋষিকা কোনও দিন বিতানদাকে সেসব নিয়ে কোনও প্রশ্ন করেনি। বাড়িতেও নয়। সমুদ্র এমনিতেই অতি ভদ্র ও ফর্মাল। সেও মুগ্ধতা নিয়েই বিতানের সঙ্গে মিশত। প্রশ্ন নিয়ে নয়। সমুদ্র বলত, "লোকটা প্রশ্ন পছন্দ করে না। কিন্তু তবু কেন যেন লোকটাকে ভাল লাগে।" ঋষিকা একমত হয়েছে। তারও মনে হয়েছে বিতানদা দারুণ জীবন্ত। ঝকঝকে চোখ, চমৎকার চামড়া আর চুলের অধিকারী বিতানদা বাকপটু, মেধাবী। কিন্তু সেদিন তার সেই চেনা বিতানদাকে ঋষিকা কোথাও খুঁজে পায়নি। বিতানদাকে সেদিন শুটিং ফ্লোরে দেখে একটা অদ্ভুত কথা মাথায় এসেছিল ঋষিকার। সে কথাটাই এখন আবার মনে পড়ল তার। আচমকা সেদিন ঋষিকার মনে হয়েছিল, বিতানদার যৌনক্ষমতা চলে গিয়েছে। বিতানদা আর পারে না! কথাটা মনে হওয়ার হয়তো কোনও আপাত-কারণ নেই। বিতানদার সঙ্গে তার কোনও দিন ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই, থাকার কথাও ছিল না। তবু মনে হয়েছিল। ঋষিকার মাথায় এসব অদ্ভুতুড়ে ভাবনা মাঝেমাঝে উদয় হয়। সমুদ্র নিজের শার্ট বা টি-শার্ট নিজেই ভাঁজ করে। ঋষিকাকে ছুঁতে দেয় না। ভীষণ যত্ন নিয়ে প্রায় বাইগ্রস্তের ভঙ্গিতে সমুদ্র শার্ট ভাঁজ করে। সেই ভঙ্গি দেখে ঋষিকার মগচেতনে কী যেন একটা হয়েছিল একবার। মনে হয়েছিল সমুদ্র সমকামী! অসম্ভব পুরুষালি সমুদ্রকে ওই সব ভাবার কোনও মানে হয়!

বিতানদার যৌন-অক্ষমতা নিয়ে কোনও কানাঘুষো কোনওদিন শোনেনি সে। বরং তার মেয়েবাজির গল্পই বেশি শুনেছে। তবে কেন মনে হয়েছিল? বিতানদার চোখদু'টো নিবু-নিবু লেগেছিল তার। হঠাৎ ঋষিকার, এই দমবন্ধ পরিবেশে কেমন লজ্জা হতে থাকে। পাশের ঘরে বিতানদার দেহ শোওয়ানো। লোকটা 'শুতে পারত কি পারত না' ভাবছে সে এখন! ছিঃ!

বিতানদার প্রাক্তন দুই স্ত্রী, কেউ কবি বা লেখক নন। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। আর একজন পড়ান স্কুলে। তাঁরা দু'জনেই আবার বিয়ে করেছেন। কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছিল, বিতানদাও নাকি আবার বিয়ে করেছে। বিদেশে থাকেন সেই স্ত্রী। ইঞ্জিনিয়র। বিতানদার কোনও সন্তান নেই। বারান্দার রেলিংয়ে ভর দিয়ে ঋষিকা এবার মাথা ঘোরাল ঘরের দিকে। এ ফ্ল্যাট'টায় দু'টো শোওয়ার ঘর। একটা বসার ঘর। যে-ঘরে বিতানদা থাকত, সে ঘরে মাটি থেকে সিলিং অবধি শুধু বই আর বই। একটা দেওয়ালে সমাজতন্ত্রের মহান এক তাত্ত্বিক নেতার ফোটোগ্রাফ। অন্য দেওয়ালে বিতান আর রাজ্য রাজনীতির এক দাপুটে নেতা। দু'জনেই হাসছেন ফোটোর ফ্রেমজুড়ে। যাকে দেখে হাসছেন, তিনি অবশ্য ফ্রেমের বাইরে। বারান্দা লাগোয়া ঘরটায় দৃশ্য-দূষণের মতো এলিয়ে রয়েছে একটা দামি মাইক্রোওয়েভ চুল্লি। এছাড়া ঘরটা একদম খালি। মাটিতে একখানা শতরঞ্চিও নেই বলে বিতানের বন্ধু বা ভক্ত-পাঠকরা সব ঘরের মেঝেতেই বসে

আছে। মাঝেমধ্যে সেই বৈঠক থেকে গুঞ্জন উঠছে, বিতানের অমোঘ সব কবিতার লাইন। বিতান তাহলে কী-কী রেখে মরে গেল? খানআষ্টেক কাব্যগ্রন্থ, অজস্র বই আর ওই চল্লিখানা? এমন নিঃস্বভাবে মরে যাওয়া ভাল না খারাপ—ঋষিকা কোনও উত্তর পেল না তার প্রশ্নের।

"তোমার চ্যানেল তো আমায় ডাকেই না। এই ইন্ডাস্ট্রি যে কী ভীষণ পুরুষতান্ত্রিক। আমাকে এখনও তোমার প্রাক্তন স্ত্রী-র পরিচয়ে বেঁচে থাকতে হচ্ছে! বল, এটা কি ঠিক?"

ঋ তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে নিল। সুমৌলীর রেখে যাওয়া ফাঁকা জায়গায় এখন দাঁড়িয়ে জে-লো। পাশে চিরদীপ। জে-লো তার নারীবাদী কার্ড বের করেছে এবার। জে-লোর অনেক আইডেনটিটি আছে। সময়-সময়ে বিভিন্ন কার্ড বেরয়। এতক্ষণ জে-লোর অন্য চ্যানেলে বাইট-টাইট দেওয়া শেষ হয়েছে বোধহয়। এবার চিরদীপের চ্যানেলে লাইন করছে সে। ঘাড় ঘুরিয়ে ঋ দেখল, জে-লো গাঢ় চোখে তাকিয়ে আছে চিরদীপের দিকে। চিরদীপ ইদানীং পাইপ খাওয়া ধরেছে। সে মন দিয়ে পাইপ ধরাচ্ছে। চিরদীপের প্রেমিকা বারান্দায় নেই।

ঋ-র দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বিতানদার ঘরেই না-হয় এবার ঢুকে পড়া যাক। বারান্দা এখন জে-লোর দখলে। এখানে আর সেঁটে থাকার মানে হয় না। কিন্তু সেখানেও যে তার যেতে পা সরছে না। অনেকেই ঢুকছে অবশ্য। বিতানদার ঠান্ডা হয়ে আসা পায়ে ঢিবঢিব করে প্রণাম করছে। কেউ-কেউ আবার বিতানদার গালে হাতও বোলাচ্ছে। মৃত একটা দেহকে আদৌ শ্রদ্ধা জানানোর কোনও মানে হয়! ঋ ঠিক মনস্থির করে উঠতে পারল না। যা রইল পড়ে ওই বিছানায়, তা তো বিতানদা নয়। পচনশীল কিছু অণু-পরমাণুর সমষ্টিমাত্র। কালকের মধ্যেই যা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। পঞ্চভূতে বিলীন।

তবু এই ধরনের শ্রদ্ধা, ভালবাসার প্রকাশ বোধহয় জরুরি রিচুয়াল। সদ্য প্রয়াত কবির নামে ভাল-ভাল কথা বলার মতো। দোটানায় পড়ে সে আবার জে-লো আর চিরদীপের দিকে মন দিল। চিরদীপ খুব কায়দা করে বাঁ-হাত দিয়ে পাইপ টানছে। ডান হাতে একটা আধ-খাওয়া বিস্কুটের প্যাকেট। এখন জে-লো আর চিরদীপের আলোচনার বিষয় অ্যাসিডিটি।

"জাগরীদি, আমি এবার কাটব। তুমি কি আরও কিছুক্ষণ থাকবে?"

"হ্যাঁ...পিস হ্যাভেনে শিফট্ হবে বডি। ততক্ষণে তো থাকব ভাবছিলাম। কেন, তোর এত তাড়া কিসের?"

"কেন? পিস হ্যাভেন কেন? আজ দাহ হবে না?"

"না। বিতানদার বউ আসবে। বডি রাখতে হবে। তাছাড়া বিতানদা তো দেহদান করে গেছিল। দাহ-টাহ হবে না।"

"বিতানদার বউ? হ্যাঁ, শুনেছিলাম বটে বিতানদা আবার বিয়ে করেছে... উনি কোথায় থাকেন?"

চিরদীপ তাপহীন গলায় বলল, "ইস্তাম্বুল। ওখানের কৃষকসভার অ্যাক্টিভ মেম্বার। এর কাছে বিতানের ট্যান্ডাই-ম্যান্ডাই সব চুপসে যেত। বলত, মাথা মুড়িয়ে হেমার পায়ের কাছে বসাই নাকি ওর ধর্ম। ফক্কিবাজির কথা সব, বোঝোই তো! ভদ্রমহিলার নাম হেমাঙ্গিনী নস্কর। একে কায়দা করে ধরম-হেমা বলে ডাকত বিতান। ধরম-হেমা আসছে, এমনটাই শুনলাম।"

ঋ বিড়বিড় করে বলল, "কমিউনিস্ট। আই সি। ধরম-হেমা। অনবদ্য! পুরোন ছবি দেখতে ভালবাসত বিতানদা, সমুদ্র বলেছিল বটে। প্রেমিকাকে হেমা-ধরম বলে ডাকা, বিতানদাকেই মানায়।"

ঋ দেখল চিরদীপের প্রেমিকা ঘর পেরিয়ে বারান্দার দিকে আসছে। ভীষণ সাবলীল ভঙ্গি তার। বারান্দায় পা দিয়ে চিরদীপের হাত ধরে একটা উসখুস ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে। চিরদীপ গলা নামিয়ে নার্ভাস হাসি হেসে বলল, "হিসু পায়নি তো?"

মেয়েটি চোখ পাকিয়ে তাকাল চিরদীপের দিকে।

"না মানে...অনেকক্ষণ বাথরুম যাওনি... এ বাড়ির বাথরুম ব্যবহার করতে পার। বিতান দারুণ বাথরুম-বিলাসী ছিল। ওর আবার বাথরুম নিয়ে ভীষণ খুঁতখুঁতুনি।"

ঋষিকার গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। এখানে 'ও' মানে কে? বিতান না এই মেয়েটি?

"বিপ্লবী কবির বাথরুম নিয়ে খুঁতখুঁতুনি! বল কী গো?" বলল জে-লো। চিরদীপ মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল, "না, না, আমি বরুত্রীর কথা বলছি! ও হিসু চেপে বসে থাকবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কিন্তু কিছুতেই নোংরা বাথরুমে পা রাখবে না। বেড়াতে গিয়ে যে কী ঝামেলা হয়!"

ঋষিকার অস্বস্তি কাটল। তার মানে এতক্ষণ প্রেমিকার কথাই হচ্ছিল। চিরদীপের গলায় ঋষিকার খুব চেনা পরিত্রাতা-স্নেহশীল পুরুষ। অথচ জে-লো বলে, চিরদীপ নাকি আন-কেয়ারিং, খামখেয়ালি। চিরদীপ কি তাহলে এই নতুন প্রেমিকার জন্য নিজেকে বদলে ফেলল? নাকি বয়স হচ্ছে চিরদীপের? বয়স হলে ছেলেরা গৃহমুখী হয়। হয় বউ-মুখীও! মেয়েটি অবশ্য চিরদীপের বউ নয়। তবে আজকাল এভাবে একসঙ্গে থাকা-টাকাকেও বিয়ে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। নানা পরস্পরবিরোধী চিন্তার স্রোতে ঋষিকা নাকানি-চোবানি খেতে-খেতে দেখল, জে-লোর মুখ মেঘলা। প্রাক্তনদের ভালবাসা হারিয়ে গেলেও থেকে যায় অধিকারবোধ। চিরদীপের এই গদগদ ভাব জে-লোর কাছে নম্বর আদায় করছে না। উল্টে নেগেটিভ মার্ক পাচ্ছে।

বরুত্রী! বাঃ, নামটি তো বেশ! মেয়েটির দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল ঋষিকা। মেয়েটি চিরদীপের মুখের দিকে একভাবে তাকিয়ে আছে। এদিকে কবি-গৃহে কোলাহল বাড়ছে। খবর এল, পিস হ্যাভেনে যাওয়ার শববাহী গাড়ি এসে গিয়েছে। বিতানদা এবার চলল ঠান্ডাঘরে। মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার লোহার খাটিয়ার ওপর সবুজ বিছানার চাদর, তার ওপর বারমুডা আর টি-শার্ট পরা বিতানদার দেহ।

গজদন্তী, হাড় জিরজিরে, স্তনহীনা একটি মেয়ে বিতানদার কপালে হাত রেখে 'কথা দিয়েছিলে, কথা দিয়েছিলে' বলে খুব কাঁদছে। কাঁদতে-কাঁদতে একটা বেড কভার দিয়ে বিতানদার গলা পর্যন্ত ঢেকে দিল। মেয়েটির কান্না দেখে ঋষিকার চোখেও জল এসে গেল। বাঙালি ছেলেরা সাধারণত স্বাস্থ্যহীন। আর কবি হলে তো কথাই নেই! মধ্যবয়সে তাদের মধ্যপ্রদেশ কিছু স্ফীত হয় মদের অবদানে। যেমন হয়েছিল বিতানদার। এন্তার মদ খেয়ে খেয়ে সেই ছিপছিপে, ফরসা বিতান অনেকদিন হল ভুঁড়িওয়ালা, মোটাসোটা। এখানে যারা জড়ো হয়েছে, তারা সব মধ্যবিত্ত বাঙালি কবি বা শিক্ষক শ্রেণির মানুষ। বিতানদাকে তুলতে তাদের মুখচোখ ফেটে বেরতে লাগল। আর মৃতদেহ হাতে তুলে, বসার ঘরে পা দিয়েই তারা গেয়ে উঠল ইন্টারন্যাশনাল। বাংলায় অনুবাদ করা বামপন্থীদের 'জাতীয় সঙ্গীত।'

পরচুলা পরা এক কবি, 'সোনা চলে গেলি, চলে গেলি' বলে বিতানদার কাঁধ খামচে ধরল। জে-লো ঠোঁট ছুঁচলো করে বলে উঠল, "এমা! এ তো লালনের গান!"

চিরদীপের নাক লাল। সে কান্না চাপতে চাপতে বলল, "না, না লালন নয়, লালন নয়, এ বামপন্থীদের গান। প্যারি কমিউনে বসে লেখা হয়েছিল একদিন।"

ঋষিকা চমৎকৃত! আঙুলে আংটি, হাতে 'বিপদ-ভঞ্জন' লাল সুতো পরা এই সব তথাকথিত মার্কসবাদীরা শক্ত মুখে, হাত মুঠো করে ইন্টারন্যাশনাল গেয়ে উঠল কেন? বামপন্থী কবিকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে? শোকপ্রস্তাবে গাও ইন্টারন্যাশনাল, আর জ্বালাময়ী ভাষণ দেওয়ার সময় সব দোষের নাম

গ্লোবালাইজেশন! বাঃ! মাতাল হোক বা মেয়েবাজ, বিতানদা গড়পড়তা ছিল না কোনও দিন। প্রথা ভেঙেছে, তছনছ করেছে ভাবনার গণ্ডি। ছক-ভাঙা বিতানের জন্য একটু অন্যরকম, নতুন ভাবনা ভাবতে পারল না কেউ। বিতানদার প্রিয় গান কী, এরা জানে? ইন্টারন্যাশনাল কি কোনও দিন তার প্রিয় গান ছিল? বরং, ঋষিকার মনে পড়ছে, বিতানদা, গান-টানের ব্যাপারে অসম্ভব খোলামেলা ছিল। মুক্ত ও উদার। বাজার-চলতি হিন্দি সিনেমার গানের লিরিক্সের কাব্যগুণ নিয়ে একদিন বিতানের সঙ্গে ঋষিকার বিস্তর আড্ডা হয়েছিল, একটা শুটিংয়ের ফাঁকে। আশির দশকের একটা হিট গান 'শো গ্যায় আসমান...' বিতানদার দারুণ পছন্দ ছিল। সেই গান গাইলে কি শোকের পরিবেশ নষ্ট হত আজ? এই সব ভড়ং দেখলেই ঋষিকার মনটা পালাই পালাই করে।

ভিড় করে সবাই নামছিল সিঁড়ি দিয়ে, বিতানের দেহ নিয়ে। গান গাইতে-গাইতে ধাক্কাধাক্কিও করছিল বিতানের জীবিত সঙ্গীরা। অবশ্য তাদের দোষ নেই। অনেক চ্যানেল জুটে গিয়েছে তখন অপরিসর সিঁড়িতে। তাদের ক্যামেরা, বুম, তার, সঠিক অ্যাঙ্গেলে শোকাতুর মুখ ক্যাপচার করার তাড়না... সব মিলিয়ে চরম বিশৃঙ্খলা।

ঋষিকা সাবধানে নামছিল সিঁড়ি দিয়ে। তার কোমরে একটা ব্যথা শুরু হয়েছে। আজ শুটিং প্যাক-আপ হয়ে ভালই হয়েছে, বিতানদাকে রওনা করে দিয়ে সে বাড়িই চলে যাবে। সবার পিছনে ধীরে-ধীরে সে বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে বেরিয়ে আসে। এই এলাকার পিন কোড কলকাতার হলেও, জায়গাটা আধা মফস্সলি। কাঁচা নালার গা-ঘেঁষে উঠেছে ছিরিছাঁদহীন, চকচকে বাড়ি। গ্রিল লাগানো বারান্দার তারে অবধারিত নীল নাইটি ও চেক চেক লুঙ্গি। ফুটপাত লোপাট করা সারি-সারি দোকান, রগচটা পথচারী, ভিখিরি, দালাল, অস্থির অটো, গরজে ওঠা বাস, থুতু আর খিস্তি-মেশানো উত্তেজিত পরিবেশ চারপাশে।

বিতানদা বলত, এই থকথকে, জবরদস্ত, অসুন্দরেই সে নাকি চনমনে থাকে! সচল থাকে তার কলম। ঋষিকা গেটের সামনে না-দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল দখল হয়ে যাওয়া ফুটপাত ধরে। সতর্ক ও সজাগ। এসব অঞ্চলে বুকে হাত বা কনুই মারা লোক অবধারিত। কাজহীন সুঁটকো কিছু লোক বিষণ্ণ মুখ নিয়ে সারাদিন ফুটপাতে হাঁটে, হিসি করে বা থুতু ফেলে।

এরকম একটা ফুটপাত ধরে হাঁটার সময়ই ঋষিকার সঙ্গে আচমকা দেখা হয়ে গেল বিশাখার। এই বিশাখা আর সে এক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সঙ্গে পড়েছে। বিশাখা তার চেয়ে বছর দু'য়েকের জুনিয়র হলেও, মুখ চেনা। বিশাখা এক সময় দারুণ নাচত। এখন সে সব জারি আছে কিনা, ঋষিকা জানে না। যদিও বিশাখা আগের চেয়ে অনেকটা মোটা হয়েছে, তবু মিষ্টি মুখটা একই রকম আছে। তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশাখার নাচ আর ঋষিকার অভিনয় ছিল রেগুলার ফিচার।

বিশাখার খবর অনেক দিন রাখে না ঋষিকা। বিয়ে-ফিয়ে করেছে নিশ্চয়ই। নর্থের কোন একটা কলেজে যেন পড়ায়, একবার শুনেছিল। সিঁদুর, শাঁখা বা কোনও রকম বিবাহের চিহ্ন নেই বিশাখার দেহে। ঢলঢলে, ইস্ত্রিহীন, প্রায় রংচটা সালওয়ার আর কুর্তি পরা বিশাখা এক নজরেই ঋষিকাকে চিনল। চোখ কুঁচকে হাসল ঋষিকাকে দেখে। বিশাখার ঠোঁটটা দারুণ যৌন। হাসলে সেক্সি দেখায়। ঋষিকা ওর ঠোঁট দেখে বুঝল, বিশাখা তার সিগারেট খাওয়ার অভ্যেসটা ছাড়েনি এখনও। বিশাখার সঙ্গে তার একটি পুরুষসঙ্গী। ছেলেটির বয়স তিরিশের ওপারে, ঋষিকাদের থেকে হয়তো কিছুটা বড়। খুব ফরসা। ঋষিকা প্রথমেই ছেলেদের হাত আর পা দেখে। এই ছেলেটির হাত আর পা, সব একদম পরিষ্কার।

"কেমন আছ ঋষিকাদি? বিতান বসুর বাড়ি গিয়েছিলে?" বিশাখা জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ। তুই ওখানেই যাচ্ছিস নাকি? তাড়াতাড়ি যা, বিতানদাকে পিস হাভেনে নিয়ে যেতে গাড়ি এসে গেছে।"

"ও। তাহলে আর গিয়ে কী করব? কাল না হয় শ্মশানেই... কখন জান?"

বিশাখার এই কথায়, সঙ্গে ছেলেটি ছটফটিয়ে বলল, "না, না। এখন দেখব বিতানকে। ওই তো দেখতে পাচ্ছি ভিড়টা। ওরা এখনও রওনা হয়নি।"

বিশাখার জন্য অপেক্ষা না-করেই ছেলেটি লম্বা-লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল। বিশাখা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "চলি ঋষিকাদি, পরে কথা হবে। তোমার নাম্বার নেই আমার কাছে। তোমায় ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দেব। কথা হবে, বাই..."

"হ্যাঁ, ঠিক আছে। মেসেজে আমার নম্বর দিয়ে দেব। তাড়াতাড়ি যা... টা টা।"

বিশাখা প্রায় হরিণীর মতো ছেলেটিকে ধাওয়া করেছে। ঋষিকা থমকে দাঁড়িয়ে ছুটন্ত মেয়েটাকে দেখল। দুশ্যটার মধ্যে এক ধরনের মন কেমন করা আকুলতা আছে। ঋষিকা কিছুটা বিমর্ষ হয়ে পড়ল আবার।

বিতানকে ঘিরে জটলাটা আরও বেড়েছে এখন। ওরা পৌঁছনোর আগে বিতান রওনা হবে না।

কবি নয়, বামপন্থী বিতানের নামে এখন মুহুর্মুহু স্লোগান আছড়ে পড়ছে! চারদিকের কোলাহল সে জ্বালাময়ী উল্লাস কিছুটা খেয়ে ফেলছে। তবু এত দূর থেকেও বিতানের অমরত্ব-প্রত্যাশী শব্দ ভাঙা-ভাঙা কানে আসছে ঋষিকার। ফুটপাতের ধার-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ঋষিকা শুনল খানিকটা। ভিড়ের মধ্যে বিশাখা আর তার বন্ধু মিশে গিয়েছে।

আনমনা ঋষিকা ফ্রেন্ড-রিকোয়েস্ট শব্দটা ভাবতে ভাবতে পা ফেলল রাস্তায়। মনটা এমনিতেই ভাল ছিল না সকাল থেকে। তার ওপর এই রকম একটা মৃত্যু, এখানে আসা, শোকের পরিবেশ—সব মিলিয়ে গলার ভেতর থেকে দলাপাকানো একটা কান্না আসছিল অনেক ক্ষণ থেকে।

অনেকটা সময় ঋষিকা সামলে রেখেছিল নিজেকে। কিন্তু আর পারল না। কেঁদে ফেলল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল গণভূমির মাঝে দাঁড়িয়ে অশ্রু বিসর্জন কাজের কথা নয়। ভিড় জমতে শুরু করবে। সচকিত ঋষিকা তাই ত্রস্ত হাতে চোখ মুছল। একটা ফাঁকা ট্যাক্সিও পেয়ে গেল। তারপর কোনও রকমে 'নিউ আলিপুর' বলে ট্যাক্সির সিটে ঘাড় হেলিয়ে দিল।

কোমরের ব্যথাটা ইদানীং জ্বালাচ্ছে খুব। পার্থ গুপ্ত, সমুদ্রর স্কুলের বন্ধু, ঋষিকার ডাক্তার। ওকে একটা ফোন করবে? ধুস, ভাল লাগছে না এখন বকবক করতে! সেই তো এক কথাই বলবে—ব্যায়াম করো... সোজা হয়ে বসো... ভারী তুলো না... কবে মদ খাওয়াবে তোমার বর... মেয়ে কত বড় হল... আমার বউ তোমার সিরিয়াল দেখে....!

ঋষিকা চোখ বুজল। শাড়ির ভেতর দিয়ে আঙুল গুঁজে দিল কোমরের ব্যথার জায়গাটায়। আঙুল নাড়িয়ে-নাড়িয়ে ঠাহর করতে চাইল জায়গাটা। কোথায়? কোথায় ব্যথা?

ব্যথাটাকে ধরতে গেলেই কেন যে হারিয়ে যায়!

পরচুল পরা কবির মুখটা বারবার আসছে ঋষিকার বন্ধ চোখের ফ্রেমে। আর জে-লোর মুখ। চিরদীপের প্রেমিকাকে দেখে বিষ ঝরে পড়ছিল জে-লোর চোখ থেকে। চিরদীপের প্রেমিকা, বরুত্রীর ম্লান, নতমুখ... অদ্ভুত কালো চোখ মেয়েটির, চিরদীপের হাত ধরে কেমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। ওকে আগেও কয়েকবার চিরদীপের সঙ্গে দেখেছে ঋ। মেয়েটি বোধহয় মিডিয়ার নয়। হলে চিনত। মেয়েটি

জে-লোকে ভ্রুক্ষেপও করল না। মেয়েটির একটা অন্যরকম ব্যক্তিত্ব আছে।
জে-লো একসময় বিতানদার সঙ্গেও প্রেম করেছে। আজ অবশ্য শুধুই পি-আর করে গেল। এমনটাই হয়, প্রেম হারিয়ে গেলে?
বিশাখার সঙ্গে এই ছেলেটা কে? ওর বন্ধু? প্রেমিক? কেমন ব্যাকুল হয়ে ছুটল বিতানদাকে শেষ দেখা দেখবে বলে।
বিশাখা খুব মোটা হয়েছে। বলল, ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দেবে।
ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট...

নিঝুম বাড়িতে পা দিল ঋ। সঙ্গে ভারাক্রান্ত মন। কিন্তু তিনতলায় উঠেই মন ভাল হয়ে গেল তার। সমুদ্র কোনও দিন এত আগে আগে ফেরে না। আজ ফিরেছে। লেপের মধ্যে আধশোয়া হয়ে চোখে চশমা এঁটে কীসব কাজ করছে ল্যাপটপে। ঋকে দেখে একখানা দারুণ হাসি উপহার দিল। ঋ ওর কাঁধের ব্যাগটা বেড সাইড টেবিলের ওপর যত্ন করে রাখল। তারপর বাথরুমে গিয়ে স্নান করল অনেকক্ষণ সময় নিয়ে। তার ভেতরে কিছু একটা জমছিল। একটা জ্বালা-জ্বালা দম-ফোটা ভাব। একটা অবুঝ কষ্ট। বিচ্ছিরি মন খারাপ।
সব সেরে বিরস মুখে সে লেপের ভেতর উঠে এল সমুদ্রর পাশে। তারপর অনুনয় আর আদেশের মিশেল দেওয়া গলায় বলল, "আমায় আদর করো সমুদ্র। আমার একটা বিচ্ছিরি মন খারাপ হয়েছে।"

২

রূপের ক্ষেত্রে বাঙালি অধিক চটক বা তীব্রতা পছন্দ করে না। বোধহয় ভয় পায়। নাক বেশি চোখা বা রং বেশি ফরসা দেখলেই গড়পড়তা বাঙালি বিশ্বাস করে, এদের পূর্বপুরুষ ছিল নির্ঘাত ব্লু-ব্লাডেড দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার। তখন অবচেতনে পেন্নাম ঠোকে, চেতনে হিংসে করে। চেতন, অবচেতনের ক্লাশে রাতে অবধারিত নীল দুঃস্বপ্ন! বিশাখার চেহারায় শ্রী ও লাবণ্য আছে। বাঙালি-বাড়িতে এই রূপের কদর হয়। এই ধরনের মেয়েকে ছোট্ট টিপ, শাঁখা-পলা, সোনার চুড়ি, সোনার পাতলা হার, মাথায় ঘোমটা আর ছাপা শাড়ি পরিয়ে রাখতে চায় বাঙালি। সে প্রসঙ্গ অবশ্য এখানে অবান্তর। কারণ, বিশাখা কখনওই এর কোনওটা পরেনি। সে পরে ঢোলা সালোয়ার আর পাঞ্জাবি। কপালে আধুলি সাজের মেরুন টিপ আর আঙুলে একটা মাত্র হিরে।
কলেজের স্টাফ রুমে বসে নিজস্ব ল্যাপটপে কানে হেডফোন গুঁজে সে একখানা ধুমধাড়াক্কা ইংরেজি ছবি দেখছিল। এমন সময় বিল ফোন করে জানাল, কবি বিতান বসু মারা গিয়েছে।
বিলের পুরো নাম বিল্বমঙ্গল রায়মজুমদার। বিল্বমঙ্গলের পাহাড়ি ইংরেজি স্কুলের বন্ধুরা নামটা তাদের জিভ ও সংস্কৃতির মাপে মাপ করে নিয়েছে। বিল্বমঙ্গল হয়েছে বিল। বিল্বমঙ্গল টেলিফোনে কাঁদছিল। বিশাখা ছবিটা বন্ধ করে ল্যাপটপ শাটডাউন করে দিল। আজ এমনিতেই তার একটাই মাত্র ক্লাস, তাও সেটা সকালবেলা নেওয়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পাঁচ ঘন্টা কলেজে থাকতেই হয়, তাই বসে-বসে ছবি দেখা। সাড়ে বারোটা নাগাদ শুভায়ন আসবে বলেছিল, কী একটা পেপার জমা দিচ্ছে সেমিনারে, সেটা বিশাখাকে দেখিয়ে নিতে চায়...
ল্যাপটপ শাটডাউন করতে-করতেই সে ফোনে বিলের কথা শুনছিল।
"আই ওয়ন্ট টু গো টু হিজ় প্লেস... প্লিজ় কাম উইথ মি... প্লিজ়... যাবে?" মোদ্দা কথাটা এটাই। বিলের সঙ্গে এখন তাকে বিতানের বাড়ি যেতে হবে। বিলটা যে কী ছেলেমানুষ! বিশাখার সঙ্গে বাংলা কবিতার তেমন সম্পর্ক নেই। তার প্রথম স্বামী রোহিতাশ্ব প্রেম করার সময় তাকে জীবনানন্দ আর শক্তি চট্টোপাধ্যায় পড়াত। পরে বিতানের কিছু লেখাও পড়িয়েছে। বিশাখার কাব্যরস গ্রহণ করার ক্ষমতা আছে, সে সে সব মন দিয়ে শুনত, উপভোগ করত বটে কিন্তু ইংরেজি কবিতা তার যতটা সঙ্গী, বাংলা কবিতা ততটা নয়। কিন্তু বিল তার কাছের মানুষ, খুবই কাছের। বিল চাইছে তাকে নিয়ে বিতানকে শেষবারের মতো দেখতে যেতে। বিতানের কবিতা তার আত্মীয় হোক না-হোক, কাছের মানুষের জন্য বিশাখা অনেক কিছু করে ফেলতে পারে। তবে বিতানের সঙ্গে বিশাখা একবার দু'বার দেখা হয়েছে পারিখের ঠেকে। তখন সে ছিল রোহিতাশ্বের বউ।
"ওকে বেবি। আয়াম কামিং... আয়াম কামিং... রিল্যাক্স," বলে সে বিতানের বাড়ি যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করল। তোড়জোড় বলতে হেড-ডিপকে খবরটা দেওয়া, স্টাফ রুমের অ্যানেক্সে বসে একটা সিগারেট টেনে নেওয়া আর বিজ্ঞানীকে একটা মেল করে জানিয়ে দেওয়া, সে কলেজ ছেড়ে বেরচ্ছে, অন-লাইন আসতে পারবে না আরও অনেকক্ষণ।
অভিজাত না হলেও বিশাখার বাবা-ঠাকুরদা অথবা মায়ের দিক—দু'পক্ষই বেশ অর্থবান। বেশি-বেশি টাকার জন্য কি না কে জানে, বিশাখার জীবনের গল্প খুবই ভজঘট! বারদু'য়েক বিয়ে করেছে সে। করেছে খান ছয়েক প্রেমও! দু'টো বিয়ের আগে, মাঝে ও পরে। রোহিতাশ্বর সঙ্গে প্রথম বিয়ের সময় তার বয়স ছিল পঁচিশ। সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেছে। রোহিতাশ্ব তখন একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ইংরেজি পড়ায়। বিয়ে হল রেজিষ্টি করে, যেহেতু দু'জনের কেউই ঠিক প্রথাগত হিঁদুয়ানিতে বিশ্বাসী নয়। তার ওপর বিশাখা চিরকালই মারমার-কাটকাট ফেমিনিস্ট। হিন্দু বিয়ের রিচুয়ালস এবং স্ত্রী-আচার জুড়ে ঘোর পুরুষতান্ত্রিকতা-কনকাঞ্জলি, সম্প্রদান ইত্যাদি—সেসব বিশাখা মরে গেলেও করবে না। তাই স্রেফ সই করেই বিয়ে হল।
বিশাখা সাদা বেনারসি, সাদা ফুলের গয়না, কোলাপুরি চটি আর ঠাকুরমার রেখে যাওয়া সাবেকি সোনার গয়নায় খুব করে সাজল। রোহিতাশ্বকে জবরদস্তি সাদা ধুতি আর সাদা গিলে করা পাঞ্জাবি পরতে বাধ্য করল। দু'জনেই রূপবান। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল তাদের। অনেকেই অবশ্য মনে-মনে এ ধরনের সাজগোজের বিস্তর নিন্দে করল। সাদা পোশাক পরে আবার বিয়ে হয় নাকি! বিয়েতে চাই লাল শাড়ি, লাল ব্লাউজ়, লাল চেলি, লাল চটি আর সবার ওপর লাল সিঁদুর। বিশাখা জানাল, সে কোনও দিন সিঁদুর পরবে না। বিয়ের রাতেও নয়।
"স্বামীর মঙ্গলকামনা করব কি করব না, সেটা আমার ব্যাপার। খামোকা মঙ্গলকামনা অ্যাডভার্টাইজ় করতে হবে কেন?" সে বলল তার মুখগোমড়া বাপের বাড়ির লোকজনকে। বিশাখার পরিবার অর্থবান ও ইংরেজি আদব-কায়দায় রীতিমতো চৌখস হলেও বারের পুজো মানে, মানে তাবিজ-মাদুলি, ভূত ও মন্ত্রও! একই সঙ্গে বিশ্বাস করে, সিঁদুর আর ষষ্ঠিপুজোর অলৌকিক ক্ষমতায়। বিশাখার সব কিছু নিয়ে প্রশ্ন তোলা, খেলার নিয়মে না-খেলতে চাওয়ার প্রবণতা তাদের ভীত ও উচাটন করে তোলে। পুরুষকে সে প্রাধান্য দেয় না, মান্য তো করেই না উল্টে সমকক্ষভাবে! স্থিতিশীলকে লন্ডভন্ড করাতেই যেন তার বিশেষ আনন্দ। এ অনাচারী মেয়ের সংসারের নিন্দে ছাড়া আর কীই বা জুটবে!
তবে সিঁদুর বা না-সিঁদুর, বিশাখার বিয়ের সিদ্ধান্তে তারা এক রকম স্বস্তিই পেল। লোকাচার মানবে না বটে, তবে এ মেয়ের যা ধাত, বিয়ে না করেই সংসার যে পেতে বসেনি, এই ঢের! বিশাখার কর্পোরেট বাবা, বিয়ের রাতে তসরের পাঞ্জাবি আর ডিজ়াইনার ধুতিতে ঘামতে-ঘামতে অতিথিদের আপ্যায়ন সারলেন ম্লান

মুখে, রাগ গিলে, আপাত-স্মার্ট ভঙ্গিমায়। অন্যদিকে বিশাখার মা মেয়েদের ম্যাগাজিন পড়েন। ইদানীং কিছু ছেলে মেয়ে এই সব 'অন্য-ধারা'র তেয়েঁটেপনা করছে, সে ব্যাপারে তিনি অবগত। ম্যাগাজিন এসবের নাম দিয়েছে 'প্রগতিশীলতা' আর আধুনিকতা। মায়ের কাছে তাই আধুনিক মানেই ফ্যাশনেবল। তাই মেয়ের বিয়েকে হাতিয়ার করে মা সে রাতে বনে গেলেন জম্পেশ মডার্ন আর ফরোয়ার্ড! তিনি জানালেন এই অন্য-ধারার বিয়েতে তাঁরও পূর্ণ সমর্থন আছে।

মুম্বইয়ের রাঙাপিসি, চিত্তরঞ্জনের ফুলবউদি, শিলিগুড়ির সোনা মেসোমশাই চোখ কপালে তুললে কী হবে, বিশাখার মায়ের সে রাতে আধুনিকা হয়ে ওঠা কেউ ঠেকাতে পারল না। অন্য দিকে রোহিতাশ্বর পরিবার বড়ই সাদামাটা। টাকার অভাবে নিরীহ। কোনও কিছু অপছন্দ হলে মুখ ভার করার চেয়ে ঢোঁক গেলাতেই বেশি পারদর্শী। তারা বিয়ের আগে বিশাখাকে একবার মাত্র দেখেছে। পার্ক স্ট্রিটের এক কফি শপে রোহিতাশ্ব ওর মা আর বোনকে নিয়ে এসেছিল বিশাখার সঙ্গে আলাপ করাতে। বিশাখা প্রথম দর্শনে রোহিতের মাকে প্রণাম না করে 'হাগ' দিল। বোনের গাল টিপে দিয়ে বলল, "তোমার চোখগুলো খুব অ্যাট্র্যাক্টিভ।"

মুখে কুলুপ এঁটে, খাবি খেতে-খেতে তারা বিশাখাকে হজম করল মাত্র। কিন্তু রোহিতের মা সাবেকি ও প্রাচীনা বলেই হয়তো মানুষ চিনতে পারেন। বাড়ি গিয়ে তিনি রোহিতের বাবাকে বললেন, "মেয়ের ধ্যানধারণা আমাদের সঙ্গে কিচ্ছুটি মেলে না বটে, তবে মেয়ে খারাপ নয়। সরল, সাদা মেয়ে। অবশ্য সংসারে বেমানান। কিন্তু ওকে দেখে আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল... যা-যা হারিয়ে ফেলেছি আমি সংসারের উপযুক্ত হতে গিয়ে, তার সব আছে ওর মধ্যে।"

রোহিতের বাবা আবার কম কথার মানুষ। উত্তরে বিষণ্ণ হাসলেন মাত্র। কিছু বললেন না। তিনি একটু হাঁ-করা ধরনের লোক! দেখতে, শুনতে তলিয়ে বুঝতেই বেশি পছন্দ করেন। লোকে তাঁকে বোকা-সোকা মনে করে। তিনি নিজেও যেন সেটাই বিশ্বাস করেন। এই ভদ্রলোক একসময় কলকাতার গা-ঘেঁষা এক মফস্‌সলের স্কুলে মাস্টারি করেছেন। স্বাস্থ্য ভাল ছিল না বলে আগেভাগে অবসর নিতে হয়েছিল। থোক টাকা যা পেয়েছিলেন, তা বাড়ি তৈরিতেই খরচ করে ফেলেছেন। তারপর পাড়ার নিম্নবিত্ত বাড়ির ছেলেমেয়েদের কম পয়সার মাস্টারমাশাই। দিন কাটে, কেটে যায়, একরকম।

এয়ারপোর্টের পিছন দিকে খুব সস্তায় কাঠা তিনেক জায়গা আগে কেনা ছিল বলে মাথা গোঁজার স্থানটুকু হয়েছে। অনেক বছর আগে জায়গাটা কিনেছিলেন যখন, তখন এসব জায়গায় মশা আর গোরু ছাড়া কেউ চরতে আসত না। এখন অবশ্য শহর আছড়ে পড়েছে তাঁর বাড়ির দোরগোড়ায়।

রোহিতের বাবা কম কথার মানুষ। উত্তরে বিষণ্ণ হাসলেন মাত্র। তিনি একটু হাঁ-করা ধরনের লোক!

ফাঁকা জমি প্রায় নেই বললেই চলে। গলির আনাচকানাচে আরও চটকদার জীবনের হাতছানি। পেজ-থ্রি বুটিক, ইকো-স্পা কাম হুকা বার, গালা-লা-লা মল...!

রংচটা লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরা নির্ভেজাল ভিতু ও ভদ্র এই বাঙালি সারাজীবন একটাই স্বপ্ন দেখেছিলেন। ছেলেকে মানুষ করতে হবে। তাই মেয়েকে বাংলা মিডিয়াম আর ছেলেকে ইংরেজি মাধ্যমে পড়িয়েছেন। মেয়েকে আধখানা ডিম, একবেলা দুধ আর ছেলেকে ডবল ডিম আর দু'বেলা দুধ। লিস্ট লম্বা হতে চাইছে, কিন্তু অনেক বাড়িতেই এমনটা হয়ে থাকে বলে বিষয়টা আর বাড়ানোর দরকার নেই। ছেলে অবশ্য তাঁর স্বপ্নের মান রেখেছে!

রোহিতাশ্ব পড়াশুনোয় খুবই ভাল, সন্দেহ নেই। কলকাতার সেরা কলেজে পড়েছে। রেজাল্ট অবশ্যই ওপরের দিকে। রোহিতের বাবা নিজে, জীবনে কিছু করে উঠতে পারেননি। কিন্তু সবেতে মুগ্ধ হতে কার্পণ্য নেই। ছেলের সাফল্যে মুগ্ধ। মেয়ের ভালত্বে মুগ্ধ। এমনকী বউয়ের হাতে তৈরি বেগুনের তরকারিতেও মুগ্ধ! পুরী গেলে মুগ্ধ হয়ে সমুদ্রের আছড়ে পড়া দেখেন, গ্যাংটক গেলে পাহাড় চূড়ায় বিকেলের রোদ। এই যে তাঁর মলিন বাড়ির ধার ঘেঁষে উন্নয়ন আছড়ে পড়ছে, তা নিয়েও তাঁর মুগ্ধতার শেষ নেই। দেখে-দেখে আশ মেটে না তাঁর।

বিকেলবেলা হলেই, সুরুত-সুরুত করে চা খেয়ে নেন তিনি। সঙ্গে রোহিতের মায়ের হাতে করা বিকেলের জলখাবার। বেশির ভাগ দিন তৈরি হয় সরষের তেল দিয়ে চাউমিন। যে-চাউমিনের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকা আলু আর ডিম! তারপর চটি ফটফটিয়ে পুলিনবাবু নতুন যুগের কারবার দেখতে বেরিয়ে পড়েন।

"এখনকার ছেলেমেয়েরা মোমো খেতে পছন্দ করে," একদিন সগর্বে বাড়িতে ঘোষণা করলেন তিনি। এমন নানা তথ্য সরবরাহ করেন তিনি বাড়িতে। যা দেখেন, যা শোনেন, সব তাঁর বাড়িতে বলা চাই-ই চাই। বলার সময় তাঁর চোখমুখ আনন্দে জ্বলজ্বল করতে থাকে। নতুন মানেই খারাপ, এ ধারণার উল্টো পথের পথিক তিনি। তাঁর প্রতিবেশীরা বেশির ভাগ নিম্ন আয়ের মানুষ। অক্ষম ও অসহায় বলেই টাকার রোশনাই দেখে তারা নাক কোঁচকায়, নিন্দে করে। পুলিনবাবু অবশ্য এসব ব্যাপারে খারাপ কিছু পান না। দিনকাল পাল্টাচ্ছে, তায় আবার তাঁকে সাক্ষী রেখে, তিনি খামোকা রাগতে যাবেন কেন? চারধারে যেন খুশির হাট বসেছে। এত রং, এত ফান, সে সব ফালনা? বিকেল পেরিয়ে বাড়ি ফেরেন পুলিনবাবু। তারপর ছাত্র পড়াতে বসেন।

কাঠ-পিঁপড়ের কুচকাওয়াজ প্র্যাক্টিস করা প্লাস্টিকের টেবিল ঢাকা রাতের মেনু আলুর তরকারি আর রুটি। শেষ পাতে গুড়। ডিমের ঝোল হয় সপ্তাহে দু'দিন। বুধ আর রবি। একসঙ্গে খেতে বসা এ বাড়ির রেওয়াজ। পাঁচ বছরের ছোট বোনের সঙ্গে ডিমের কুসুম নিয়ে মারামারি নস্টালজিয়ায় আজও আক্রান্ত রোহিতের সেদিন পর্যন্ত আইডিয়াল নারী ছিল মা। রাতের রুটির আটা ঠাসতে-ঠাসতে হাঁ করে মা সিরিয়াল দেখছে, সিরিয়ালের ভ্যাঁপোর-ভ্যাঁপোর বাজনার ব্যাকড্রপে রোহিত অনায়াসে ফরাসি কবিদের কবিতা পড়েছে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে। লিখেছে উত্তর-আধুনিকতা নিয়ে গালভরা পেপার।

হায়ার সেকেন্ডারিতে মারমার কাটকাট রেজাল্ট করে শহরের অভিজাত এক

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়তে এসে প্রথম দিনেই হাড়-হিম করা সেক্সি ও ফেমিনিস্ট বিশাখা তার কোর্টে নিরীহ কর্কের মতো গোঁত্তা খেয়ে পড়ল! আইডিয়াল নারীর আসন থেকে হড়কে গেলেন মা। জাঁকিয়ে বসল প্রেমিকা বিশাখা। এবং প্রেমের ডাউন-ষ্ট্রিম উদ্যোগ হিসেবে রোহিতের জীবনে ঢুকল প্রলয়ংকরী নারীবাদ। রোহিতের মা আর বোন বিয়ের দিন সকালে, খালি পেটে, পাড়ার সর্বমঙ্গলা মন্দিরে গিয়ে এক প্যাকেট সিঁদুর ও একজোড়া নোয়া শুদ্ধ করিয়ে এনেছিল। রাতে 'রেজিস্টারি' হয়ে গেলে, সেই সিঁদুর, তাদের 'বাবু', বাড়ির বউয়ের কপালে ছোঁয়াবে, উপস্থিত এঁয়োরা উলু দিয়ে বউকে আপন করে নেবে, এমন একটা অলীক, অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য স্বপ্ন দেখেছিল রোহিতের পরিবারের মেয়েমহল।

রেজিস্ট্রি হল। বিশাখা ঘোষণা করল, "লেটস ওয়াল্টজ!"

মা আর বোন ঢোঁক গিলে সিঁদুরের প্যাকেট ও নোয়াজোড়া শাড়ির দোকানের প্যাকেটে ঢুকিয়ে ফেলল। 'এখানে সুলভে মডার্ন পোশাক পাওয়া যায়' লেখা ব্যাগের ভিতর সিঁদুর কৌটোয় আর নোয়ায় লেগে রইল একাল ও সেকালের অনিবার্য টাগ অফ ওয়ারের সমাধানহীন দীর্ঘশ্বাস। অবশ্য অমঙ্গলের আশঙ্কায় কাঁটা হয়ে থাকা মায়ের সব দুর্ভাবনাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বিয়ের মাস ছ'য়েকের মধ্যেই রোহিত আর বিশাখার জীবনেই এল তারাক্তির ছোঁয়া। রোহিত চাকরি পেল একটি নামকরা ইংরেজি খবরের কাগজে। আর বিশাখা পেয়ে গেল কলেজে পড়ানোর কাজ। এক সপ্তাহের মধ্যে দু'টো ভাল খবর। পরের রবিবার রোহিত পাঁঠার মাংস, গলদা চিংড়ি আর রাজভোগ কিনে বাড়ি ফিরল। কালি-ঝুলি মাখা স্যাঁতস্যাঁতে রান্নাঘরে বাজারের ব্যাগ আর মিষ্টির ভাঁড় সাবধানে রেখে মাকে প্রণাম করল, আড়চোখে নিজের বেডরুমের দিকে নজর রেখে।

বিশাখা কারও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা পছন্দ করে না। এবং তার দাবি, বিশাখার পছন্দ অনুযায়ীই রোহিত চলবে। মা ছেলের চিবুক ছুঁয়ে আদর করে বললেন, "ও বাড়িতে খবরটা দিয়েছিস? স্কুলমাস্টার জামাই তো ওদের পছন্দ হয়নি। এবার তোর একটু খাতিরযত্ন বাড়বে।"

বিশাখা ছুটির দিন সাড়ে দশটা-এগারোটার আগে বিছানা ছেড়ে ওঠে না। মা এর বেশি আর কিছু বললেন না। তেমন হইচইও করলেন না পাছে বিশাখার ঘুম ভেঙে যায়! রোহিতাশ্ব কিছু বলতে গিয়েও বলল না। নারীবাদী বটে, কিন্তু বিশাখাও মনে-মনে বিশ্বাস করে, তার রোজগারের চেয়ে যেন তার স্বামীর রোজগার বেশি হয়। কলেজের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পরে এসেছিল। বিশাখা সেটা হাতে পেয়ে প্রথমেই বলেছিল, "ভাগ্যিস, তুমি স্কুলটা ছাড়ছ! নয়তো আমার কেমন অস্বস্তি হত। আমি কলেজ আর তুমি স্কুল! নট ডান।"

রোহিতাশ্ব দুষ্টুমির লোভ সামলাতে পারেনি। বলেছিল, "আমি স্কুল ছাড়ছি না বিশ। যতবার রেজিগনেশন লেটার লিখতে বসছি, বাচ্চাদের মুখ মনে পড়ে যাচ্ছে। তাছাড়া আমি তোমার থেকে বেটার ছাত্র। ভালদের স্কুলেই পড়ানো উচিত। তাতে শিক্ষার বুনিয়াদ শক্ত হয়। আমি ক্ষমতায় থাকলে, স্কুল-শিক্ষকদের মাইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের থেকেও বেশি করে দিতাম।"

কথাটা শুনে বিশাখা প্রথমটায় হকচকিয়ে গেল। তারপর তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। বলল, "মানে! তুমি কি পাগল হয়ে গেছ নাকি? আমি বাড়ির সবাইকে অলরেডি বলে দিয়েছি, তুমি জার্নালিস্ট... এখন এসব আমি একদম বরদাস্ত করব না! আর শোনো, এসব আদর্শের কথা বেশিদিন থাকে না। তোমার মধ্যে এক ধরনের কমপ্লেক্স তৈরি হবে, আমি কলেজে পড়াব আর তুমি স্কুলে। বোকা চিন্তা মাথা থেকে তাড়াও। আমি যেন আর কোনও দিন কথাটা না শুনি।"

বিশাখা সারাদিন আজকাল কী করে, রোহিত জানে না। বিবাহিত নারী-পুরুষ কি এভাবেই অভ্যেসের সম্পর্কে নিজেদের হারিয়ে ফেলে? এভাবেই কি সম্পর্ক দূরত্ব তৈরি হয়? ছুটির দিনেও আজকাল তারা আলাদা-আলাদা সময় কাটায়। মাঝেমধ্যে কোনও বই বা সিনেমার আলোচনা... রাতে নিয়ম করে সঙ্গম।

"কী হল? কী ভাবছ বলো তো? আমি তোমায় হেল্প করব, রেজিগনেশন লেটার লিখতে? কাম অন বেবি... কাম অন... এসো আমার কাছে... আয় সোনা..."

রোহিত পায়ে-পায়ে বিশাখার দিকে এগিয়ে যায়। বিশাখা খুব জবরদস্ত চুমু খায় রোহিতকে। তারপর হিহি করে হেসে বলল, "খুব আইডিয়ালিজ়ম মারাচ্ছ না? ওসব হবে না বলে দিলাম। বাবাকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখো, বাবাও চান না তুমি স্কুল মাস্টার হও।"

রোহিত নিজেকে বিশাখার বেষ্টনী থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একখানা সিগারেট ধরিয়ে বলল, "জানি। সেটা ট্র্যাজেডি বিশ। কোনও স্কুল টিচারই চায় না তার ছেলে স্কুল টিচার হোক। এটা আমাদের ভাবনার প্রবলেম। আর সমাজব্যবস্থার।"

বিশাখা চোখ বড় করে বলল, "অ্যাই আঁতলামো করবে না একদম।" রোহিতের কষ্ট হচ্ছিল খুব। ক্লাস এইটের ব্যাচটা দুর্ধর্ষ। তাদের সঙ্গে শেক্সপিয়রের ওপর একটা অসামান্য প্রজেক্ট শুরু করেছে রোহিত। ছেলেদের মধ্যে সাহিত্যের বোধ ফুটে উঠছে ধীরে-ধীরে। ওদের উৎসাহ, জীবন-জিজ্ঞাসা, সুন্দরকে চিনে নেওয়ার ইচ্ছে, টগবগে প্রাণপ্রাচুর্য তাকে বাঁচতে সাহায্য করে। বিশ যদি একবার সাহস দিত, সে সত্যিই স্কুলেই থেকে যেত। কিন্তু তা বোধহয় হওয়ার নয়।

দুপুরে ভাত দেওয়ার সময়, মা, মুঠোয় করে সিঁদুর মাখা ঠাকুরের ফুল ছোঁয়ালেন ছেলের কপালে। বিশাখার কপালে ছোঁয়াতে গেলে বিশাখা মুখ সরিয়ে নিল, "মা, প্লিজ় কিছু মনে কোরো না। এই ফুল আমি কিছুতেই মাথায় ছোঁয়াতে দেব না।"

এসব সময় হঠাৎ একটু বেশি রকমের নিস্তব্ধতা নেমে আসে ঘর জুড়ে। এ ক্ষেত্রেও তাই হল। বিশাখা চিংড়িমাছের মাথা চিবোতে-চিবোতে অম্লান বদনে বিস্তারিত করল তার বক্তব্য, "সেদিন দেখলাম, তোমার সাধের মন্দিরের ওই পুরুতটা বাসগুমটিতে বসে একগাদা খালাসি ক্লাসের লোকের সঙ্গে বসে গুলতানি করছে। আমাকে দেখে মুখ লুকিয়ে নিল। আর মন্দিরের চাতালটা দেখেছ? সব সময় একটা ঘেয়ো কুকুর হ্যা-হ্যা করে জিভ বের করে হাঁফাচ্ছে। যেখানে প্রসাদী ফুল-টুল থাকে, সেখানেও ঘুরঘুর করে। আমার দেখলেই ওয়াক ওঠে। তোমার ভগবানের এজেন্ট আর এজেন্ট হাউজ়, দু'টোই সাব স্ট্যান্ডার্ড! এসব ফুলটুল নিয়ে বাড়াবাড়ি আমার সহ্য হয় না।"

থতমত গলায় রোহিতের মা কিছু একটা বলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। রোহিত তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলল, "আঃ, ছাড়ো না। বিশাখা বলতে চাইছে, ও কষ্ট করে চাকরি জোগাড় করল, আর তুমি ক্রেডিট দিচ্ছ ভগবানকে?"

মা অসহায় কণ্ঠে বললেন, "আমরা সাধারণ মানুষ বাবা। ভগবান ছাড়া আমাদের আর কে দেখে বল?"

ততক্ষণে বিশাখা তার বিরক্তি সামলে নিয়েছে। একটু লজ্জাও পেয়েছে সে। এই নিরীহ মহিলাকে তার বড্ড বোকা-বোকা লাগলেও অত রূঢ়ভাবে কথাটা বলা উচিত হয়নি, বুঝতে পেরে বলল, "ভগবান দেখেন-টেখেন না। ওনার ওপর এত ভরসা রেখো না।"

মা এই বিজাতীয় পুত্রবধূটিকে যমের মতো

ভয় পান। তাই একে আর না-ঘাঁটিয়ে করুণ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, "আচ্ছা। তাই হবে।"

চাকরির প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে বিশাখা শাশুড়ি আর ননদের জন্য দু'খানা দামি সিল্কের শাড়ি কিনে আনল। শ্বশুরের জন্য জিন্স আর টি-শার্ট! শ্বশুরমশাই দারুণ খুশি। বললেন, "এবার পরিকল্পনা করে বিড়িটা ছেড়ে দিতে হবে। জিন্সের সঙ্গে এসব ছোটলোকি কারবার মানায় না। এতদিন লুঙ্গি-টুঙ্গি পরতাম, বিড়ি মানিয়ে যেত। আর নয়, আর নয়! হ্যাঁগো, এর সঙ্গে একটা পানামা হ্যাট পরলে কেমন হয়?"

'পরিকল্পনা' শব্দটা ভদ্রলোকের বিশেষ পছন্দ। কারণে-অকারণে প্রায়ই তিনি ব্যবহার করেন। খটখটে ফেমিনিস্ট বিশাখার আবার এই ভদ্রলোকের সব কিছুই খুব পছন্দ। এমনকী ওঁর আবোল-তাবোল কথাবার্তাও। পানামা হ্যাট পরার সরল পরিকল্পনায় বিশাখা উচ্ছ্বসিত হয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে প্ল্যান ঠিক হয়ে গেল, পরের সপ্তাহে তারা ফ্যাশন মার্কেট যাবে পানামা হ্যাট কিনতে। এই সব প্ল্যানিংয়ের সময় বিশাখা যদি আরও একটু সতর্ক হত, তাহলে শাশুড়িকেও টেনে নিত আলোচনায়। কিন্তু বিশাখা ভাল রেজাল্ট করলেও সাংসারিক বুদ্ধি নেই একফোঁটা! প্ল্যান হচ্ছে উঠোনে আর অশান্তির লাশ পড়ছে রান্নাঘরে! শাশুড়ির মুখে হাসি মুছে জন্ম নিচ্ছে বিরক্তি ও বিরাগের বাঁকা রেখা। ছোট খুশি, ছোট কথা, ছোট সুখ থেকে একদিন দহন দাউ, দাউ....

যাই হোক, সে রাতে অবশ্য তারা দলবেঁধে চিনে-খাবার খেতে গেল।

এই সব ধাক্কা সামলাতে-সামলাতে, আধা মফস্সলি, নিম্নবিত্ত পরিবারটি ধীরেধীরে এই পাগল মেয়েটিকে হয়তো ভালবাসতেও শুরু করছিল। কিন্তু সে ভালবাসা ভালমতো পাকিয়ে ওঠার আগেই হাতে গরম উন্নয়নের ধাক্কায় আক্রান্ত হল রোহিতের পরিবার। তারা চেষ্টা করছিল হয়তো ছেলে-ছেলের বউয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার, 'উন্নীত', 'লিবারেল' হয়ে ওঠার, কিন্তু গতির তারতম্য থাকে। একসঙ্গে যাত্রা শুরু না-করা দু'টো ধাবমান যান কি একই সময়ে গন্তব্যে পৌঁছতে পারে? লিবারালাইজেশনের ঝটকা সামলানো কি আর মুখের কথা? একজন খবরের কাগজ। আর-একজন মহাবিদ্যালয়। কর্মস্থল তো নয়, একেবারে সুশীল-সমাজের আঁতুড়ঘর। পায়ে-পায়ে বিদ্বজ্জন! বাড়ি-জুড়ে উদারমনস্ক, বুদ্ধিজীবীর ঢল নামল। সঙ্গে বিভিন্ন আকারের মদের পেটিকাও! উন্নয়ন-টুন্নয়নের সময় অবশ্য এমনটাই হয়ে থাকে। খাওয়া-পরা-মাথার ছাদের চাহিদা মিটিয়ে মানুষের হাতে উদ্বৃত্ত ক্রয়ক্ষমতা থাকলে, মানুষ তা বাতেলা আর বোতলের জন্য খরচ করবে—এমনটাই স্বাভাবিক!

কিন্তু নিম্নমধ্যবিত্ত বাড়িতে মদকে সবাই ভয় পায়। মহিলা আর মদের কম্বিনেশন দেখলে চোখ উল্টে ভিরমিও খেতে পারে। রোহিতের বাড়ির ক্ষেত্রে তেমনটা হল না কিন্তু রোহিতের মা আর বোন ঘন-ঘন আর বড়-বড় শ্বাস ফেলতে লাগল সময়ে-অসময়ে।

বিশাখা অবশ্য বুঝত সবই। কিন্তু তেমন পাত্তা দিত না। একদিন ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গেল। রোহিতের বেডরুমে কয়েকটা বোতলে তলানি পড়েছিল অনেকদিন ধরে। রোহিতের বাবা কবে বিষয়টা নজর করলেন কে জানে, একদিন রাম, হুইস্কি, ভদকার ককটেল তৈরি করে লুকিয়ে মেরে দিলেন অনেকটা। এবং তারপর সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে রোহিতের মাকে 'বিউটিফুল, তোমাকে সেলাম' বলে মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলেন রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে।

রোহিতের গোবেচারা মা রোহিতের হাত ধরে কেঁদে পড়ে বললেন, "আমায় বিষ এনে দে!"

বিশাখা পুরো ব্যাপারটা হাসাহাসি করে ম্যানেজ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাতে উল্টো ফল হল। রোহিতের মা বিশাখা আর তার শ্বশুরমশাইকে জড়িয়ে হাল্কা করে আজগুবি অ্যাঙ্গেলে কথা বলতে লাগলেন।

চাপ খেতে শুরু করল রোহিত। 'সাঁস-বহু'র মেগাকাব্যের জাঁতাকলে পড়ে সে দিন-দিন তেড়িয়া হয়ে যেতে লাগল। শসা খেতে শুরু করল মাথা ঠান্ডা রাখার আশায়। এই সব এমন কিছু অভিনব বিষয় নয়। সব বাড়িতেই হয়ে থাকে। স্বামী কাঠ-কাঠ হয়ে যায় জীবনের বিভিন্ন কোনা-ঘুপচির খোঁচা খেয়ে। মূল খেলার সাইড লাইনে ওয়ার্মিং আপের নামে কিছু ছেলেপুলে যেমন আপসে ঘাম ঝরিয়ে নেয়, তেমনই, এই শীতল স্বামী-জনিত ডিপ্রেশনের কারণে, সাইড লাইনে লেগে যায় শাশুড়ি-বউয়ের ঝঞ্ঝাট। তবে বিশাখা আর তার শাশুড়ির ক্ষেত্রে যেসব বিষয় নিয়ে ঝামেলা বাঁধতে শুরু হল, তা অনন্যসাধারণ, সন্দেহ নেই।

একদিন জলখাবারের আয়োজন করতে রান্নাঘরে ঢুকে বিশাখা দেখল ওটমিল নেই। সে জলখাবারে ওটমিল আর দুধ খায়। আর এবাড়িতে জলখাবারে কেউ রুটি-তরকারির বাইরে কিছু খাওয়ার কথা ভাবতে পারেনি কোনও দিন। রোহিতের মা আড়চোখে তাকে দেখে বললেন, "ওটমিল আনানো হয়নি। আজ তুমিও আমাদের সঙ্গে রুটি খেয়ে নাও।"

"অ্যাঁ, রুটি! আমি জীবনে কোনও দিন রুটি খাইনি ব্রেকফাস্টে! রুটি খেতে পারব না।"

রোহিতের মা খুব জটিল হাসি হেসে বললেন, "তা বটে, যার যেমন অভ্যেস। ঠিক আছে, তোমায় না হয় লুচি ভেজে দিচ্ছি, আলুভাজা দিয়ে লুচি খাবে তো?"

বিশাখা লাফিয়ে উঠে শাশুড়িকে জড়িয়ে ধরে বলল, "দ্যাট উড বি গ্র্যান্ড। একটু ক্যালরি বেশি... সে না হয় আমি দুপুরে ভাত অফ করে দেব! উঃ, কতদিন লুচি খাইনি।"

রোহিতের মা আর কিছু বললেন না। ময়দার কৌটো বের করলেন। লুচির প্রস্তাবটা না দিলেই বোধহয় ভাল হত! তিনি কেন যে বোকার মতো মহান সাজতে গেলেন। নিজের ওপরেই রেগে গেলেন তিনি। অথচ রাগ করার কথা বাবুর বউয়ের ওপর। তিনি বেশ বোঝেন, বাবুর বউয়ের ওপর রাগ করার সাহস পর্যন্ত তাঁর নেই। মনে-মনে...এই পর্যন্ত, ব্যস। নিজের ওপর খানিক বিরক্তি, খানিক মায়া নিয়ে রোহিতের মা ময়দা মাখতে শুরু করলেন। রোহিতের মায়ের মনে ছেলের বউয়ের জন্য যা খানিক নরম রেখা গজিয়েছিল, ধীরে-ধীরে তা হারিয়ে গেল।

এসব অবশ্য বড্ড উচ্চ তাপমাত্রার মুহূর্ত। ভুলভাল ভেবে ফেলার সহায়ক মুহূর্ত। রোহিতের মায়ের মনে হয়, সবই টাকার খেলা। তাঁরা গরিব। বিশাখা রোজগেরে। বিশাখা আসলে তার টাকার গরম ছড়াচ্ছে পরিবারে, পরোক্ষভাবে। সংসারের কূটকচাল বিশাখা এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু বোঝে না, তা তো নয়। স্পোর্টিং থাকার চেষ্টা করে সে। কিন্তু মাঝেমাঝেই ক্লান্ত লাগে। শাশুড়ি-বউ-এর ক্লিশে হিংসুটেমির গল্পটা ভাঙতে চেয়ে সে স্বেচ্ছায় শ্বশুরবাড়িতে থাকতে এসেছিল। তার পরিচিত সবার আপত্তি আর সন্দেহর তোয়াক্কা না-করে। ওরা একেবারেই অন্য রকম মানসিকতার। এই ছিল তাদের যুক্তি। বিশাখা মানিয়ে নিতে পারবে না, এই ছিল তাদের ভবিষ্যদ্বাণী।

বিশাখার কিন্তু পরিবারটাকে খারাপ লাগেনি।

"গাঁইয়া বটে, কিন্তু জাঁদরেল নয়। আই হেট জাঁদরেলস," বলেছিল সে তার আগামীর শ্বশুর, শাশুড়ি ও ননদ সম্পর্কে। প্রথম যেদিন বিশাখা এসেছিল এ বাড়িতে, শ্বশুরমশাই সেদিন বাড়ির উঠোনে উবু হয়ে

বসে দাঁতন করছিলেন। পরনে নীল-সবুজ চৌখুপি লুঙ্গি আর গেরুয়া রঙের ফতুয়া। বিশাখা ঢোকঁ গিলেছিল সে দৃশ্যে। তারপর আলতো হাতজোড় করে তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। সে কারও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে না। ভদ্রলোক শব্দ করে কুলকুচো করে উঠোনের নালায় ফচাং করে মুখের জলটা ফেললেন। তারপর ভিজে মুখে বিশাখার দিকে তাকিয়ে, ত্যাড়াবেঁকা দাঁত দেখিয়ে হেসে বললেন, "হাই!"
বিশাখা হেসে ফেলেছিল। ওঁর ভেজা হাতদু'টো ধরে বলেছিল, "হাই!"
ভদ্রলোক চোখ সরু করে ঘাবড়ানো গলায় বললেন, "হাসছ যে? কতদিন ধরে পরিকল্পনা করেছি জানো?"
বিশাখা সেই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বিয়ের পর সে এ বাড়িতেই থাকবে। 'আমরা-ওরা'র বিভাজন মুছে, ওদের সহজ, স্বাভাবিক করে তুলবে, এমন সংকল্পও করে ফেলেছিল সেদিন এই জেদি, ছেলেমানুষ আর লড়াকু মেয়েটা। আসলে সে চেয়েছিল 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি'। অর্থনৈতিক ও সামাজিক তারতম্য ভুলে শুধুমাত্র ভালবাসার জোরে মিলেমিশে থাকতে। রোহিতের পরিবারকে সে নিজের পরিবার ভাবতে চেষ্টা করেছিল। অধৈর্য অভব্যতা সে নিজের বাড়িতে কম করেনি। মায়ের সঙ্গে পা দাপিয়ে-দাপিয়ে ঝগড়া করেছে। টিভির চ্যানেল নিয়ে বাবার সঙ্গে কর্কশ ঝগড়ায় মেতেছে। আবার সব কিছু ঠিক হয়ে গিয়েছে। এখানেও সে তেমন কিছু আশা করেছিল। কিন্তু এ বাড়ির সকলে, একমাত্র খ্যাপাটে বাবা চরিত্রটি ছাড়া, আগে থেকেই বিশাখার কাছে হেরে বসেছিলেন। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বিত্তে বিশাখার অবস্থান ওঁদের চেয়ে অনেক ওপরে। সেই গরমিলের কারণে ভেতরে-ভেতরে ছন্নছাড়াভাবে দূরত্ব ছিলই, তার ওপর হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ল উন্নয়নের জব্বর চাঁটি।
অসমতার ক্ষমতা। ঝুরঝুরে বালি উড়িয়েই ঝড় সংগঠিত করে দেয়। অথচ বিশাখার কোনও দিন জাহির ছিল না। সে কোনও দিন বড়াই করেনি তার দুরন্ত রেজাল্ট বা বড়-বড় পদে চাকরি করা আত্মীয়স্বজন নিয়ে। রূপ নিয়ে গর্ব করার কথা তো তার মনেও আসেনি কোনও দিন। অথচ পরে সে জেনেছে, এর প্রতিটিই তার বিরুদ্ধে গিয়েছে। জাহির না করা নাকি অনুকম্পার প্রকাশ! যারা মনে-মনে নিজেদের ছোট, হেরো, বা অন্ত্যজ ভাবতে বদ্ধপরিকর, তারা এক ধরনের আত্মরতিতে মগ্ন থাকে। তাই বিশাখার চেষ্টা কোনও দিন তাদের চোখে পড়েনি। এ তাদের আত্মপ্রবঞ্চনা। বদ্ধ বিশ্বাসে বেড়ে ওঠা, বিপন্ন হেরোর দল বৃহৎ কোনও কিছুই চায়নি জীবনে। এমনকী বৃহৎ লড়াইও নয়। বিশাখার সঙ্গে প্রকাশ্যে যুদ্ধে নামেনি কোনও দিন। শুধু মনে-মনে বিষ ঢেলেছে বিশাখার প্রতি। মা ও বোনের ক্ষেত্রে সে বিষ যৌন-হিংসের তাড়নায় পেয়েছে বাড়তি মাত্রা।
বিশাখার সঙ্গে রোহিতের বাড়ির কেউ সামনা-সামনি কোনও দিন খারাপ ব্যবহার করেনি। বিরোধ ঘনিয়ে তুলতে গেলেও আত্মবিশ্বাস লাগে বলেই হয়তো, যেহেতু তাও ওদের নেই। আড়ালে-আড়ালে ওরা বিশাখাকে নিয়ে আলোচনা করছে, কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছে। বিশাখার অসভ্যতার উত্তরে বকুনি না-দিয়ে, কষেছে ফব্দি। কবে, কীভাবে মেয়েটাকে টাইট দেওয়া যায়!
বিশাখা ভেবেছিল, ওটমিল আর রুটির হাত ধরাধরি না-ই বা হল, এই সব মানুষের কাছে সে আপন হবে। কিন্তু সেটা হয়নি। তবে বাড়িতে তলে-তলে কোনও অশান্তির রেশ আছে, এমনটাও তার মনে হয়নি কোনও দিন। কারণ, সে সব নিয়ে সে তলিয়ে ভাবেইনি কোনও দিন। বরং, সে অনেক বেশি উত্তেজিত ও মগ্ন থাকত তার কলেজের খুঁটিনাটি পলিটিক্স বা বন্ধুদের কাণ্ড নিয়ে। তার মধ্যে সে পিএইচ ডি করার কথা ভাবছে। ইয়েটস আর রবীন্দ্রনাথ নিয়ে খুবই জটিল ও বায়বীয় একটা বিষয় বেছে নিয়েছে সে। কখন শাশুড়ি মুখ শুকিয়েছেন, কখন ননদ রেবতী চোখ ছলছল করে ভাতের থালা সরিয়ে দিয়েছে, সেসব নিয়ে তার ভাবার মতো মনের অবস্থাও ছিল না।
রোহিতও দিনদিন তার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তার সঙ্গেও বিশাখার এলেবেলে হা-হা হি-হি ছাড়া তেমন সিরিয়াস কথা হয় না তেমন। শ্বশুরগৃহে তারা থাকে, খায়, সংসার চালানোর টাকা দেয় মাত্র। দু'জনের কেউই বাড়ির সঙ্গে সেইভাবে সম্পৃক্ত নয়। দৈনন্দিন বাজার থেকে হেঁশেল আর জীবনধারণের টুকিটাকি সবই রোহিতের বাবা ও মা সামলান। তাতে বিশাখা বা রোহিতের কোনও সমস্যা নেই। রেবতীর সঙ্গে প্রথম থেকেই বিশাখার আড়ো-আড়ো-ছাড়ো-ছাড়ো সম্পর্ক। ঝগড়া নেই, ভাবও নেই। বিশাখার বিয়ের পর পর সে কম্পিউটার কোর্স করতে শ্যামবাজার যেতে শুরু করল। শোনা গেল, সেখানে একটি বয়ফ্রেন্ড জুটেছে তার! রেবতী সেই প্রেমিকের সঙ্গে মেসেজিংয়ে খুব ব্যস্ত থাকে। বিশাখা কলেজ থেকে প্রায় রোজই দলবেঁধে আড্ডা মারতে যেত এদিক-ওদিক। রাত ন'টার আগে কোনও দিন বাড়ি ফেরা হত না তার।
রোহিতের খবরের কাগজে দিন শুরু হয় বারোটায়। শেষ ক'টায়, তা অবশ্য কেউ জানে না। তাড়াতাড়ি শেষ যেদিন, সেদিন সে প্রেস ক্লাব না হয়ে বাড়ি ফেরার কথা ভাবতেও পারে না
এইভাবেই কাটল তাদের বিয়ের দ্বিতীয় বছর। বিশাখার বন্ধু-মহলে বিশাখার শাশুড়ির খুব সুনাম। এই যে তিনি বিশাখাকে এত স্বাধীনতা দিয়েছেন, সেটা সবাই ঘাড় নেড়ে নেড়ে প্রশংসা করে। বিশাখা অবশ্য ভ্রু নাচিয়ে বলে, "আমি একটা উদাহরণস্বরূপ। এটা মনে রাখিস। নারীবাদ মানেই শ্বশুরকুলের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ করা নয়। আমার বর খুশি, আমি খুশি। ওর বাড়ির সবাই খুশি। আমরা খুব ভাল আছি।"
এসব বিশাখা যখন বলছে, তখন হয়তো রোহিতের মা নারকেল কোরাতে-কোরাতে ভাবছেন, আমার ছেলেটার মুখটা যেন দিন-দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। চোখের তলায় কেমন কালি। আসলে বউয়ের তো স্বামীকে যত্ন করার সময় নেই। তার অবশ্য দোষ নেই। আজকালকার মেয়ে, পড়াশোনা শিখেছে, ঘরে তো আর বসে থাকতে পারবে না। তারপর আবার ওই সব ছাইপাঁশ খায়। ওতে নাকি সেক্স কমে যায়! নারী পুরুষের মধ্যে ওইসবের টান না-থাকলে সম্পর্ক দানা বাধে না। ছি-ছি-ছি... স্বাধীনতা দিয়ে শেষে এই পেলাম! মেয়েদের এই জন্যই বেশি বাড়তে দিতে নেই। মাথার ঠিক থাকে না। চাকরি করা মানে এই? সব সময় একটা কুছ পরোয়া নেই ভাব? অর্থাৎ, বিদ্বেষ নেই তেমন জোরালো। কিন্তু তলে তলে তীব্র বিরোধ।
বিয়ের ঠিক দু'বছর এক মাসের মাথায় পুলিনবাবু একদিন বিশাখাকে আলাদা করে ডাকলেন তাঁর ঘরে। বিশাখা তখন সবে মাত্র কলেজ থেকে ফিরেছে। মন ভার। তাদের দল গভর্নিং বডির ইলেকশনে হেরে গিয়েছে। হিসেবের বাইরে অন্য পক্ষ তিনটে ভোট পেয়েছে। কোন তিনজন তলে-তলে অন্য দল, সে নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছে বিশাখার দল। উত্তর পায়নি।
কাপের পর কাপ চা খেয়ে মুখ বিস্বাদ, খিঁচড়ানো মেজাজ নিয়ে বিশাখা বাড়ি ফিরল। দেখল, বাথরুমে জল নেই। 'পাম্প চালাও... জল নেই' বলে হাঁক পেড়ে সে ফের তিন বেইমানের চিন্তায় মগ্ন হয়ে গিয়েছিল। একা খাটে শুয়ে পা নাচিয়ে-নাচিয়ে সে মনে-মনে পরের স্ট্র্যাটেজি ভাবছিল।
রোহিতের সেদিন নাইট ডিউটি। স্নান

সেরে, স্কার্ট আর টি-শার্ট পরে খানিকটা বিরক্ত হয়েই বিশাখা পুলিনবাবুর ঘরে ঢুকে দেখল টিভি চলছে। দারুণ চড়া মেক-আপ করে একজন মহিলা চোখ মটকে বলছে, "নারী বুঝি শুধুই পণ্য?"

বিশাখা ব্যাজারমুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "বলো, কী বলবে, আমার মুড আজ টোটালি অফ।"

পুলিনবাবু জানতেন ইলেকশনের কথা। বললেন, "তোমরা হেরে গেছ নাকি? আহা, তাতে মন খারাপের কী আছে, সামনের বছর ঠিক জিতবে।"

বিপজ্জনক বোকা কথা বলেন পুলিনবাবু মাঝেমাঝে। বিশাখার সহনশীলতার ফিউজ একথায় পটাং করে উড়ে গেল। সে ধমকে উঠে বলল, "কী যে বলো না, তার ঠিক নেই। এটা কি খেলা পেয়েছ? সামনের বছর জিতব মানে?"

পুলিনবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বললেন, "বয়স আর একটু বাড়ুক, তখন বুঝবে এসব খেলাই। এসব বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা করো। ক্ষমতা দখল এক ধরনের মাঠ-ময়দানের লড়াই-ই বটে। তবে আরও নোংরা।"

বিশাখা খরখর করে বলল, "তুমি কলেজের পলিটিক্স বোঝো? ওরা পরিবেশ দূষিত করবে, আমাদের বসে-বসে দেখতে হবে সেসব। এনিওয়ে, তোমার সঙ্গে এ নিয়ে আমি কথা বলতে চাই না। রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোটাও একটা রাজনীতি। লিভ ইট। বলো, ডাকলে কেন?"

"বুলির বিয়ের কথা হচ্ছে, শুনেছ তো?"

বিশাখা প্রথমে কথাটা শুনতেই পেল না। তার হঠাৎ মনে হল, দেবাশিস হয়তো ওই তিনজন বেইমানের একজন। বিপুল দাস আর-একজন হলেও হতে পারে, কিন্তু তিন নম্বরটা কে? সুস্মিতা? পম্পা? নাকি প্রভাত মৌলিক? বিশাখা যখন এই তিনজনের দেহ-ভাষা, চোখের চাহনি, চাপা হাসির বিশ্লেষণে মগ্ন, তখন ঘরে ঢুকলেন রোহিতের মা। স্বামীর দিকে ভ্রুকুটি করে বললেন, "কী গো, বিশাখাকে এত বড় সুখবরটা এমনি মিনমিন করে দিচ্ছ কেন? আর বিশাখার মুখে হাসি নেই কেন? ননদ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে ভেবে মন খারাপ? মন খারাপের দরকার নেই। প্ল্যানটা বলো ওকে... কী গো, বলোনি তো এখনও বুলির খবর?"

বিশাখা ভ্যাবলার মতো তাকিয়ে আছে। দেবাশিসের মুখ দুলতে-দুলতে হারিয়ে যায়। ঠোঁট কামড়ে বিশাখা বলল, "কোন খবর? কী হয়েছে? বুলি চাকরি পেয়েছে নাকি?"

মা হেসে উঠে বললেন, "নাগো না, আরও জবর খবর। বুলির বিয়ে ঠিক হয়েছে।"

বিশাখার মাথা থেকে এবার কলেজ সম্পূর্ণ অপসারিত। সে বলল, "ও মা! নিজের পায়ে না-দাঁড়িয়ে বিয়ে? কেন? এত তাড়া কিসের ওর? কার সঙ্গে বিয়ে? আমি তো কিছু জানি না।"

পুলিনবাবু টিভিতে মন দেন। টোম্যাটো সসের অ্যাড দেখতে থাকেন হাঁ করে। আলোচনা শুরু করে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর। এবার হাল ধরে নেবে স্ত্রী। মনে-মনে যদিও তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। মেয়েটা এখনও ছেলেমানুষ। অনেক ঘা খাবে! তিনি জানেন, তিনি পলায়নবাদী। মেয়েটা ভাবে, তারাই পালায়, যাদের ব্যক্তিত্ব নেই। জানে না, কিছু-কিছু জায়গায় হাসতে-হাসতে পালাতে পারতেও সাহস লাগে। এই মেয়েটার অনেক দোষ, কিন্তু এর ভেতরটা নিখাদ। একটু বাদেই মেয়েটাকে বধ করা হবে তাঁর সামনে। তিনি মেয়েটির পক্ষ নিয়ে একটা কথাও বলতে পারবেন না।

"শোনো বিশাখা, বুলির সঙ্গে কম্পিউটার পড়ে, প্রসেনজিৎ, ওর সঙ্গে বুলির ভাব হয়েছে। কিন্তু ছেলেটির বাড়ির অবস্থা তেমন নয়... ও এ বাড়িতে ঘরজামাই থাকবে। ছাদের ওপর একটা ঘর তুলতে হবে... বুঝতেই পারছ, মিনিমাম লাখখানেক টাকার ধাক্কা। প্রসেনজিৎয়ের বাড়ি থেকে বিয়েতে একটা পয়সাও নেবে না... ঘরটুকু তোলার যা খরচ... মেয়েকে শাঁখা-সিঁদুরে নিয়ে যাবে... তুমি তো জানোই, জমা টাকা আমাদের নেই... এত অঙ্কের ওপর দিয়ে মেয়েকে পার করতে পারব... বাবুর তো একটা দায়িত্ব থেকেই যায়।"

বিশাখা স্তব্ধ হয়ে শুনছিল শাশুড়ির কথা। শাশুড়ির যা-যা বলার ছিল, বলা হয়ে গেল। বিশাখা টুঁ শব্দটি করল না। শাশুড়ি ঠোঁট চাটলেন, স্বামীর দিকে তাকালেন। তারপর ধপ করে বিছানায় বসে পড়ে বেড কভারের ওপর হরিণের দৌড় দেখতে লাগলেন। বললেন, "কী গো? তুমি তো পুরো স্ট্যাচু হয়ে গেলে! তুমি বাড়ির বউ, তোমার তো একটা মতামত আছে, নাকি?"

৩

সমুদ্রর সঙ্গে ভালবাসাবাসির তুঙ্গ মুহূর্তে ঋ প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়ল। এ কান্না কিছু হারানোর কান্না। প্রতিবার অর্গ্যাজমের পর ঋষিকার কান্না নতুন কিছুও নয়। হতে পারে ঋ-র অচেতন জুড়ে থাকে অ-সম বিয়ের হাহাকার। হতে পারে সমুদ্রর সঙ্গে লগ্ন হয়ে থাকার আনন্দের পরতে-পরতে মিশে থাকে চোরা বিপন্নতা। সঙ্গমের পর সব মেয়েই কাঁদে কি না, ঋষিকার জানা নেই।

ঋষিকা কাঁদে। আর কেঁদে লজ্জা পায়। ব্যাকুল হয়ে পড়ে সমুদ্রর কথা ভেবে। এই কান্নার কারণে সমুদ্র কষ্ট পাবে না তো? মেয়েদের শেখাতে হয় না। কিন্তু তারা জানে, সঙ্গমের পর, মুখ হাসি-হাসি রেখে স্বামীদের বুঝিয়ে দিতে হয়, স্বামীটি যথেষ্ট পুরুষ! নারীকে সে পরিতৃপ্ত করার ক্ষমতা রাখে।

বেচারা সমুদ্র! প্রথম দিকে ঘাবড়ে গিয়ে ভেবেছিল ঋষিকা কোথাও ব্যথা-ট্যাথা পেয়েছে বোধহয়। আজকাল অবশ্য সে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে ঋ-র এই কিম্ভূত আচরণে। সে আত্মবিশ্বাসী হালকা চালে বলে, এ নাকি কামের আনন্দাশ্রু!

তাও হতে পারে, কিন্তু ঋষিকার মনে হয় প্রতিবার সঙ্গমের পর সে কিছু হারিয়ে ফেলল চিরদিনের মতো। কিছু যেন তাকে ছেড়ে গেল জন্মের মতো। কাঁদছিল ঋ। শব্দহীন, বুক মোচড়ানো কান্না। বিয়ের তিন-চার বছর পেরলে, তিরিশের দোর ধরে দাঁড়ানো সব মেয়েই এই কান্না কাঁদতে শিখে ফেলে ঠিক ঠিক। সঙ্গমের ঠিক পর মুহূর্তে না হলেও, শেখে ঠিক। একে এই কান্না নতুন কিছু নয়, তার ওপর সমুদ্র একটু অস্থির ছিল আজ। পারফরম্যান্স অ্যাংজাইটির যথাযথ বাংলা কী হতে পারে, ভাবছিল সে।

শান্তর সঙ্গে আজ দুপুরে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। শান্ত মেসেজ করল সে আসতে পারছে না। বিতান বসু মারা গিয়েছে। সেখানে যাচ্ছে সে। ঋষিকাও একটু বাদে জানিয়েছিল জে-লোর সঙ্গে সে বিতানের বাড়ি যাচ্ছে। বিতানের সব কবিতাই যে খুব মন দিয়ে পড়েছে সমুদ্র, এমনটা বলা যাবে না। কিন্তু বিতানের প্রতি তার একটা আকর্ষণ ছিল। কবিতা-কেন্দ্রিক সে আকর্ষণ নয়। বিতানের ব্যক্তিত্বের প্রতি টান। লোকটার বুদ্ধি, পড়াশোনা আর জীবনটা নিয়ে খেলার প্রবণতা সমুদ্রকে খুব আকৃষ্ট করত।

বিতানের সঙ্গে তার বয়সের তফাত অনেক। সেই অর্থে বিতানের ঝমঝমে যৌবনের দিন সমুদ্র দেখেনি। নব্বইয়ের দশকে বিতান ও তার চালা-প্যালারা যখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কলকাতার হেঁয়ালি ভরা উঠোন আর নেশাতুর লাস্ট মেট্রো, তখন সমুদ্র একেবারেই নিপাট ভাল ছেলে। ইঞ্জিনিয়র হওয়ার জন্য এ কোচিং থেকে ও কোচিং মিনিবাস, খুচরো পয়সা, নরম দাড়ি, মাঝরাত্তিরে পায়জামার ভাঁজে-ভাঁজে তুমুল গিল্ট ট্রিপ... বড়লোকের ছেলে,

এবড়ো-খেবড়ো জীবন কাকে বলে জানতই না সে।

কলেজে পড়ার সময় ঋষিকার সঙ্গে আলাপ হল। সময়মতো বিয়েও হয়ে গেল। ঋষিকার পারিবারিক চালচিত্র একেবারেই সাদামাটা, মফস্‌সলি। ঋষিকাকে দেখতেও খুব সাধারণ। সমুদ্রর মা আর রাকা ঋষিকাকে দেখে খুব হতাশ হয়েছিল। বাবা অবশ্য কিছু বলেননি। বাবা চিরকালই এড়িয়ে চলা মানুষ, তিনি কিছু বললেন না সমুদ্র জানত। কিন্তু মা আর রাকার কাছ থেকে প্রতিরোধ এল না-দেখে সে অবাক হয়েছিল একটু। পরে বুঝতে পেরেছিল, আসলে তাদের পরিবারের সবাই একটু নির্লিপ্ত, ছাড়া-ছাড়া। ভাবখানা, যে যেমন পারো বাঁচো!

ঋষিকা কি খুব অ-সুন্দর? কই তার তো তেমন মনে হয় না! কেন মনে হয় না? সে কি ঋষিকার ব্যাপারে অন্ধ, নাকি? বোধিরূপ অবশ্য অন্য কথা বলে... নাঃ, বোধিরূপ তার বউয়ের বিষয়ে কী বলে, তা করেছিল সমুদ্র। বোধিরূপ কোনও উত্তর দেয়নি। বোধিরূপ এই কবিটিকে পছন্দ করত না। বোধিরূপ তার ব্যাপারে বড্ড বেশি রকমের পোজ়েসিভ। বোধিরূপ শাশ্বকেও পছন্দ করে না। এসব বোধিরূপের বাড়াবাড়ি। সমুদ্র এই সব বাড়াবাড়ি এড়িয়ে থাকতে চায়। সমুদ্র চায় জীবনের সব হবে মাপ মতো। সে কোনও কিছুতে ভেসে যাওয়ার বিরোধী। সে আসলে প্রতিষ্ঠানের ভক্ত। বিবাহ, পরিবার, সমাজ... এই সমস্ত খুব জরুরি স্তম্ভ বলে মনে করে সমুদ্র। এই সব স্তম্ভকে সমীহ করলে জীবন সহজ হয়। জীবনে সুখ থাকে। থাকে শান্তিও। সমুদ্র বিশ্বাস করে, প্রতিষ্ঠান দেয় অনেক। নেয় কম। বিতান বা বোধিরূপ যে সব ভাঙাভাঙির কথা বলে, সে সব সমুদ্র বিশ্বাস করে না। প্রতিষ্ঠানের রাজনীতি আর রাজনীতির প্রতিষ্ঠান নিয়ে বিতানের সঙ্গে তীব্র মতবিরোধ হয়েছিল তার একদিন। বিতানের সঙ্গে তর্ক করতে সমুদ্রর ভাল হয়েছিল।

সেদিন ছিল বিতানের জন্মদিন। একটা প্রোমোটার শ্রেণির লোককে ধরে বিতান কাকুতি-মিনতি করছিল। স্কচ খাওয়ার জন্য। বিতানকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানতে এল এক নবীন কবি। সুন্দর দেখতে মেয়েটির দিকে এক ঝলক তাকিয়েই সমুদ্র বুঝেছিল, মেয়েটি বিতানের জন্য বলিপ্রদত্ত। প্রোমোটারের সঙ্গে ডিল করল বিতান। বিতানের বাড়ি যাবে পুরো দল। সেখানে স্কচ হবে। তারপর প্রোমোটারের সঙ্গে মেয়েটিকে একা থাকার সুযোগ করে দেওয়া হবে।

সমুদ্রর ভেতরটা বিতৃষ্ণায় ভরে গিয়েছিল। বাপমষ্টী এই কবি শুধুমাত্র স্কচের লোভে একটা মেয়েকে এভাবে ব্যবহার করতে পারে? জন্মদিনের পার্টি থেকে কোনও রকমে রাগ সামলে চলে এসেছিল। মাসছ'য়েক পর সেই প্রোমোটারের সঙ্গে একটা বুক লঞ্চ পার্টিতে দেখা হয়েছিল সমুদ্রর। সেখানে বিতান ছিল না। কিন্তু সেই যুবতী কবি ছিল। বোঝাই যাচ্ছিল, প্রোমোটারের সঙ্গে মেয়েটির দারুণ সখ্য। পরে বিষয়টা নিয়ে ভেবে দেখেছে সমুদ্র। বিতানের ওপর তখন আর তেমন রাগ হয়নি। ব্যাপারটাকে হয়তো নির্ভেজাল 'মেয়ে সাপ্লাই' বলা যাবে না। বিষয়টার মধ্যে প্যাঁচ আছে। আছে অন্য জটিল পরতও। 'সাপ্লাই' হতে চাইলে মেয়ে বা ছেলে, কাউকেই ঠেকানো যায় না, যদি পোষায় দরে।

সমুদ্র জানে, 'বদ' ও 'খারাপ'-এর প্রতি তার আসক্তি আছে। আর সেই অ্যাট্রাকশানই হয়তো তাকে ঋষিকার সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। ঋষিকা আর ঋষিকার কনট্রাস্ট সামলাতে তার ভাল লাগে। মনে হয়, তরতরিয়ে চলা জীবনে বেশ কনফ্লিক্ট আর চ্যালেঞ্জ সামলানো গেল। সেই বিতান বসুকে শেষ বিদায় জানিয়ে এসে ঋষিকা তার কাছে শরীর চেয়ে বসবে, এই আকস্মিকতার জন্য সমুদ্র তৈরি ছিল না। শরীর জাগবে কি না, সে জানত না। ঋষিকার মুখ রাখতে সাড়া দিয়েছিল মাত্র। তারপর দেখল, সে বেশ পারল। এখন সুচারু প্রেমিকের রোল ঠিকঠাক প্লে করতে-করতে ভাবছে, এই অমোঘ দু'টি ইংরেজি শব্দ নিয়ে। নাঃ, যৌন-উদ্বেগ বড় চাঁছাছোলা। কী হতে পারে পারফরম্যান্স অ্যাংক্সাইটির যথার্থ ভাবানুবাদ?

ঋষিকার শরীরটা কাঁপছিল। নিঃসরণের সময়ে ছেলোর আর তত অ্যালার্ট থাকে না। তাই সমুদ্র বুঝতেই পারল না ঋষিকা আজও কাঁদছে। যথার্থ ফোর-প্লে ছাড়াই সে তার দায়িত্ব পালন করতে পেরেছে,

ঋষিকার পারিবারিক চালচিত্র সাদামাটা, মফস্‌সলি। ঋষিকাকে দেখতেও খুব সাধারণ।

সমুদ্র ভাবতে চায় না। সমুদ্রর কাছে বিবাহ অতি পবিত্র এক বন্ধন। সেখানে তৃতীয় ব্যক্তির ঢোকার এক্তিয়ার নেই। ঋষিকাকে সে এখনও খুব ভালবাসে। রুকু আর ঋষিকাকে বাদ দিয়ে তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এসএসকেএম হসপিটালের কাছে বিতানের একটা নিজস্ব ঠেক ছিল। সেখানে শাশ্বর সঙ্গে সমুদ্র গিয়েছে দু'-একবার। অনেকেই আসত সেখানে। তারা সবাই লেখক, শিল্পী বা কবি। সমুদ্র আর শাশ্ব কস্মিনকালে লেখালেখি করেনি। তেমন জমিয়ে বাংলা সাহিত্য পড়েওনি। তবু তারা দিব্যি জমে যেত সেই সব কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে। তার ভিতরে এই 'অন্য-ধারা' কীভাবে বাসা বাধল কে জানে? বিতান বার দু'য়েক সমুদ্রর বাড়িতেও এসেছে। লোকটা এমন দুম করে মরে গেল, সমুদ্রর মনটা খারাপ লাগছিল খবরটা পেয়ে।

বোধিরূপকে খবরটা দিতে মেসেজ লাগত। আসলে সমুদ্র খুব ফরমাল। তর্ক করতে-করতে বেফাঁস, আলটপকা কথা নিজেও বলে না, অন্য কেউ বললে আস্তে-আস্তে চুপ করে যায়। বিতান কোনও দিন ব্যক্তিগত আক্রমণ করত না তর্কে হেরে গিয়ে। বিতানকে ভাল লাগার এটা একটা কারণ বইকি। বিতান ছিল তার ভাবনার বিরোধীপক্ষ। কিন্তু অবশ্যই ভদ্র বিরোধী। মনের অন্দরে বা জীবনের মূলকেন্দ্রে সমুদ্র কোনও দিন বিপ্লব চায় না। বিতান বা বোধিরূপের মতো 'অপর' চরিত্র জীবনে প্রয়োজন আছে। তারা দমকা বাতাস। কিন্তু তারা জীবন নয়। তার জীবন মানে ঋষিকা, রুকু, তার পরিবার, চাকরি, সচ্ছলতা, বছরে একবার ইউরোপ ভ্রমণ ইত্যাদি। ঋষিকা খুব ভাল মেয়ে। সহজ, সরল, সেনসিটিভ, সৎ ও সাদামাটা। ওকে ভালবাসতে ভাল লাগে সমুদ্রর। বিতানকে সব সময় ভালবাসা সম্ভব হত না। বিরক্ত লাগত। একবার গায়ে হাত তুলতেও ইচ্ছে

ঋষিকার শীৎকার, সমুদ্রকে নিশ্চিন্ত করল। তৃপ্তির ঘাম মুছে আধো-অন্ধকারে একটা সিগারেট ধরাল সে। তারপর ঠিকঠাক বিরতি নিয়ে আত্মবিশ্বাসী পায়ে ঢুকে গেল বাথরুমে।

এই বিরতি কতটুকু দীর্ঘ হবে, সেটা জরুরি। সঙ্গমের ঠিক কতক্ষণ পরে স্বামী নিজেকে বিযুক্ত করবে স্ত্রী-র আলিঙ্গন থেকে, এ বিষয়টা আপাতদৃষ্টিতে প্রাধান্য পায় না। কিন্তু বিষয়টা খুব উল্লেখযোগ্য। ঝটপট কাজ শেষ করে সরে যাওয়া ছেলেকে কোনও মেয়ে ভাল চোখে দেখে না।

প্রায় সাড়ে সাত মিনিট পর বাথরুম থেকে বেরিয়ে সমুদ্র দেখল ঋ তখনও একইভাবে শুয়ে।

"আর একবার চাই মনে হচ্ছে?"

আড়মোড়া ভেঙে লেপের ভেতর ঢুকে ঋ-র তলপেটে হাত রেখে বলল সমুদ্র।

ঋ ততক্ষণে কান্না গিলে ফেলেছে। কিন্তু বিচ্ছিরি মন খারাপের মেঘ ধীরে-ধীরে গিলে ফেলছে তাকে। ঋ কিছু বলল না। কিছু বলতে ইচ্ছে করছে না তার এখন। তাকে রেহাই দিতেই হয়তো ঠিক এ সময়েই বালিশের নীচে শোয়ানো সমুদ্রর ফোনটা কেঁপে উঠল। রেশ হুঙ্কারক এই ফোনে অন্য কোনও মেয়ে রেগে যেত। কিন্তু ঋ-র স্বস্তিই হল। আবার বিতান ফিরে এল তার ভাবনায়। সমুদ্র বিতানকে কতটা চিনত? একসঙ্গে মদের ঠেকে গিয়ে আড্ডা মারা বা অ্যাবস্ট্রাক্ট সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেই একটা লোককে চিনে নেওয়া যায়? বিতান লোকটাকে কেউ ঠিকঠাক চিনত কি না ঋষিকার সন্দেহ আছে। সমুদ্রর সঙ্গে বিতানের চারিত্রিক কোনও মিলই নেই... তবু যেন লোকটার প্রতি সমুদ্রর কেমন চোরা ভাল-লাগা ছিল। কেন কে জানে?

সমুদ্র বড় চাপা মানুষ ঋষিকারই মতোই। কোনও দিন স্পষ্ট করে এ বিষয়ে কথা হয়নি। হঠাৎ ঋষিকার মনটা ভাল হয়ে গেল। তার আর সমুদ্রর মিলের জায়গাটা খুঁজে পেয়ে বড্ড স্বস্তি হতে লাগল তার। সে এই মিলটুকুকে জাপটে ধরতে চাইছে। অসম বিয়ের কমপ্লেক্স কাটাতে এই মিলটুকুই তার যথেষ্ট মনে হল। সেই স্বস্তিবোধ, খানিকটা শোক, খানিকটা 'কী যেন হারালো' ভাব মিলেমিশে এখন তাকে সমুদ্রর থেকে আলাদা করতে চাইছে। একটু দূরত্ব রচনা করে সে সমুদ্রকে ভালবাসতে চায়। উঃ, এত সুখ, এত কষ্ট!

ফোন কলটা তাকে সেই সুযোগ করে দিল। নির্ভার পা ফেলে-ফেলে ঋ বাথরুমের দিকে হাঁটা দিল।

"বোধির কল, নেব?" জিজ্ঞেস করল সমুদ্র।

বাথরুমে ঢুকে পড়ার আগে ঋষিকা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সমুদ্রর দিকে। বলল, "নাও না। ঘুমোতে যাওয়ার আগে মেয়েদের শরীর আর কর্পোরেট কেচ্ছা দু'টোই ইকুয়ালি জরুরি," এখন তার কণ্ঠে বা দেহভঙ্গিতে কান্নার লেশমাত্র নেই।

সমুদ্র বউয়ের দিকে একটা উড়ন্ত চুমু ছুড়ে দিল। তারপর নিশ্চিন্ত মনে ফোনটা নিয়ে প্রায় আহত প্রেমিকের স্বরে বোধিকে বলল, "বল বোধি... আজ এত রাত হল যে!"

বোধিরূপকে মনে-মনে ধন্যবাদ দিল ঋষিকা। বোধিরূপ রোজ রাতেই এ সময় ফোন করে। সমুদ্রর সঙ্গে এক অফিসে

বাথরুমে গিয়ে স্নানের তোড়জোড় করে ফেলল ঋ। আজ অনেক ধুলো ঘাঁটা হয়েছে।

কাজ করে সে। অফিসের কাজের কথা বলার সময় সমুদ্র রোজ বারান্দায় চলে যায়। ঋকে বরের অফিস-সংক্রান্ত ভ্যাজর-ভ্যাজর শুনতে হয় না। আর কী আশ্চর্য! সমুদ্র রোজই বোধির ফোন ধরার আগে বউয়ের পারমিশন নেয়!

বাথরুমে গিয়ে আর-একবার স্নানের তোড়জোড় করে ফেলল ঋ। আজ সারাদিন অনেক ধুলো ঘাঁটা হয়েছে। শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে, জলের প্রথম আলিঙ্গনে সে আলতো করে চাপ দিল নিজের বাম স্তনে। মনে-মনে বলল, "নাও সমুদ্র, আমার সবটা নাও। আমায় নিঃস্ব করে দাও। এতটা ফাঁকা করে দাও যাতে ভাবতেও ভুলে যাই মানান, বেমানান, সমান, অসমান, আসমান, জমিন।"

কথাটা ভাবার সঙ্গে-সঙ্গে ঋ হাসতে শুরু করল ভীষণ জোরে। কী মারাত্মক ভিজে-ভিজে প্রেমের সংলাপ ভাবে সে আজকাল। বাংলা সিরিয়ালের লেখকদের বুঝি এই হালই হয়! গভীর ক্রাইসিসের মুহূর্তে জোলো আর মোটা দাগের প্রেমের লাইন অকারণ চলে আসে মনের মধ্যে।

স্নান করতে-করতে ঋ নিজেকে বাথরুমের বড় আয়নাটাতে দেখছিল। নাঃ, ভাল লাগানোর মতো তেমন কিছুই নেই তার চেহারায়। এত সাদামাটা, এত সাদামাটা! কী দেখে সমুদ্র পছন্দ করেছিল তাকে, কে জানে? তবু তো এখন খানিক টাকার চাকচিক্য লেগেছে শরীরে। কলেজে পড়ার সময় আরও রোগা আর কালো ছিল সে। আরও গোবেচারা।

বাড়ির অবস্থা কোনও দিনই বলার মতো কিছু নয়। বাবা রিটায়ার করে গেলেন ক্লাস ইলেভেনে পড়ার সময়। বড়দা সে বছরেই সরকারি চাকরি পেয়ে গেল বলে না-খেতে পাওয়ার অবস্থা হয়নি কোনও দিন। কিন্তু ঋষিকা মনে-মনে জানত, তারা সবেতেই খুব সাধারণ। মফস্‌সলের মেয়ে। হায়ার সেকেন্ডারির রেজাল্টটা হল খুব ভাল। দাদা বলল, কলকাতায় পড়তে আসার কথা। নিজের চেহারা নিয়ে আলাদা করে কিছু ভাবনা ছিল না কোনও দিন। বিয়ে-টিয়ের স্বপ্নও তেমন কিছু দেখেনি। ভাল কলেজে পড়তে আসছে, কলকাতায় হস্টেলে থাকবে, সে সব নিয়েই বরং বেশি চিন্তিত ছিল সে সব সময়। এছাড়া ছিল মনের গভীরে একটা ইচ্ছে। রক্তিমকে একবার দেখার ইচ্ছে!

বাংলা মিডিয়ামে পড়াশোনা করা মেয়ে ঋষিকা। মেয়েদের স্কুলে ছেলেদের সঙ্গে মুক্তমনে বেড়ে ওঠার কোনও সুযোগ পায়নি সে। তাছাড়া তাদের সময় ছেলেদের সঙ্গে এত অবাধ মেলামেশার সুযোগও ছিল না। মেয়ে কার সঙ্গে মিশছে, সে বিষয়ে ঋষিকার মায়ের কড়া নজরদারি ছিল। বাড়ির ঠিক করে দেওয়া রিকশায় স্কুল, কোচিং ক্লাসে যাওয়া-আসা। একেবারে ঘড়ি ধরে।

এই সব ক্ষেত্রে যা হয়, ঋষিকার ক্ষেত্রেও ঠিক তাইই হল। ঋষিকার প্রথম প্রেমিক হল তার মাসতুতো দাদা। নিজের মাসির ছেলে নয়, মায়ের মামাতো বোনের ছেলে ছিল রক্তিম। মায়ের মামাতো বোনের বিয়ে হয়েছিল বড়লোক বাড়িতে। ঋষিকার মাকে সেই বোন একেবারেই পাত্তা দিত না। রক্তিমের যখন ক্লাস সেভেন, তখন হঠাৎ করে রক্তিমের বাবা মারা গেলেন। মাসিকে চাকরি নিতে হল। কলকাতায় শ্বশুরবাড়িতে রক্তিমকে রেখে মাসি চলে এল নিউ

আলিপুরদুয়ার। ডায়েড ইন হারনেস কথাটা সেই প্রথম শুনেছিল ঋষিকা। মৃত স্বামীর জায়গায় অনুকম্পায়ী চাকরি পেয়েছিল মাসি।

নিউ আলিপুরদুয়ার আসার পর জলপাইগুড়ির গরিব বোনের কথা মনে পড়ল মাসির। যোগাযোগ ফের স্থাপিত হল অবস্থার ফেরে।

রক্তিম কলকাতায় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়েছে। থেকেছেও বরাবর কলকাতাতেই। ক্লাস টেনের বোর্ড পরীক্ষার শেষে, আলিপুরদুয়ারে মায়ের কাছে থাকতে এসে রক্তিম ব্যাপক বোর হচ্ছিল। মুখ পাল্টাতে তাকে জলপাইগুড়িতে মাসির বাড়ি নিয়ে এল তার মা। সাত দিনের জন্য। আর ঠিক আড়াই দিনের মাথায় রক্তিম আর ঋষিকার প্রেম হয়ে গেল!

ঋষিকা তখন ষোলো বছরে। পরের বছর সেও মাধ্যমিক দেবে। এই দাদাটিকে এর আগে কস্মিনকালে দেখেনি সে। হঠাৎ করে রক্তিমকে দাদা মেনে নিতে সায় দিল না তার মন। শহরের এই উদাসী, চুপচাপ ছেলেটিকে তার মনে হল স্বপ্নের মানুষ। বুক কাঁপল। কাঁপল চোখ। রোগা আর কালো মেয়েটার মনে হতে লাগল, তার থেকে কুৎসিত এ জগতে আর কেউ নেই! সেই প্রথম তার চেহারা-সচেতনতা। সেই প্রথম তার কেমন যেন এটা হীনমন্যতায় ভুগতে শুরু করা।

রক্তিমের মুখে তখন সব সময় ছুঁয়ে থাকে হাল্কা বিষাদের পরদা। চুল লম্বা-লম্বা, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। আর হাতে ধরা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা।

শনিবার ছিল সেটা। শেষ বিকেলে দুলালকাকার রিকশা এসে থামল ঋষিকাদের বাড়ির সামনে। ঋষিকা তখন বাড়ির উল্টোদিকে, শ্যাম্পুদের দাওয়ায় বসে স্কুলের নতুন অঙ্ক দিদিমণির বাচনভঙ্গির নকল দেখছে। শ্যাম্পুর অভিনয়-ক্ষমতার তুলনা নেই। নিরীহ মুখে সে অন্য লোকের নির্ভুল নকল করে দেখাতে পারে। ঋষিকা দেখছে আর হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

শ্যাম্পু তখন শাহরুখ খান। শ্যাম্পু তখন অঙ্কে বাইশ। পাড়াবেড়ানি, লুকিয়ে পর্নোগ্রাফি, মার্কামারা মফস্সলি রাইকিশোরী। ঋষিকার ঠিক উল্টো পিঠ। অকুতোভয়, ফাজিল ও টরটরে। তবু তারা হরিহর-আত্মা। একে অন্যকে চোখে হারায়। শ্যাম্পুরা চার বোন। বোনদের নাম ভারী মজার! শ্যাম্পু, খেলনা, রিবন আর লকেট! আর ভাল নাম সব সেকেলে—হেমাঙ্গিনী, শ্যামাঙ্গিনী, কাজললতা আর রাধারানি। বাবা নেই। মা এই চার মেয়ে নিয়ে যারপরনাই বিব্রত। শ্যাম্পুদের দাওয়ায় বসে মুখ তুলে তাকালেই ঋষিকাদের বাড়ির মলিন সদর দরজা। মাসিকে বোধহয় ওদের দু'জনের কেউই দেখেনি। রক্তিমকে আগে কে দেখেছিল, জানা নেই। তবে সাবলীল ও বাচাল শ্যাম্পু হঠাৎ স্ট্যাচু হয়ে গিয়েছিল। ওর নজর অনুসরণ করে ঋষিকাও। ঠিক বারো সেকেন্ডের বিরতি দিয়ে সে শ্যাম্পুর দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাশে হাসি হেসেছিল।

শ্যাম্পু চোখ পিটপিটিয়ে বলল, "তোদের বাড়িতেই তো এল রে। তোদের আত্মীয়?"

ঋষিকার হাসি তখন তার কণ্ঠ ছুঁয়েছে। বলল, "আমি তো জানি না। কোনও দিন দেখিনি এর আগে।"

"দেখেই বোঝা যায় বড়লোক। ছেলেটা কী স্মার্ট। তোদের বুঝি এমন সব আত্মীয় আছে? কোনওদিন বলিসনি তো।"
ঋষিকা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। মৃদু স্বরে বলল, "আমি সত্যিই এদের চিনি না। যাই, দেখি গিয়ে।"
শ্যাম্পু রাগী-রাগী চোখে তার দিকে তাকিয়েছিল। তার মোটেই বিশ্বাস হচ্ছিল না ঋষিকার কথা। টাকাওয়ালা আত্মীয় থাকা বা না-থাকার ছাপ সম্পর্কে পড়ে বইকি।
শনিবার মাসির হাফ-ডে। এক হাফ-ডে-তে ছেলেকে দিয়ে গেল মাসি। রবিবার থেকে সোমবার চলে গেল অফিস করতে। বলে গেল পরের হাফ-ডে-তে এসে ছেলেকে নিয়ে যাবে।
দশ বছরের পুরনো ঘটনা। আজ এত দিন পরও, এত পথ পেরিয়ে এসেও, ঋষিকা, হাফ-ডে শব্দটা শুনলেই অবধারিত উন্মনা হয়ে পড়ে।
প্রথম সন্ধেতে আড়ে-আড়ে চাওয়া, বুক ধুকপুক। পরদিন সন্ধেবেলা করলা নদীর ধারে বেড়াতে যাওয়া। তিন নম্বর সন্ধ্যায় ছাদে শাড়ি-জামা তুলতে গিয়ে এক কোণায় গভীর আলিঙ্গন। রক্তিম কাঁপা-কাঁপা হাত ঋষিকার বুকে রেখে বলল, "ডার্ক লেডি, ডার্ক লেডি, উইল ইউ লেট মি কিস?"
সন্ধে নামলেও চশমার পিছনে রক্তিমের ঝকঝকে চোখ দেখতে পাচ্ছিল ঋষিকা। ওই চোখ কখনও মিথ্যে বলতে পারেই না। এত দিন ঋষিকা জানত সে অসুন্দর, কালো। শহরের এই শান্ত, গভীর ছেলেটির চোখ বলল না তো সে কথা। আর এমন সুন্দর করে চুমু খাওয়ার কথা বলা যায়?
ঋষিকার মনে হল, রক্তিম তাকে, চুম্বনের ইচ্ছে নয়, একখানা আস্ত কবিতার লাইন উপহার দিল।
বাকি চারদিনে কিস হল, কবিতা পড়া হল, অকাল-বৃষ্টিতে ভিজে সর্দি বাঁধানোও হল। তারপর আর একটা হাফ-ডে পার করে মাসি এল জলপাইগুড়ি। সেই রবিবার মাংস রান্না করল ঋষিকা। সবাইকে পরিবেশন করে খাওয়াচ্ছে যখন, তখন রক্তিম জানাল তার খিদে নেই। কোনও রকমে এক পিস মাংস আর একটু ভাত খেয়ে সে ছাদে চলে গেল। টেবল ছেড়ে ওঠার আগে স্পষ্ট গলায় ঘোষণা করল, ঋষিকা যেন তার জন্য দই নিয়ে ছাদে যায়। ঘরের মধ্যে তার ভাল লাগছে না।
ঋষিকার কান ঝনঝন করছিল। এ দস্যুর মুখে সবই মানায়! কোনও রকমে নিজের খাবারটা গিলে-গিলে খেয়ে ঋষিকা ছাদে গিয়ে দেখল রক্তিম সেই ছাদের এককোণায় দাঁড়িয়ে আছে। দইয়ের বাটি ছিটকে ফেলে দিয়ে সে ঋষিকাকে চেপে ধরল তার সমস্ত শরীর দিয়ে। ঋষিকা ভয় পেয়ে কেঁদে ফেলেছিল। রক্তিম তখন তার চশমা খুলে ফেলেছে। রক্ত ছলকাচ্ছে তার সারা মুখে।
"রক্তিম, রক্তিম... শান্ত হ... শান্ত হ... ছাড় আমাকে... কেউ দেখে ফেলতে পারে... রক্তিম!"
রক্তিম বন্য বরাহের মতো ঋষিকাকে লন্ডভন্ড করছিল।
স্নান করতে করতে নগ্ন ঋষিকা আবার আয়নার দিকে তাকাল। আনমনে হাত চলে গেল তার গলার পাশটায়। এইখানেই ছড়িয়ে ছিল রক্তিমের দেওয়া লাল চাকা-চাকা শহুরে প্যাশন। অনেকক্ষণ পর সে যখন নেমেছিল ছাদ থেকে, তখন মা আর মাসি খাটে শুয়ে-শুয়ে গল্প করছে। বাবা গিয়েছে সেনবাবুদের তাসের আড্ডায়।
পরদিন ভোরবেলা ফের দুলালকাকার রিকশাতেই রক্তিম আর মাসি চলে গেল বাস স্ট্যান্ডের দিকে। ঋষিকার মনে হয়েছিল সে আর বাঁচবে না। রিকশার পেছনে-পেছনে ভূতে পাওয়া মানুষের মতো ছুটতে-ছুটতে যাচ্ছিল সে... তার সেই রিক্ত, বেহায়া ইমেজ আজও ঋষিকাকে রক্তাক্ত করে দেয়।
আজ স্নান করতে-করতে সে দৃশ্য মনে পড়তেই ঋষিকা নিজের স্বামীর নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠল।
কানে ফোন গুঁজে বাথরুমের দরজায় উঁকি মারল সমুদ্র। দেখল, শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে ঋষিকা অঝোরে কাঁদছে।
"আমি পরে কথা বলছি বোধি," বলে ফোন কেটে সমুদ্র বাথরুমে ঢুকল। অনুত্তেজিত ভঙ্গি তার। প্রথমেই শাওয়ারটা বন্ধ করল। তারপর গিজারের সুইচ। একটা মস্ত তোয়ালে দিয়ে ঋষিকার ভিজে দেহ জড়িয়ে দিতে-দিতে বলল, "এত ভেঙে পড়লে চলে? বিতান তো আমারও কাছের লোকই ছিল... আমি কিন্তু এতটা ভেঙে পড়িনি... তুমি এমন করছ কেন?"
ঋষিকা সামলে নিয়েছিল নিজেকে। বলল, "বড্ড অস্থির লাগছে সমুদ্র... কেমন যেন লাগছে... মন খারাপ ঠিক নয়... অসহায়... এই ভাবেও মরে যাওয়া যায়! কী নিঃস্ব! কী ফাঁকা... ওঃ সমুদ্র... আচ্ছা তুমি একবারও গেলে না কেন? ওর শেষ-মিছিলে যাবে তুমি?"
"নাঃ...মৃত বিতানে আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই!"
"ইন্টারেস্টের কথা বলিনি।.. কিন্তু আমরা প্রিয় মানুষের সঙ্গে তার শেষ যাত্রায় হাঁটব না?"
"বিতান আমার খুব প্রিয় ছিল কি না জানি না। বিতানের প্রতি আমার একটা টান ছিল।"
"টান তো ছিল। তাহলে? তাহলে যাবে না কেন?"
"ঋষিকা, আমার হয়তো এটাই দোষ। আমি এরকমই। বিতানের বন্ধুদের সঙ্গে হেঁটে-হেঁটে শোকপ্রকাশে আমার মন সায় দিচ্ছে না। বিতান নেই, ভবানীপুরের ঠেকটায় আর যাব না। বিতানের সঙ্গে আর তর্ক হবে না। কষ্ট হবে। কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। বিতানের শোক মিছিলকে আমি ছোট করতে চাই না, বাট... না ঋ, যাব না আমি। আমার সাজেশান নাও, তুমিও যেও না।.. চল, ঘরে চল, ঠান্ডা লাগবে।"
সমুদ্রর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঋষিকা বলল, "জানো, বিতান নাকি খুব বাথরুম-বিলাসী ছিল!"
সমুদ্র কখনও গালাগাল দেয় না। আজ কী ভেবে বলল, "শালা কমিউনিস্ট!"
ঋষিকা অবাক চোখে সমুদ্রকে দেখে। সমুদ্রকে সে কখনও মাপের বাইরে বেরতে দেখেনি। এই গালাগাল, এই উচ্ছ্বাস, একেবারেই অপ্রত্যাশিত। তাহলে কি সমুদ্রও ভেতরে-ভেতরে অস্থির হয়ে আছে?
"কী হল সমুদ্র? তুমি বিতানকে গালাগালি করছ? তাও আবার আজ? কী হল তোমার?"
"না ঋ। কিছু না। আসলে আমি অন্য একটা ব্যাপারে একটু... ওই.. ছাড় না.."
"আমাকে বলবে না, তাই তো?"
"আরে এসব অফিসের কুটকচাল। তুমি বুঝবে না। বাড়িতে অফিসকে ডেনে আনার কোনও মানেই হয় না।"
ঋষিকা আর চাপাচাপি করল না। সমুদ্র চাপা ও জেদি। তাকে দিয়ে তার অপছন্দের কাজ কখনও কেউ করাতে পারেনি। তবে আজ আর-একবার ঋষিকার মনে হল, সমুদ্রকে সে কোনও দিন ধরতেই পারেনি। সমুদ্র তাকে বিয়ে করেছে বটে। মাপ মতো সব দায়িত্ব পালন করে। ভালবাসার কথাও বলে মাঝেমাঝে, কিন্তু সমুদ্র আসলে অনেক দূরের মানুষ।
হঠাৎ ঋষিকার কেমন শীত করছে। সে মারা গেলেও কি সমুদ্র এভাবেই বলবে?
"হ্যাঁ, ঋষিকা আমার ভাল বউ ছিল বটে... কিন্তু খুব পছন্দ করতাম কি না জানি না... মৃত ঋষিকায় আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই!"
ঘরের লাগোয়া ড্রেসিংরুমে ঋষিকা তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিচ্ছিল। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে তার। এত শীত। এখন আবার রুকুকে নিয়ে বাজারে যেতে হবে।

রুকুর স্কুলে ক্রিসমাস পার্টি; তার জন্য কিছু কেনাকাটি আছে। কিন্তু রুকুর গলা শোনা যাচ্ছে না কেন? রুকু কি বাড়িতে নেই? শাশুড়ির সঙ্গেই বেরিয়ে গিয়েছে পার্টির সরঞ্জাম কিনতে? হতেও পারে। ঋষিকা সালোয়ারের দড়ি হাতে থমকে দাঁড়াল। অভিমান ছেয়ে ফেলছে তাকে। এ বাড়িতে সে কারও কাছেই প্রয়োজনীয় নয়। এত আদর, এত বৈভব তার প্রাপ্য নয় সেই জন্যই!

ঘরে পা দিয়ে ঋষিকা দেখল, সমুদ্র সেই একইভাবে বোধিরূপের সঙ্গেই বোধহয়, ফোনে কথা বলে যাচ্ছে। টেলিফোনে সমুদ্র এমনভাবে কথা বলে, পাশের লোকটাও কিছু শুনতে পাবে না। এই কায়দাটাও ঋষিকা শহরে এসে শিখেছে। তাদের মফস্সলে সবাই কী চিৎকার করে ফোনে। চটি পায়ে শাশুড়ির ফ্লোরে নেমে এসে ঋষিকা দেখল তার অনুমানই ঠিক। রুকু তার ঠাম্মামামের সঙ্গে বাজারে বেরিয়েছে। শ্বশুরমশাই গিয়েছেন তাঁর ভাগ্নের বাড়ি। রাত-দিনের কাজের মেয়েটি হাঁ করে বসে তার লেখা সিরিয়াল গিলছে। ঋষিকাকে দেখে ত্রস্ত হয়ে বলল, "বউদি, কী দারুণ ফুটিয়েছ গো চরিত্রগুলো... এই দ্যাকো গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।"

"গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, সোয়েটার পরিসনি বলে। ঠান্ডা লাগাবি এবার। সোয়েটার পরে সিরিয়াল দ্যাখ।"

মিনতি হি-হি করে হেসে গায়ের শালটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিল। বলল, "আমাকে একবার এই মেয়েটার সঙ্গে আলাপ কইরে দেবে? পায়ের ধুলু নিতাম গো.... ও! কী তেজ। মা দুগগা গো!"

ঋষিকার মেজাজটা ফট করে গরম হয়ে গেল। বাড়ির কাজের লোক, তাকে নিয়ে সে শুটিং ফ্লোরে যাবে! তার একটা প্রেস্টিজ নেই!

"সে হবেখন। তুই সিরিয়াল শেষ কর এবার। রুকুর চিকেন স্টু হয়েছে? ও ফিরে এসে খেতে বসবে। কাল স্কুল আছে ওর।"

ঋষিকা আর দাঁড়াল না মিনতির কাছে। হনহন করে রান্নাঘরে চলে গেল। রক্তিমের সঙ্গে ঋষিকার কিছুদিন চিঠি মারফত গাঢ় প্রেমের আদান-প্রদান চলেছিল। তারপর চিঠিতে ভাটা পড়ল এবং বছরখানেকের মধ্যে রক্তিম আর ঋষিকার গল্পটা একেবারেই সমাপ্তি ঘোষণা করে দিল। প্রেমের তীব্রতার সঙ্গে তার আয়ুর দৈর্ঘ্যের কোনও আন্তঃসম্পর্ক নেই। সেই ষোলো বছরের মতো প্রেমে পড়া আর হয়ে ওঠেনি ঋষিকার। সমুদ্রর সঙ্গে প্রেম খেয়ে নিল কমপ্লেক্স।

প্রথম প্রেম চলাকালীনই সে কবিতা লেখা ধরেছিল। রক্তিমের সঙ্গে ছাড়াছাড়া হলেও লেখালেখির সঙ্গে যোগটা রয়েই গেল। তবে কবিতা আর লিখত না ঋ। লিখত গদ্য। তারপর সে সবও অনিয়মিত হয়ে গেল। টুকটাক অভিনয় করত কলেজে, সে সবের জন্য স্ক্রিপ্ট লিখত। হয়তো লেখাটা ভিতরে থেকেই গিয়েছিল। নয়তো দিনে তিরিশ-চল্লিশ পাতা অনায়াসে লিখে ফেলে কী করে সে আজকাল? কবিরা জন্ম থেকেই আলুথালু, নাকি কবিতা লিখতে-লিখতে অমন হয়ে যায়, তা জানা নেই। তবে এই সময়টাতেই ঋষিকার স্বভাবে ইনডিসিপ্লিন দেখা দিল। ফল, গ্র্যাজুয়েশনে সাদামাটা রেজাল্ট। ইন্টার কলেজ কালচারাল মিটে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সমুদ্রর সঙ্গে আলাপ হল ঋ-র, রক্তিম তত দিনে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে।

কোনও রকমে পঞ্চাশ শতাংশ নম্বর নিয়ে এম এ পাশ করে ঋ-র মনে হল ঢের হয়েছে। এবার বিয়ে হবে। আর বিয়ে হলেই দু'শো মজা! বিয়ের পরপর খুব ফুর্তি হয়েছিল বটে। সমুদ্রর ব্যবসার খাতিরে আজ গোয়া, কাল হায়দরাবাদ, পরশু জামশেদপুর.... জীবনটা কাটছিল ফুরফুরে। কোন আহম্মক এলেবেলে চাকরি করে স্বামী-সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করে নিজেকে? তখন চাকরি করে, সমাজের কাছে নিজেকে স্বাধীন নারী প্রমাণ দেওয়ার অত প্রয়োজনবোধ করেনি ঋষিকা। বরং আনন্দে ডগোমগো হয়ে ভাল বউ, ভাল মা হবে এই নেশায় মজে ছিল বেশি।

বিয়ের এক মাসের মধ্যে রুকুও এসে গেল ঋষিকার শরীরে। ঋষিকার মনে হয়েছিল জীবন নামক দেবতাটিকে সে পকেটে পুরে ফেলেছে। কিন্তু পকেটে সমস্যা ছিল। কোন ফাঁকফোকর দিয়ে দেবতা ফাঁকি দিলেন ঋষিকা অনেক দিন পর্যন্ত ধরতেই পারল না।

সময় বরং তাকে ধীরেধীরে শেখাল অনেক। শেখাল, নারীবাদী হও বা না-ই হও, অসুন্দর মেয়ে আর সুন্দর মেয়ের অধিকারে প্রভেদ জটিল! উল্টো দিকে, বিয়ের পর থেকেই সমুদ্রর জীবনে ঘটতে লাগল অবিশ্বাস্য উন্নতি। না, নিজের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করতে সমুদ্রর কাছে সম্মানহানি হচ্ছে বলে নয়, খানিক কমপ্লেক্স কাটাতেই ঋষিকা শুরু করেছিল স্বাধীন রোজগার।

রুকুকে বাড়িতে একা ফেলে চলে যেতে প্রাণ চাইত না, তাই ঋষিকা শুরু করল টিভি সিরিয়ালে সংলাপ লেখার কাজ। প্রথমে একটা দু'টোয় সহকারী চিত্রনাট্যকার। পরবর্তী কালে একাই। সে এই মুহূর্তে 'সিঁদুরের মহিমা', 'মহিমার প্রেম', 'প্রেমের বিষে বিশ-বাইশ' নামের তিনটে সিরিয়ালের স্ক্রিপ্ট লিখছে।

ঋষিকা কলেজে অভিনয় করত শুনে জে-লো তাকে অভিনয় করার সুযোগ করে দিল সিরিয়ালে। ঋষিকার আজকাল হামেশাই সিরিয়ালে অভিনয়ের কাজও জুটে যাচ্ছে। টিভির কাজ করে চেনাজানার পরিধি বেড়েছে, গত মাসে সে একটা ফিচারের কাজ করতে দিন সাতেকের আউটডোরও করে এসেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার জন্য সব সিনেমা বা সিরিয়াল পরিচালকই বেছে রাখেন ঝি বা প্রান্তিক শ্রেণির 'লোকনো' বা বাঙাল অ্যাকসেন্টে খাউখাউ করে কথা বলা ঝগড়াটে বউয়ের রোল।

অভিনয় করতে সে ভালবাসলেও, সে জানে শুধু চেহারার কারণেই সে কোনও দিন বড় রোল পাবে না। অডিও ভিসুয়াল মাধ্যম আদতে 'পহলে দর্শনধারী।' তাই ঋষিকা পায় একদিন কি মেরেকেটে দু'দিনের কাজ। অর্থাৎ, স্ক্রিন টাইম খুব বেশি হলে দশ মিনিট। এসব বোঝে সে। তাই প্রোডাকশন ম্যানেজারের ফোন-ডাক যখন আসে তার মোবাইলে, তখন তার হাসিই পায়। ওরা জানে না, ইদানীং কাজের লোকের বিভিন্ন রোল সে একটু বেশি যত্ন নিয়েই লেখে। কারণ, লেখার সময়ই তার মালুম হয়ে যায়, এই সব লাইন ক্যামেরার সামনে সেই বলবে।

আজকাল অচেনা ইউনিট থেকেও ডাক আসছে। এই ইন্ডাস্ট্রি মুখে খুব মধুর। তাই রোল অফার করার সময় মোলায়েম গলায় বলে, "দিদি, কাজের লোকের রোল। ছোট কিন্তু খুব ইমপর্ট্যান্ট রোল। আপনার অভিনয় ছাড়া রোলটা কিন্তু জমবেই না।"

ঋষিকা শিক্ষিত অভিনেত্রী। পড়াশোনা করা, জানকারিওয়ালা মেয়ে সে। নানা ধাঁচের সূক্ষ্ম রোলের চ্যালেঞ্জ নিতে সে তৈরি ছিল অল্প বয়সে। একটা 'দুর্দান্ত' বিয়ে হয়ে গেল সেই এম এ পরীক্ষার পরেই। জীবনে স্ট্রাগল বা ওঠা পড়া কিছুই ছিল না তার। সে ভেবেছিল অ্যাক্টিং করবে দারুণ দুরূহ সব রোলে। পৃথিবীকে দেখিয়ে দেবে চেহারাই সব নয়।

তার চেহারা নিয়ে, অসম বিয়ে নিয়ে, টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রিতে তার অবস্থান নিয়ে, শ্বশুরবাড়িতে তার প্রতি সূক্ষ্ম অসম্মান নিয়ে কষ্টের কথা আজকাল আর সে তেমন মুখ ফুটে বলে না। ঋষিকার স্বপ্ন-টপ্পও কমে যাচ্ছে দিন-দিন। এটা কি অভ্যেস? টাকার প্রলোভন? নাকি এর সবক'টাই? নাকি এভাবেই সে তার চেনাশোনা মানুষজনকে বোঝাতে চায় যে, সে তার চেহারার পরোয়া করে না।

তার সৌন্দর্যহীনতা নিয়ে তার নেই কোনও লজ্জা।

কারণ যাই হোক, গত দু'বছর ধরে থোর-বড়ি-খাড়া সংলাপ বলে, ইউনিটের সঙ্গে প্লাস্টিক হাসি বিনিময় করে, লাঞ্চ ব্রেকে বিরিয়ানি খেয়ে বাড়ি চলে আসে ঋষিকা। সন্ধেবেলা বিভিন্ন চ্যানেলের বাজনা বেজে ওঠে যখন পাড়াজুড়ে, তখন সে চোখে চশমা এঁটে পরের দিনের 'পাতা' লিখতে বসে যায়। টিভির পরদায় নিজের নাম বা মুখ দেখার ছেলেমানুষি নেশা কবেই ছুটে গিয়েছে তার। সমুদ্রদের পাড়া অর্থাৎ, তার শ্বশুরবাড়ির চত্বরে আভিজাত্যের ঠাসাঠাসি। প্রতিবেশীরা সব বড়লোক এবং ওয়াইন সহযোগে চিংড়ি মাছের মালাইকারি খাওয়া বাঙালি! প্রায় প্রতিটি পরিবারের শান্তিনিকেতনে আড়াই কাঠা জমি আছে বা আছে বাংলো বাড়ি। পেল্লায় বড়-বড় গাড়ি চালিয়ে এই সব পরিবার বসন্ত উৎসবে বা উইক-এন্ডে রবিবাবুর আলখাল্লার ওম পেতে ভোর-ভোর বেরিয়ে পড়ে!

টিভি স্ক্রিনে ঋষিকার নাম, বা সপ্তাহে এক দু'দিন তার আড়াই মিনিটের রোল তারা আদৌ দেখে কি না, তা ঋষিকার জানা নেই। হয়তো দেখে। নয়তো পুজোমণ্ডপ বা বিয়েবাড়িতে দেখা হলে তারা ঋষিকাকে নিয়ম করে কেন বলে, তারা বাংলা সিরিয়াল দেখে না! অবধারিতভাবে, প্রতিবার, অন্তত তিনজন প্রতিবেশিনী ঋষিকাকে ঠোঁট কাঁপিয়ে বলে, তারা চ্যানেল সার্ফ করতে-করতে ঋষিকাকে হঠাৎ দেখে ফেলেছে! আসলে তারা 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক' বা 'ডিসকভারি' চ্যানেলের দর্শক। ঋষিকা মনে-মনে হাসে। মানুষের কমপ্লেক্সের শেষ নেই!

এসব নিয়ে ঋষিকার অবশ্য কোনও কষ্টবোধ নেই। ঋষিকা তো কোনও দিন স্টার হতেও চায়নি। সে চেয়েছিল মিনিংফুল রোল। জিন-ঘটিত কারণে এ জীবনে বোধহয় আর সেটা হল না। তাছাড়া ঋষিকার টার্গেট অডিয়েন্স, এরা নয়। টিআরপি বাড়ানোর যেসব মালমশলা ঢোকানো হয় এপিসোডে, তা একেবারে মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তকে মাথায় রেখে। বাইরের লোকের এই ব্যবহার ঋষিকাকে ব্যথা দেয় না। ঋষিকাকে বিধ্বস্ত করে তার কাছের মানুষজনও। অনেক সময় তার মনে হতে থাকে, এই সব লেখা-টেখা বন্ধ করে দেবে। এমনিতেও তার কোনও কদর নেই লেখক হিসেবে, সে না-লিখলে আরও কেউ লিখে দেবে ওসব হাবিজাবি। আবার ফিরে যাবে সে ফুরফুরে জীবনে। স্কুলে পড়ানোর কাজ নিয়ে নেবে খুব বোর লাগলে। তার যা সামাজিক অবস্থান, সেখানে সে অনায়াসে ঘরে-বাইরে কাজ না করে কাটিয়ে দিতে পারত।

কাজহীন, ভাবনাহীন, ভারহীন রঙিন জীবন তার প্রাপ্য ছিল। এই জীবনের এক আলগা আবেশ আছে। বেশ নেশার মতো লাগে। স্বামীর অফিস বেরনোর সময় বারান্দায় আলুথালু হয়ে, হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়ে, স্বামীকে টা টা করা, হাই তুলতে-তুলতে খবরের কাগজের পেজ থ্রিতে চোখ বোলানো, ঠাসিয়ে ব্রেকফাস্ট খেয়ে ফুরফুরে হয়ে হয় একে ওকে তাকে ফোন করা বা বন্ধু জুটিয়ে শপিং মলে ব্যাগ ঝুলিয়ে উইন্ডো শপিং করে দিন কাটানোর মজা খারাপ লাগার কথা নয়।

বিয়ের পর ঋষিকার জীবনটা অনেকটা এভাবেই কাটছিল। খুব খারাপ কিছু লাগছিল না তার। নিউ আলিপুরের বাড়িতে সে আর সমুদ্র থাকত তিনতলা জুড়ে। শ্বশুর, শাশুড়ি আর ননদ দোতলায়। আর সমুদ্রর দাদা সৈকত থাকে সল্ট লেকে। শ্বশুরবাড়িতে। বউদি মধুমিতা তার মা-বাবার একমাত্র সন্তান। বয়স্ক বাবা-মাকে ফেলে সে নিউ আলিপুরে থাকতে চাইছিল না। তাই এই ব্যবস্থা। মধুমিতা-সৈকতের কোনও ইস্যু নেই। একতলা ভাড়া দেওয়া। কমন রান্নাঘরের জন্য একজন ঠাকুর, একজন ঠিকে কাজের লোক। ঋষিকার মনে হত সে লটারি পেয়ে গিয়েছে। সমুদ্রর বোন রাকার বিয়ের পর বাড়ি অবশ্য এখন আরও ফাঁকা। এখন এ বাড়িতে ঋষিকা-সমুদ্র-রুকু ছাড়া আছেন সমুদ্রর মা-বাবা। এবং রাতদিনর কাজের মেয়ে মিনতি। বউভাতের অনুষ্ঠানে যে তসর পরা ছোট চুলের আধুনিকা শাশুড়িকে দেখে সে ঢোঁক গিলেছিল, তাঁর সঙ্গেও অদ্ভুতভাবে ঋষিকার ভাব হয়ে গেল বিয়ের সাতদিনের মধ্যেই। ঋষিকা ছোটবেলা থেকেই বাড়িতে বাংলা কাগজ পড়তে অভ্যস্ত। শ্বশুরবাড়িতে এসে দেখল, এরা সবাই ইংরেজি কাগজ পড়ে। প্রথম কদিন সে কাউকেই কিছু বলেনি, মুখ গম্ভীর করে ইংরেজি কাগজ পড়েছে। কিন্তু মন ভরত না। আর এত তুচ্ছ একটা ব্যাপারে সমুদ্রকে বলতেও কেমন যেন আটকাত।

ঝুঁকি নিয়ে সে একদিন বাড়ির রাত-দিনের মেয়ে মিনতিকে পাঠিয়ে দিল লুকিয়ে বাংলা কাগজ কিনে আনার জন্য। মিনতি এসব ছোটখাটো খেলায় দারুণ উৎসাহী। সে হাসতে-হাসতে ঋষিকার ষড়যন্ত্রে সামিল হল!

অবশ্য সে খেলা টেনে নিয়ে যাওয়া গেল না বেশি দিন। দিন তিনেকের মধ্যে শাশুড়ি আনন্দীর হাতে কাগজ-সমেত ধরা পড়ল মিনতি। ঘটনা ফাঁস হল। আর হইহই করে শাশুড়ির সঙ্গে ঋষিকার ভাব হয়ে গেল! শাশুড়ি নিজে কৃষ্ণনগরের মেয়ে। রূপ আর টাকার দৌলতে কলকাতার বড়লোক বাড়িতে বিয়ে হয়েছে। শহুরে 'নিও-ভদ্রলোকি' ঠাটবাট শিখতে হয়েছে মনের কষ্ট মনে চেপে। চশমা এঁটে ইংরেজি কাগজ খুলে তাঁকে তাই বসতেই হয় ডাইনিং টেবিলে। কিন্তু তাতে কি আর কাগজ পড়ার আনন্দ জোটে!

ঋষিকার কল্যাণে, বিয়ের প্রায় তিরিশ বছর পর তিনিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। বাড়িতে দু'টো কাগজ আসতে শুরু করল। শাশুড়ি আর বউয়ের জন্য বাংলা। বাকি সবার জন্য ইংরেজি। সব তো চলছিল ঠিকঠাক। তবু কমপ্লেক্স যায় না মেয়ের! তার মোকাবিলা করবে বলে মেয়ে খুঁজতে বেরল অন্য জীবন। পথ পেরতে-পেরতে দেখল, বেশ তো গড়ে উঠছে এক নিজস্ব আইডেনটিটি। টাকা রোজগারের এত অপার মহিমা।

8

"তুমি কিছু বলছ না যে? তোমার কানে গেল কথাগুলো?" শাশুড়ি ঝাঁঝ দেখাব না দেখাব-না করেও সামলাতে পারলেন না।

"হুঁ...গেল...তাই তো কথা বলতে পারছি না," বেশ শান্ত স্বরে বলল বিশাখা।

"দেখো বাপু, তোমরা অন্যরকম, আমরা অন্যরকম। আমি তো তোমাদের জীবন নিয়ে কিছু বলতে যাই না! তুমি আমার মেয়ের বিয়ে আমার মতন করে দিতে দাও।"

এক নিশ্বাসে দুরু-দুরু বুকে কথা বলে শাশুড়ি তাকালেন বিশাখার দিকে।

দেখলেন, বিশাখা মুচকি হাসছে। মেয়েটা তাকে অপমান করছে ভাবলেন তিনি।

বিশাখা বলল, "আমি ভাবছি, তোমাকে তোমার মতন করে ছেলের বিয়ে দিতে দিলে কত কী আদায় করে নিতে মেয়ের বাড়ি থেকে, তাই না?"

বিশাখার কথায় শাশুড়ি হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন।

বিশাখা বলে চলল, "ভেবো না পলিটিক্সটা আমি বুঝতে পারছি না। আমি যদি টাকাটা এখন না দিই, সঙ্গে-সঙ্গে আমি স্বার্থপর, খারাপ মেয়ে হয়ে যাব। আমি পণ-প্রথার বিরোধিতা করতে চাই এটা কেউ বিশ্বাস করবে না।"

পুলিনবাবুর বুক ধড়ফড় করছে। সাধে কি তিনি সব কিছু থেকে পালিয়ে থাকতে চান! এখন বিশাখা আর তাঁর স্ত্রী-র মধ্যে সাংঘাতিক জমি টানাটানি শুরু হবে। বাবুর মায়ের কী দোষ? স্বামীর ঘরে কোনও দিন কোনও সাধ পূর্ণ হয়নি। এখন ছেলের

বউকে স্বাধীনতা দিয়ে কিছু টাকা আদায় করতে কোমর বেঁধেছে। আহা, গরিব বলে বুঝি সাধ-আহ্লাদ থাকতে নেই!
আর এইদিকে বাবুর বউ। এখন চেঁচাচ্ছে বটে কিন্তু পুলিনবাবু ভালই জানেন, টাকাটা ঠিক বের করে দেবে। পণ-ফন-এর ধুয়ো তুলছে, এসব হল কথার কথা। মেয়েটার মহান হওয়ার লোভ খুব। শিক্ষিত বটে তবে বড্ড বোকা! বাবুর মায়ের কাছে নস্যি, নস্যি!
বিশাখা গলা নামিয়ে রেখেই বলল, "মেয়ে পার করায় আমি বিশ্বাসী নই। বুলির এখন বিয়ে করার কী যৌক্তিকতা, তাও বুঝতে পারছি না। তবু যদি বিয়ে করে থাকতেই হয়, ঘর তোলার দায়িত্ব তো ওদের দু'জনের। ওরা যৌথভাবে সে খরচ দিক। তাতেই তো ওদের সম্মান।"
"আহা, ওরা অত টাকা কোথায় পাবে? ওদের কি তোমার মতন মাস গেলে গাদা-গাদা মাইনে?"
"যা ব্বাবা! টাকা নেই তো আমি কী করব? আমি আমার নিজের ক্ষমতায় রোজগার করি, বেঁচে থাকি। প্রসেনজিৎ তার বউকে কোন ঘরে তুলবে, সে সবের দায়িত্ব আমার নাকি?"
ভদ্রমহিলা সুর পাল্টে বললেন, "অ্যাই দ্যাখো তুমি রেগে যাচ্ছ। আচ্ছা বাবা আচ্ছা, পার করা কথাটা ফেরত নিলাম। কিন্তু বুলির বিয়ের বয়স তো হয়েই গেছে। বুলি এখনই বিয়ে করতে চাইছে। আর তুমি তো জানই ওর লেখাপড়ায় বিশেষ মন নেই। সবাই কি আর কলেজের মাস্টারনি হবে?"
শাশুড়ির দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে বিশাখা বলল, "না-না। তা তো হবেই না। কলেজগুলোর অবস্থা এমনিতেই ভাল নয়..."
"শোনো বিশাখা, তুমি এখন এ পরিবারের সদস্য। বুলির বিয়ে এ পরিবারের দায়িত্ব, সেটা মানো তো? তাই তোমার কাছে এসেছিলাম। এখন তুমি যদি অরাজি হও, তাহলে..."
"বিয়ে ব্যাপারটা দু'টো ছেলেমেয়ের মধ্যে হয়। পরিবারের দায়িত্ব কথাটা আমি মানি না।"
"হ্যাঁ, তোমরা এখন সব আমেরিকান হয়েছ... পরিবার-টরিবার মানো না। আর মানবেই বা কেন? গরিব বাপ-মায়ের কোনও দাম থাকে না, এ সবাই জানে।"
"আমেরিকানরা পরিবার মানে না, এ কথা আপনাকে কে বলল? সবেতে আমেরিকানদের তুলে আনবেন না, প্লিজ। আর গরিব-গরিব করে ঠোঁট ফোলাবেন না, তাতে আপনাদের অসম্মান হয়।"
পুলিনবাবু হঠাৎ পটাং করে বলে বসলেন, "আমেরিকানদের থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখারও আছে। যেমন ডিগনিটি অফ লেবার... সব কাজকে সম্মান করে ওরা..."
"রাখো-রাখো। হচ্ছে মেয়ের বিয়ের কথা... নিয়ে আসছে আমেরিকা...যন্ত সব।"
"ওই দ্যাখো! আমেরিকা তো তুমিই আনলে!"
বিশাখার হঠাৎ কেমন হাসি পেয়ে যায়। কী ভীষণ সরল আর বোকা এরা! কোমর বেঁধে টাকা আদায় করতে এসে, ভুলভাল যুক্তি দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলছে। রাগ-হিংসে-অভিমান-অসহায়তা সব ঝুপঝুপ করে শরতের শিউলির মতো ঝরিয়ে ফেলছে।
"হ্যামবার্গার...হ্যামবার্গার... সে তুমি খাওনি বলে বলছ..."
"তুমি সে সব জানলে কী করে শুনি? বুঝেছি... তাই সেদিন সৌমেনের মা বলছিল..."
বিশাখার অন্যমনস্ক কানে শ্বশুর-শাশুড়ির টুকটাক কথা ঢোকে, বেরয়, ডিগবাজি খায়... তারপর আধা-শহুরে হাওয়ায় হারিয়েও যায়। এরা তার প্রতিপক্ষ? হতেই পারে। এরা নিজেরাই নিজেদের সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে। উলুখাগড়ার প্রাণ নিয়ে সে করবেটা কী? বরং, সিচুয়েশনটা নিজের মতো ব্যবহার করলে সবাই খুশিই হবে।
বিশাখা খাটের প্রান্তে বসে পড়ে বলল, "বুলিরা যদি বিয়ে করে এ বাড়িতে থাকতে চায়, তার অন্য সমাধান আছে। তবে বুলি তো আমারও বোন। ওকে আমি বোঝাব। নিজের পায়ে না-দাঁড়িয়ে, পড়াশোনা শেষ না-করে বিয়ে করতে চায় ও, এটা ভুল পদক্ষেপ। সেটা ওকে বোঝানো দরকার। যাকগে, এখন উঠি আমি... রোহিত আসুক, কথা বলি ওর সঙ্গে।"
শাশুড়ি থমকে গেলেন। এ মেয়ে বড়-বড় কথা বলে বটে, তবে সরল-সাদা আছে... টাকাটা দেবে তো? অন্য সমাধান মানে? এই তালে বাড়ি ছাড়ার মতলব করছে নাকি?
বিশাখা আড়মোড়া ভেঙে বলল, "আজ রাতের মেনু কী? কত দিন ট্যাংরা মাছ খাইনি! ট্যাংরা মাছ আনো না কেন মেসোমশাই? পাও না বাজারে?"
"হা-হা-হা! একেই বলে কো-ইন্সিডেন্স! অনেকদিন থেকেই পরিকল্পনা করছিলুম আনব বলে... আজকেই তো পেয়েছি! কীগো? আজ রাতে ট্যাংরা করেছ তো, নাকি?"
শাশুড়ি শ্বাস ছাড়লেন। ট্যাংরা মাছের এখন কিলো সাড়ে তিনশো টাকা। ছেলে-ছেলের বউয়ের দুহাত্তা রোজগারে টাকার সুখে গা ঢলিয়েছে এ পরিবার। তিনি নিজেও কম সুখে নেই। মেয়েটাকে বেশি চাপাচাপি করা ঠিক হবে না। আমেরিকান-টামেরিকান বলা উচিত হয়নি। তিনি কান এঁটো করা হাসি হেসে বললেন, "হ্যাঁরে বাবা হ্যাঁ... ট্যাংরাই করেছি... বিশাখা আমার বাঙালি ঘরের সধবা, তার মুখে একটু মাছ না ধরে দিলে হয়।"
বিশাখা হি-হি করে হেসে বলল, "এই দ্যাখো, পরিবার না-মানা আমেরিকান ট্যাংরা মাছের সময় কেমন পাতি বাঙালি! ধনেপাতা দিয়েছ তো মাছে?"
ঘরের দেওয়ালের বত্রিশ ইঞ্চি ফ্ল্যাট স্ক্রিন টিভিটার দিকে তাকিয়ে শাশুড়ি বললেন, "তা আর দিইনি! টম্যাটো, ধনেপাতা, সব দিয়েছি।"
এরপর আর কথা এগল না। শাশুড়ি কাঁচুমাচু মুখ নিয়ে বসে রইলেন। তিনি ধরতে পারছেন না, তাঁর উদ্দেশ্য সফল হল কি হল না! ওদিকে বুলি গোঁ ধরে আছে, এই ছেলেকে বিয়ে করবেই। নয়তো গলায় দড়ি দেবে। সংসারের এই সব ঝামেলা তাঁকে একা সামলাতে হয়... এই ন্যাকা মেয়েরা সেসব কী বুঝবে? মাঝেমাঝে দুঃখে, হতাশায় চোখে জল এসে যায় তাঁর!
সারাটা জীবন হা টাকা, হা টাকা করেই গেল!
কত সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করতেন তিনি স্কুলে পড়ার সময়। দেখতেও এমন কিছু খারাপ ছিলেন না... আঠারো হতে না-হতেই বিয়ে দিয়ে দিল বাড়ি থেকে। তারপর সংসার টানতে-টানতে জীবন শেষ। আবৃত্তি করার কথা মনেও পড়ে না। আর রূপ! হাঃ! এখন আয়নার দিকে তাকাতেই লজ্জা করে। রং জ্বলে গিয়েছে, চুল উঠে গিয়েছে...
তবু কাউকেই কি খুশি করতে পেরেছেন? নাঃ।
এ সবই গরিব হওয়ার ফল! গরিবের যে কী জ্বালা।
হ্যাঁ, বিশাখাকে তিনি হিংসে করেন। করবেন না? কেমন স্বাধীন জীবন-যাপন করছে! যা প্রাণে চায়, তাই করছে... রাগ হবে না? মেয়েটা হয়তো বুঝতে পারে, তিনি হিংসে করেন, ওর টাকার প্রতি লোভ করেন। কিন্তু তিনি স্নেহও তো করেন। সেটা ও বোঝে কি না কে জানে!
বিশাখা 'ট্যাংরা তবু কাটন যায়... মাগুরমাছটা ক্যাটক্যাটায়... ' গাইতে-গাইতে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।
পুলিনবাবু বললেন, "ফোক সং বুঝলে গিন্নি? ফোক সং চিরকালীন। কোনও দিন পুরনো হবে না, এসব গান।"

রাত দশটা পার করে, কলেজের তিন বেইমানের সন্ধানে বিশাখার মন তখনও উথালপাথাল, রোহিত বাড়ি ফিরল। বিশাখা যে-কোনও গল্প বলার সময় বিরাট ভূমিকা ফাঁদে। আজও সেটাই করল। বুলির ব্যাপারটা বলতে গিয়ে সে আজ সংস্কৃতি, রাজনীতি, নারীশিক্ষা-ফিক্ষা নিয়ে বিশাল ছড়াচ্ছিল, রোহিত ব্যাজার মুখে বলল, "কাম টু দ্য পয়েন্ট বিশাখা... ভাব সম্প্রসারণ শেখাত না স্কুলে?"
বিশাখা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, "ইউ মিন প্রেসি রাইটিং? শেখাবে না কেন? আমি তোমায় ক্রাইসিসটার সোশিও-ইকনমিক ব্যাকগ্রাউন্ড বোঝাতে চাইছিলাম।"
রোহিত বউয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "ধরে নাও বুঝে গেছি। ঘটনাটা এবার শোনাবে, প্লিজ?"
রোহিতের বাড়ি ফিরতে এখন রোজ দেরি হয়। মিডিয়ায় চাকরি মানেই, অফিসের পর ক্লাবে বসে খানিক সাপ-লুডোর উত্তেজনা! সঙ্গে সাড়ে তিন থেকে চার পাত্তর নেশা। সে চুলু-চুলু চোখে সবটা শুনে বলল, "গুরু আমি পারিবারিক শান্তির পক্ষে। ব্যক্তিগত বিশ্বাস কপচে লাভ হবে না ডিয়ার। আরও সহজভাবে বলতে গেলে আমি অশান্তির বিপক্ষে থাকতে চাই।"
"তোমরা ছেলেরা পরিবার-পরিবার করে এত হেদিয়ে মরো কেন বলতো? তোমরা তো বাড়িতে থাকই না।"
রোহিত হালকা গলায় বলল, "বাড়ি ইজ বাড়ি! বাড়ি মানে ছায়া-সুনিবিড়, শান্তির নীড়। বাড়ি মানে উষ্ণ গরম স্নানের জল, নরম লেপে বউ জাপটে শোয়া আর ধোঁয়া ওঠা ভাতের আরাম।"
"ছাবলামি কোরো না রোহিত। সব কিছুকে হালকা ভাবে নিয়ে নিয়ে তোমার মনের গভীরতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"
"ও মা! তুমিই তো বলেছ, আঁতলামি ইজ ফর প্রিচিং, নট প্র্যাক্টিসিং!"
বিশাখা চুপ করে থাকল। তার মনটা আসলে অন্যখানে ব্যস্ত। তেমন ভাবতে পারছে না সে। তাও মরিয়া গলায় সে বলল, "সুখ বা শান্তি সব সময় কাম্য, তা নামানার কোনও কারণ নেই। সংঘাত, বিরোধ, প্রতিবাদ, অশান্তি জরুরি অনেক সময়েই। তাতে ভাঙচুরগুলো দ্রুত আসে। কালের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাঙচুরের হাত ধরে আসে নতুন বিচার। নতুন... ইয়ে..."
রোহিত কান চুলকোতে থাকে বিশাখার কথা শুনতে-শুনতে।
বিশাখা দারুণ রেগে উঠে বলল, "রোহিত... তুমি আমার কথা শুনছ না"
রোহিত বলল, "তোমরা এখন দু'টো পয়সা রোজগার করছ বলে হেবি বুকনি ঝাড়ছ, প্রথা, কনভেনশন নিয়ে প্রশ্ন তুলছ। দাঁড়াও বন্ধু... এত তাড়াহুড়ো কেন? মেয়েদের রোজগার করার ইতিহাস কত দিনের? মেরেকেটে ষাট-সত্তর? এখনই এত?"
বিশাখা জ্বলে উঠল এবার। বলল, "মেয়েরা প্রশ্ন তোলে বলেই সমাজটা পাল্টায়। এনিওয়ে, রোহিত... যে কান পরিষ্কার করতে-করতে এসব সিরিয়াস বিষয়ে আলোচনা করে, তার সঙ্গে আমি কথা বলি না। নাউ গেট লস্ট। আমি দশটার নিউজ় দেখব।"
রোহিতের রাতে দু'টো কাজ থাকে। একটা মশারি টাঙানো, অন্যটা বেঁচে যাওয়া খাবার ফ্রিজে তোলা। রোহিত ব্যাজারমুখে মশারি টাঙাচ্ছিল। দু'বার দড়ির ফাঁস হাত থেকে স্লিপ করল। মাথা টাল্লি না-খেলেও একটু গোলমেলে অবস্থায় আছে সে। আর মেজাজ বিগড়ানো। টিভির রিমোট নিয়ে খেলতে থাকা বিশাখার দিকে তাকিয়ে আড়মোড়া ভেঙে রোহিত বলল, "খেতে চলো, খিদে পাচ্ছে।"
বিশাখা অনেকক্ষণ থেকেই রোহিতের টালুমালু অবস্থা নজর করছিল। সে বলল, "তুমি খেয়ে নাও, লাট খাচ্ছ অনেকক্ষণ। আমি একটু আগে পাড়ার মোড়ে গিয়ে ফুচকা খেয়েছি। আমার খিদে পাচ্ছে না।"
রোহিত ভ্যাবলা হাসি হেসে খেতে চলে গেল। রাগ আর হতাশা। বিরক্তি আর বিদ্বেষ। রোহিত খাচ্ছিল তবু, খেতে হয় বলে।
মাঝরাত্তিরে আজকাল তার ঘুম ভেঙে যায়। বাথরুমে যেতে হয়, জল তেষ্টা পায়। আর বেশি মদ খেয়ে, না-খেয়ে ঘুমোতে গেলে, ঘুম ভাঙলেই তার বেজায় খিদে পায়। একেবারে অসহ্য পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তখন। ঘুমচোখে, ফ্রিজ হাতড়ে খাওয়ার বের করতে গিয়ে অনেক সময় বাসন ফেলে দিয়েছে সে ঝনঝনিয়ে। ঘুমের রেশ কেটে গিয়েছে, বারান্দায় ন্যাতা খুঁজতে হয়েছে পড়ে যাওয়া খাবার মুছতে। সে সময় কান্না পেয়েছে রোহিতের।
সারাদিন কলেজ ঠেঙিয়ে ঘুমিয়ে পড়া বউকে তো আর তখন জাগিয়ে তোলা যায় না। খিদে পেটেই তাকে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে ঘর সাফ করতে হয়েছে। অতিরিক্ত সিগারেট ধরিয়ে কাটাতে হয়েছে অস্থিরতা। এসব গূঢ় কারণেই পারতপক্ষে রোহিত না-খেয়ে শুতে যায় না।
খেতে-খেতেই হাতছাড়া হতে চলা দিল্লির অ্যাসাইনমেন্টটার কথা ফের মনে পড়ে গেল। আবার বিতৃষ্ণায় মন ভরে উঠল। তার ওপর বাড়ি ফেরার আগে একটা ফালতু ক্যাঁচাল হয়ে গেল ক্লাবে। বাড়িতেও মা আর বিশাখা মিলে কী পাকিয়ে রেখেছে, কে জানে। যাই হোক, সে এখন এসবে ঢুকবে না।
বাড়িতে লোকে ফেরে কেন? আদর না জুটুক, শান্তিতে ঘুমোতে তো পারবে নাকি? বিশাখাকে দেখে রোহিতের খুব অবাক লাগে। অশান্তিতেই যেন ওর মজা! বিশাখা এখন হাঁ করে নিউজ় দেখছে। সোফায় বসেছে পা গুটিয়ে। স্লিভলেস টি-শার্টের ভেতর দিয়ে বগলের চুল দেখা যাচ্ছে। রোহিত মুখ সরিয়ে নিল। মেয়েরা বউ হয়ে গেলে কেন যে এত ল্যাতাপ্যাতা হয়ে যায়।
"তুমি আন্ডার-আর্মস ক্লিন করো না?" গলা তুলে বলল রোহিত।
বিশাখা হতভম্ব লুক দিল। তারপর নিজেই নিজের হাত তুলে বগল পর্যবেক্ষণ করল, "ক্লিনই তো! ক্লিন করি না মানে? হেয়ার রিমুভ?"
"হ্যাঁ, হ্যাঁ...হেয়ার রিমুভ, হেয়ার রিমুভ... করো না?"
বিশাখা মুখ বেঁকিয়ে বলল, "নাঃ। আর স্লিভলেস পরি না তো। হাতগুলো এমন মোটা হয়ে গেছে। তোমার তো জঙ্গল ভাল লাগে বলতে, এখন লাগে না?"
রোহিত কোনও উত্তর দিল না। কী উত্তর দেবে? সে জানে না কী ভাল লাগে তার। সকালে অফিসে পৌঁছেই খারাপ খবর। তার বদলে দিল্লি যাচ্ছে সুকন্যা, আর সুকন্যার সঙ্গে পরমা। খবরটা পা নাচিয়ে-নাচিয়ে নিজের চেয়ারে বসে শুনল রোহিত। ভাবখানা, কিছুই যায় আসে না! কিন্তু রাগে গা জ্বলছিল তার। খবরটা হজম করেই কফি খেল। তারপর ইন্টারকমে সুকন্যাকে অভিনন্দন জানাল। সুকন্যা প্রমিস করল রোহিতের জন্য দিল্লি থেকে সোহন হালুয়া আনবে। আর জনপথ থেকে জয়পুরি চটি। রোহিত নিজেই দু'মাস অন্তর দিল্লি যায়, কত জোড়া জয়পুরি চটি তার বাড়িতে পড়ে আছে, তার গোনাগুনতি নেই। সোহন হালুয়া রোহিতের পছন্দ বলেই কলকাতায় কোথায় পাওয়া যায়, সে জানে। তবু যথার্থ উচ্ছ্বসিত হল সে সুকন্যার এই প্রমিসে। এসব আহ্লাদ দেখানো কর্পোরেট দুনিয়ার নিয়ম! এসব কথার পিছনে স্পষ্ট ভাবনা আছে। সুকন্যা বোঝাতে চাইল, সে রোহিতের ভাল লাগা, খারাপ লাগার খবর রাখে। সে রোহিতের বন্ধু।
ফোন রেখে রোহিত ফোন করল বিশাখাকে। বিশাখার ফোন সুইচড অফ ছিল। তেমনটাই হওয়ার কথা। ক্লাসে থাকলে বিশাখার ফোন বন্ধ থাকে। এখন বিশাখা তার তিন হাতের মধ্যে বসে আছে।

কিন্তু বিশাখাকে তার মন খারাপের কোনও খবর রোহিতের দিতে ইচ্ছে করছে না। বরং ইচ্ছে করছে বিশাখার হাত থেকে রিমোটটা কেড়ে নিয়ে টিভি'টা অফ করে দিতে। তারপর... নাঃ, তারপর আর কিছু নেই। ভেতরে আছড়ে পড়ছিল রাগ আর হতাশা, তবু দিল্লির খারাপ খবর শোনার পর, সকালবেলা, রোহিতের আর কোনও নাম মনে আসেনি, যার সঙ্গে সে এ বিষয়ে কথা বলতে পারে। অফিসে এসব বিষয় আলোচনা করা মানে হারাকিরি। কে যে কার কাছে চুকলি করবে, কেউ জানে না! কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে মন খাওয়ার যোগাযোগ থাকলেও, প্রাণের কথা ভাগ করে নেওয়ার মতো ঘনিষ্ঠতা কারও সঙ্গে নেই। তাছাড়া তাদের প্রত্যেকের জগৎ আলাদা। প্রাণের কথা বলতে গেলেও তারা বুঝবে না রোহিতের সমস্যা। চাকরি করতে গিয়ে মানুষকে যে কী একা হয়ে যেতে হয়! রোহিতের আসল হেরে যাওয়ার জায়গা এটাই যে, সুকন্যার ক্যালিবার নিয়ে কারও কিছু বলার নেই। সে নিজের মেধার ক্ষমতা ভাঙিয়েই উঠছে, কারও সঙ্গে শুয়ে-টুয়ে নয়! সুকন্যাকে নিয়ে খারাপ কোনও কথাই কাউকেই বলা যাবে না। সব মিলিয়ে রোহিত খিটখিটে মেজাজে সারাটা দিন অফিস করল। তারপর ছ'টার কিছু পরেই বেরিয়ে গেল গাড়ি নিয়ে। প্রাথমিকভাবে ক্লাবে গিয়েছিল দু'-পাত্তর চড়াতে। ভুলতে তার পরাজয়ের বেদনা। কিন্তু এক-একটা দিনে সূর্য ওঠে শুধুমাত্র কিচাইন করার জন্য। সব ভুলভাল হয়ে যায় সে সব দিনে। চুপচাপ বসে পান করে উঠে যাওয়ার প্ল্যান ছিল রোহিতের। বাধ সাধল 'ট্যাপ-রুট'-এর একটা পোঁয়াপাকা ছেলে। পানাহারের পর সবচেয়ে পরিত্যাজ্য তর্কাতর্কি। এই ছেলের অতি-চালাক কথাবার্তা তাকে সেই তর্কাতর্কির দিকে ঠেলে নিয়ে গেল।

'ট্যাপ-রুট'-এর গান এখন বাঙালির ক্রেজ়। মুখে-মুখে ফেরে এদের গানের লাইন। সুরগুলো ক্যাচি, ভাষাও স্মার্ট। কিন্তু দলটার কোনও ছেলে বা মেয়েকেই গায়ক বলা যায় না। সাধনা-টাধনার কোনও ছাপ তাদের কারও কণ্ঠেই নেই। সেটাকে অবশ্য সমস্যা হিসেবে দেখে না রোহিত। সিরিয়াস শিল্পী হতে এরা কেউ আসেওনি। বরং, এরা চায় চটজলদি হাততালি। আর সেটা পাওয়ার যোগ্যতা এদের আছে। এদের গানে জোশ আছে। প্রেম নিয়ে, যৌনতা নিয়ে অদ্ভুতুড়ে ভাবনা আছে। শুনতে খারাপ লাগে না।

ছেলেটাকে রোহিত ভাল-ভাল কথাই বলছিল। মদ্যপান করতে-করতে ছেলেটাও গুনগুনিয়ে উঠছিল কয়েকটা গানের লাইন। তালে তাল, খাপে খাপ, ঠিক ছিল সব কিছু। ঝামেলার সূত্রপাত করল রক্তিম। রক্তিম মার্কিন দেশে বিশাল চাকরি করে। কিন্তু সে চাকরির এমনই মজা, দেশে ছ'মাস থাকলেও চলে। রক্তিম বলে, বর্ষাকালে দেশ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে! আর বৃষ্টি পড়ে না যখন, তখন নাকি ভারতের মতো দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও থাকার মানেই হয় না!

উচ্চমাধ্যমিকে খারাপ রেজাল্ট করে সে উত্তরবঙ্গের খুব সাধারণ একটা কলেজে নাম লিখিয়ে রেখেছিল। সে সময়েই এক জাহাজ কোম্পানির এজেন্টের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। সেই লোকের সূত্রে সে জাহাজে চাকরি নিয়ে ভেসে পড়ে। বাবা ছোটবেলাতেই মারা গিয়েছিলেন, মা চাকরি করতেন, রক্তিমের তেমন কোনও পিছুটান ছিল না এখানে। তারপর তার এক অবিশ্বাস্য অ্যাডভেঞ্চারের জীবন। এই ধরনের অদ্ভুত চরিত্রদের পঞ্চাশের দশকে খুব দেখা যেত। যারা নিয়ম মানে না, খানিকটা ঝুঁকি নিয়ে বিপজ্জনক জীবন বাঁচতে চায়। ইদানীং এই সব চরিত্র কম পড়েছে বলেই রক্তিম ক্লাবে একজন হিট চরিত্র। সে ক্লাবে আসলে সবাই খুশি হয়। তবে সে ক্লাবে আসে ক্বচিৎ কদাচিৎ। কারণ তার দেশে থাকা মানে কলকাতায় থাকা নয়।

সে চরকি কাটে এদিক, ওদিক। উত্তরবঙ্গের কোনও এক রিমোট জায়গায় রক্তিমের মা থাকেন। সেখানে সে সাহেবদের টাকায় একখানা স্কুল গড়ে দিয়েছে। মা সেটা চালান। প্রায় প্রতি বছর সেখান থেকে দু'-একটি ছেলেমেয়েকে রক্তিম দেশের বাইরে পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দেয়। শান্তিনিকেতনের কাছেও সে একটা স্কুল করেছে। সেটা চালায় রক্তিমের এক প্রাক্তন ব্রিটিশ বান্ধবী। রক্তিম একবার বিয়ে করেছিল। মেয়েটি বিয়ের এক বছরের মাথায় মৃত সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায়। তারপর রক্তিম আর বিয়ে করেনি। ক্লাবেও রক্তিম আসে অনিয়মিত। কিন্তু আজ যেন রোহিতের মেজাজ খারাপ করতেই তার আগমন!

অনিয়মিত হলেও রক্তিম চট করে আড্ডার মধ্যমণি হয়ে যায়। সে ক্ষমতা তার আছে। আছে প্রচুর অভিজ্ঞতার স্টক তার ঝুলিতে। আজও সবাই তাকে দেখে হইহই করে উঠেছিল। রোহিতও।

'তিনের পাতার গায়ক' তাকে চেনে না। আর রক্তিম ঘরে ঢুকে তাকে নিয়েই পড়ল, "তোমাকে ভাই খুব চেনা চেনা লাগছে। পুরুলিয়ায় মাণ্ডুমাতার মন্দিরে দেখা হয়েছিল কি?"

যারা রক্তিমকে চেনে, তারা জানে রক্তিম এভাবেই আবোলতাবোল গুল মেরে আলাপ জমায়। ছেলেটার সেটা জানার কথা নয়। তাছাড়া ছোঁড়ার রসবোধও কিছু কম। সে নাক-মুখ খিঁচিয়ে বলল, "আমি সেকুলার আইডেনটিটি রাখতে পছন্দ করি। মন্দিরে-টন্দিরে যাই না।"

ব্যাস! রক্তিমের জন্য এটুকু ধরতাই যথেষ্ট। সে খাপ পেতে বসে পড়ল ছেলেটাকে চাটবে বলে, "কী নাম তোমার ভাই?" সুবোধ বালকের স্বরে প্রশ্ন দিয়ে শুরু করল রক্তিম।

সবাই মজা দেখতে জড়ো হয়েছিল। রোহিত তার হুইস্কির গ্লাস নিয়ে চেয়ার ঠেলে এগিয়ে এসেছিল রক্তিম আর এই ছোকরার পাশের টেবিলে। ছেলেটি বাংলা গান গায় শুনে রক্তিম উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। রক্তিম নিজে একজন বাংলা গানের এনসাইক্লোপিডিয়া! ভীষণ উৎসাহে সে বাংলা গানের আলোচনায় ঢুকল। বাঙালির গান, বাংলার গানের আলোচনা ধীরে-ধীরে তাপ সংগ্রহ করছে, রোহিত অতি উৎসাহে তার তৃতীয় পেগটা একটু বেশি তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলল। রক্তিম এমনিতে ঠান্ডা মাথার ছেলে। কিন্তু খেপিয়ে দিলে বুনো শুয়োর। সে ইংরেজি বলে সাহেবদের মতো। কিন্তু ওর মতো খারাপ বাংলা খিস্তির স্টক আর কারও কাছে আছে কি

রক্তিম বিয়ে করেছিল। মেয়েটি বিয়ের এক বছরের মাথায় মৃত সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায়।

না, রোহিতের জানা নেই!
'ট্যাপ-রুট'-এর সেই গায়ক কাম সং রাইটার ছেলেটা খুব হম্বি-তম্বি করছিল। ভাবখানা, বাংলা গান নিয়ে শেষ কথা সেই বলবে। রোহিতের নেশা বাড়ছিল। বিরক্তিও। এমনিতে এই সব তর্ক-বিতর্কের কখনওই কোনও মানে দাঁড়ায় না। কেউ কারও কথা মন দিয়ে শোনে না বলে যে যা পারে বলে। সবাই বোঝাতে চায়, সে কত বড় জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। কিন্তু রক্তিমের সামনে আলফাল কথা বলে কেউ পার পায় না। রোহিত ভয় পাচ্ছিল সে কারণেই। চুপ করে বসে সে রক্তিমকেই নজর করছিল।
তৃতীয় হুইস্কি শেষ হল রোহিতের, পুরনো শিল্পীদের নাম করে খিস্তি শুরু করল সেই অর্বাচীন যুবক। পুরনো লিরিসিস্টদের ওপর দেখা গেল তার বিশেষ রাগ।
রোহিতের মন বলছিল আজ গন্ডগোল হবে। রবীন্দ্রনাথ তেমন জানা নেই, লালন এমন কিছু নয়, সলিল চৌধুরীও বাদ, কবীর সুমন এখন চলে না, ছেলেটা দেখা গেল সবাইকেই শুইয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। রক্তিম হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর ছেলেটার উদ্দেশে চোখা-চোখা খিস্তি শুরু করল। ছেলেটা প্রত্যুত্তরে চালাতে লাগল ইংরেজি গালাগাল।
রোহিত সামলানোর চেষ্টা করেছিল। সে ছেলেটির কাঁধে হাত রেখে তাকে রক্তিমের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বলল, "তোমরা বাংলা গানের ঐতিহ্য জানো না। তোমরা এখনও বাংলা গান সম্বন্ধে কোনও কথা বলার যোগ্যতা অর্জন করোনি। আর একটা কথাও বলবে না। চুপচাপ মাল খাও, তারপর কেটে পড়ো।"
ছেলেটা বলল, "ফা-ইয়োর ঐতিহ্য! বিলিভ ইন ডোপ অ্যান্ড লাভ। দেন রাইট ইয়োর ফা-ং সং।"
রক্তিম লাফিয়ে এসে ছেলেটার ঠোঁট বরাবর একখানা ঘুষি চালিয়ে দিল। ছেলেটি এতক্ষণ খিস্তি-খাস্তা করছিল শাহেন শার মতো, কিন্তু, হাতে-পায়ে, দেখা গেল তেমন দড় নয়। ঘুষি খেয়ে সে এলিয়ে পড়ল। তারপর কোনও মতে লনের দিকে চলে গেল। তারপর বাগান-ছাতার তলায় মুখ লুকিয়ে বসে ঘনঘন শ্বাস ফেলতে লাগল। ঠিক আহত বেড়ালের মতো!
ক্লাবে কারও গায়ে হাত তোলা বিরাট অপরাধ। ছেলেটির সরে যাওয়াতে মারপিটটা তেমন ঘন হল না বটে, কিন্তু ঘটনাটা সেখানেই শেষ হল না। রোহিত ক্লাবের একজিকিউটিভ কমিটির মেম্বার। কিছুক্ষণ পরেই সেক্রেটারির ঘরে তার ডাক পড়ল। রক্তিম, ট্যাপ-রুট, ও বাংলা গান নিয়ে সেখানে নানা ভ্যানতাড়া চলছে যখন, তখন কে একটা ঘরে ঢুকে ঘোষণা করল, রক্তিম অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে।
রোহিতের মৌতাত টসকে দিতে এর বেশি আর কী লাগে? এর পর চ্যাংদোলা করে রক্তিমকে গাড়িতে তোলা, তাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া, ডাক্তার ডাকা সব করতে হল রোহিতকেই। সে একা না থাকলেও, টগবগে বলে তার খ্যাতি আছে। তাছাড়া সেই একমাত্র ক্লাব সদস্য, যে রক্তিমের বাড়ি চেনে।
সব মিলিয়ে রোহিতের সন্ধেটা ভাল কাটেনি। ভেবেছিল, বাড়ি ফিরে বিশাখার সঙ্গে তার দুঃখের গল্প শেয়ার করবে।

তৃতীয় হুইস্কি শেষ হল রোহিতের, পুরনো শিল্পীদের নাম করে খিস্তি শুরু করল সেই যুবক।

ওব্বাবা! এখানে আরও বড় বখেরা তার জন্য দাঁত বের করে বসে আছে, তা কে জানত? বিশাখার মুখে খানিকটা শুনেই রোহিত আন্দাজ করতে পেরেছে কেসটা কী!
প্রথমে খানিক ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে বড় চাকুরে। ঘাবড়ে গেলেও স্মার্টনেস যায় না তার! ঘাবড়েছে জানতে না দিয়ে সে ডিনার সারল। তারপর সিগারেট ধরিয়ে, বিশাখার পাশে বসে বসে রাতের খবর শুনল। উঠে গিয়ে বাথরুম সারতে সারতে মোবাইলে আসা মেসেজ দেখল। তার সহকর্মী গোয়েল প্রতি রাতে রোহিতকে নোংরা-নোংরা জোক পাঠায় মোবাইলে। এখন তেমনই একখানা পাঠিয়েছে। জোকটা পড়ে রোহিত ফ্যাকাশে হাসি হাসল, নিজের মনে। তারপর ফ্লাশ করে গুনগুন করে রবীন্দ্রসঙ্গীত ভাঁজতে-ভাঁজতে বিছানায় এসে শুল। গায়ের টি-শার্টে বেপরোয়া ভাব!
"লালনকে নিয়ে মাতামাতিটা কি আমাদের জেনারেশনেই সীমাবদ্ধ? তোর কী মনে হয়?" গলা তুলে বলল সে বিশাখাকে। আজ কিছুতেই সে সাংসারিক ক্যাঁচালে আলোচনা ঢুকতে দেবে না। আজ না হয় বাড়িতেও পাত পেড়ে হয়ে যাক বাঙালির গান, বাংলার গান।
"পরের জেনারেশন যখন তিরিশ ছোঁবে, তখন তারাও লালনে মজবে," গলা তুলেই বলল বিশাখা। তারপর চটি ফটফটিয়ে হাতে প্লেট নিয়ে চলে এল বিছানাতে। বালিশের ওপর কাগজ পাতল। তাতে বসালো খাওয়ারের প্লেট। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চকচকে চোখে রোহিতের দিকে তাকিয়ে বলল, "লালন-টালন রাখ। বুলির বিয়ের প্রসঙ্গে আমাদের কী করা উচিত বল তো? মা-বাবার এক্সপেক্টেশন সম্বন্ধে তোর কোনও আইডিয়া আছে? আর বুলি? ডিড ইউ নো শি ওয়জ সিয়িং সামওয়ান?"
রোহিত প্রমাদ গুনল। বিশাখা আজ একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বে না মনে হচ্ছে। রোহিত মুখের হাসি বজায় রেখে বলল, "আজ ক্লাবে রক্তিম এসেছিল। বলল, সামনের মাসে কুমির শিকারে যাচ্ছে। খিদিরপুর থেকে কুমির শিকারের জাহাজ ছাড়বে, তাতে চেপে যাবে। পেত্রায়্যাস মজুমদার নাম নিয়েছে। জাল পাসপোর্ট তৈরি হয়ে গেছে..."
অন্য দিন হলে বিশাখা লাফিয়ে উঠত এমন একটা অবিশ্বাস্য খবরে। আজ তেমন কিছু বলল না। নিস্তেজ গলায় বলল, "পেত্রায়্যাস কেন? মজুমদারই বা কেন?"
রোহিত উৎসাহী গলায় বলল, "পেত্রায়্যাস একজন সাদা চামড়ার বাউল। রবীন্দ্র-ভক্ত। শান্তিনিকেতনে রক্তিমের রেগুলার অতিথি। চাইল্ড অ্যাবিউজ-এর কারণে গতবছর জেলে গেছে। আর মজুমদার পদবিটা নাকি ওর খুব পছন্দ।"
বিশাখা ভাবলেশহীন গলায় বলল, "চাইল্ড অ্যাবিউজারের নাম নিয়ে রক্তিম কী প্রমাণ করতে চাইছে। রক্তিমকে ধরে ক্যালানো উচিত।"
ধরছে, ধরছে, ওষুধ ধরছে। রোহিতের নিশ্চিন্ত লাগতে থাকে! রক্তিমের অ্যান্টিক্সে বিশাখাকে যত ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে, ততই তার লাভ। রোহিত মেয়েমহলের ঝামেলা থেকে শতহস্ত দূরে থাকতে চায়। ওসবে নাক গলালেই তোমার তেরোটা বেজে যাবে। তখন দু'পক্ষই তোমায় সাক্ষী মানবে এবং যেহেতু প্রকাশ্যে তুমি কারও পক্ষ

নিতে পারবে না, তুমি চিহ্নিত হয়ে যাবে ব্যক্তিত্বহীন বলে! ওই চক্করে কেউ ঢোকে?
রোহিত তড়বড় করে বলল, "আরে লোকটাকে নাকি ফাঁসানো হয়েছে। ও মোটেই অ্যাবিউজ-ট্যাবিউজ করেনি। আর ফাঁসিয়েছে, একটা আট বছরের ফুরফুরে ছেলে। এই ছেলের অসাধারণ লেখার হাত। পেত্রায়্যুস ছেলেটিকে উৎসাহ দিত লেখালেখির বিষয়ে.... ছেলেটিকে বিভিন্ন রাইটার্স ওয়ার্কশপ-এ নিয়ে যেত সঙ্গে করে... তাতেই নাকি ছেলেটি পেত্রায়্যুসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে..."
চোখেমুখে ভ্রুকুটি ফুটিয়ে বিশাখা বলল, "অল রাবিশ। এসব ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডের সমস্যা। আট বছরের ছেলের প্রেম-ফেম শুনলেই আমার থাবড়া মারতে ইচ্ছে করে। বাচ্চা ছেলে, পেটে ভাত আছে তো, তাই সব মনগড়া ক্রাইসিস। করত এখানে চায়ের দোকানে বয়-গিরি, এসব আদিখ্যেতা বেরিয়ে যেত। প্রেম-যৌনতা এসবের একটা বয়স থাকে রোহিত... আমাকে এসব ন্যাকা-ন্যাকা গা ঘিনঘিনে গল্প বলবে না তো! আমার বিবমিষা হয়।"
"বলো কী বিশাখা! তুমি না ফ্রয়েডের তত্ত্ব আওড়ানো জঙ্গি নারীবাদী! ওনার চাইল্ড সেক্সুয়ালিটির ব্যাখ্যাগুলো পড়েছ তুমি! হাউ ক্যান ইউ টক লাইক দিস? প্রি-অ্যাডোলেসেন্স সেক্স আর লাভ ইজ় বাস্তব বিশাখা। তোমার বিবমিষা জাগলে কিচ্ছু করার নেই। আর বাই দ্য ওয়ে, ওই চায়ের দোকানগুলোতে কী ধরনের সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ় হয় তুই জানিস না? ওখানে কি শুধু হাড়-ভাঙা পরিশ্রম আর আধপেটা খাওয়া? তুই হঠাৎ এমন আনসান বকছিস? তোর হলটা কী?"
"ওরা কেউ ওদের অ্যাবিউজ়ারদের প্রেমে পড়ে না রোহিত। দে আর টেরিফাইড অফ দেম। অ্যান্ড ইন মোস্ট কেসেস, সারাজীবনে একবারের জন্যেও প্রেমে পড়ে না। দারিদ্রের চাবুক খেতে-খেতে প্রেম ব্যাপারটাই ভুলে যায়।"
"সেটা দারিদ্রের সমস্যা। পেত্রায়্যুসের ছাত্র গরিব নয়। সেটা তো তার দোষ নয়। তোর সব গুলিয়ে গেছে বিশাখা। ঠান্ডা মাথায় যুক্তি সাজাতে পারছিস না।"
বিশাখা রেগে গেলে গাল কামড়াতে থাকে। রোহিত দেখল বিশাখা সেটাই করছে। রোহিত হাত দিয়ে বিশাখার গালে টোকা মেরে বলল, "ঠুসিস না। এত বিচলিত হয়ে যাওয়ার কিছু নেই। আমার যখন আট বছর বয়স, তখন আমরা নাগের বাজারের কাছে একটা বাড়িতে ভাড়া থাকতাম। আমাদের বাড়িওয়ালার মেয়েটা... তখন ক্লাস সিক্স-টিক্সে পড়ত... আমি তার সঙ্গে রোজ ডাক্তার-ডাক্তার খেলতাম... তোকে বলিনি এই মিমির কথা?"
বিশাখা এবার হেসে ফেলল। বলল, "বলিসনি আবার? নিউ মার্কেটে একবার এই মিমির সঙ্গে দেখাও হয়েছিল তো! মনে নেই? অতি পাতি, ঘরেলু গিন্নি-বান্নি চেহারা... মোটা করে সিঁদুর লেপে স্বামীর পার্স হাল্কা করতে বেরিয়েছে, সঙ্গে গদগদ স্বামী।"
রোহিত হেসে বিশাখাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "তোর বরকে নষ্ট করেছে বলে, তোর হেবি রাগ মিমির ওপর, তাই নারে?"
বিশাখা স্বামীর নাকটা মুচড়ে দিয়ে বলল, "সত্যি কথা বলব? নষ্ট না হওয়া ছেলেদের আমার আলুভাতে মনে হয়। ভার্গিস মিমি তোকে নষ্ট করেছিল। আই লাভড ইয়োর স্টাইল ফ্রম দ্য ডে ওয়ান।"
রোহিত ফাঁদে পা দিল। বিশাখার কোমরে হাত বোলাতে-বোলাতে বলল, "স্টাইল দেখাতেই তো চাই... আয়, আমার বুকে আয়..."
বিশাখা স্বামীর হাতটা দৃঢ় ভঙ্গিতে সরিয়ে দিয়ে বলল, "আমিই বোকা। এত দিন বুঝতেই পারিনি তুই আসলে ভেতরে-ভেতরে সব অর্থেই নষ্ট হয়ে গেছিস। তখন থেকে কথা ঘুরিয়েই চলেছিস... ভাবছিস এই ভাবে প্রসঙ্গটা চেপে দিবি, তাই নারে?"
রোহিত চুপ করে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে থাকল। এমন সপাটে মার একমাত্র বিশাখাই মারতে পারে! বিশাখা রেগে গেলে কখনও গলা তুলে কথা বলে না। সে বিড়বিড় করে বলল, "আমরা কত বড় হিপোক্রিট, তাই ভাবছিলাম। নিজেদের শিক্ষা, বিশ্বাস কিছুই চারিত করতে চাই না আমাদের চারপাশের মানুষগুলোর মধ্যে। তারা অন্ধকারে থাকলে থাকুক। আমার কিছু যায় আসে না। অথচ আমরাই ভাব করি আমরা বিরাট বিপ্লব করে চলেছি রোজ।"
রোহিত একটা শ্বাস চাপল। এইসব আলোচনায় ঢুকতে সে ভিতর থেকে এতটুকু সাড়া পাচ্ছে না। বরং তার মাথা এখন খানিক আয়ত্তে এসেছে, বিশাখাকে ধামসানোর ক্ষীণ ইচ্ছে জাগছে... খুব সন্তর্পণে, সামনে ঝুঁকে সে বউয়ের কোমরে চিমটি কাটল, "কোমরে চর্বি হয়ে তোকে আরও সেক্সি দেখতে হয়েছে ইদানীং। আয়, আমার সঙ্গে শুবি আয় তো। তারপর ভাত খাস। খিদে পায়নি বললি। থালা রাখ।"
বিশাখা ঝাল-ঝাল গলায় বলল, "তুই তো এতক্ষণ লটরপটর করছিলি... পারবি কি না আমার সন্দেহ আছে, শুধুশুধু ঘাম ঝরাতে আমি রাজি নই। আর তুই আমার কথাগুলো শুনছিস না, নাকি? একটা সিরিয়াস ডিসকাশন করছি... এখন লদকা-লদকিতে আমি মোটেও ঢুকব না।"
রোহিত মোলায়েম গলায় বলল, "ওরে মেয়ে, আমি সারাদিন গাধার খাটুনি খেটেছি, তারপর অতিরিক্ত মদ খেয়ে ফেলেছি, এখনই তোকে সিরিয়াস ডিসকাশনে ঢুকতে হবে? কাল অবধি অপেক্ষা করলে হয় না?"
"না। হয় না।"
রোহিত সংঘাতের পথে গেলই না। খুব আদর করে বিশাখার কাঁধে হাত রেখে বলল, "শোন বিশাখা। বিপ্লব করার জন্য প্রথমে গ্রাউন্ডওয়ার্ক করতে হয়। এই বাড়িতে তুই কি সেটা করেছিস? বুলি একেবারেই গড়পড়তা একটা মেয়ে। তার ওপর তোর বিশ্বাস চাপিয়ে দিলে সে মানবে কেন? ওরা আর আমরা একেবারেই আলাদা দু'টো দল। ওদের, ওদের মতন থাকতে দে। তাতে সব পক্ষই শান্তিতে থাকবে। আর শোন, বোনের বিয়ের জন্য এমনিই আমি খরচ করতাম... বুলি আমার একমাত্র বোন, তার বিয়েতে শুধু কর্তব্য না, ভালবেসেই আমি খরচ করব। আর এ দাদা তো ফ্যালনা দাদা নয়। যথেষ্ট এলেমদার দাদা। ফুটানি দেখানোর জন্যই ওর যা যা ইচ্ছে, তাই তাই হবে। তুই এর মধ্যে ঢুকিস না। আমার মা ভয়ানক বোকা। টাকার কথাটা তার তোকে বলাই উচিত হয়নি। শুধু বোকা বললে কম বলা হয়। এটা মায়ের অন্যায়। কিন্তু আমি চাই না এ নিয়ে কোনও কথা কাটাকাটি হোক বাড়িতে। তুই শান্ত মনে ঘুমোতে যা এখন। আমি মায়ের সঙ্গে আলাদা করে কাল কথা বলে নেব।"
বিশাখা হেসে বলল, "জানতাম। এই ইন্টারপ্রিটেশন হবে, জানতাম। তোদের সবার ধারণা, আমি খরচের ভয় পাচ্ছি। হাউ প্যাথেটিক!"
রোহিত এবার সত্যি সত্যিই নেশার ঘোর কাটিয়ে ফেলেছে। তার ভ্রু কুঁচকে গিয়েছে। সে অবস্থাতেই সে বলল, "না খরচের ভয় তুমি পাও না বিশাখা। সেই অপবাদ কেউ দিতে পারবে না তোমায়। এই বাড়ির অনেক কিছুই তোমার টাকায় হয়েছে। কিন্তু এই টাকাটা তোমার কাছে মায়ের চাওয়া উচিত হয়নি।"
বিশাখা যেন শুনতেই পেল না কথাটা। সে বলল, "আচ্ছা? তোমরা কেউ বুলির সম্মান নিয়ে ভাবিত নও, তাই না? দাদা-বউদির দয়ায় আজকের যুগে একটা মেয়ের বিয়ে হবে? তার এত বিয়ের তাড়া কিসের?

বিয়ে হবে সমানে-সমানে। দু'জনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংসারে ঢুকবে, এটাই তো বিশ্বাস করেছি এত দিন আমরা। তুমি করোনি?"

"আমরা করলেও, বুলি করেনি। বুলির তো অসম্মানিত লাগছে না! তুমি এত ভাবছ কেন বিষয়টা নিয়ে?"

"ভাবছি কারণ দিস ইজ হিপোক্রিসি। আমরা পণপ্রথার বিরুদ্ধে, নারী-পুরুষের সমানাধিকার নিয়ে কথা বলি অথচ নিজের পরিবারেই অন্য রকম কাজ করি, ইজ দ্যাট ডান?"

রোহিত দু'দিকে মাথা নাড়ল। হতাশ ভঙ্গি তার। বলল, "এভাবে হয় না বিশাখা। আদর্শ-টাদর্শর জন্যেও পরিমণ্ডল লাগে... তুমি এই বিয়েতে এভাবে বাগড়া দিও না। যার সম্মানের কথা ভেবে এসব করছ, তার সামনে বিয়ে ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই। হাসিমুখে, মন থেকে কথাটা মেনে নাও। তাতে সবার লাভ।"

বিশাখা চুপ করে বসে থাকল। এ পরিবারে সে নতুন। বুলির সঙ্গে তার তেমন ঘনিষ্ঠতা হয়নি কোনও দিন। বুলির পড়াশোনা, কেরিয়ার, এসব বিষয়ে সে কোনও ইন্টারেস্ট দেখায়নি কখনও। হাজার-হাজার সাধারণের মতো বুলি কলেজে গিয়েছে, হ্যাহ্যা-হিহি করেছে, সাদামাটা ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে সময় কাটাতে কম্পিউটার কোর্সে ভরতি হয়েছে। সময় কাটানোর মানে বিয়ের জন্য অপেক্ষা করা।

অথচ এই মেয়েকে স্কুলে ভর্তি হতে কোনও আন্দোলন করতে হয়নি। স্বাভাবিক নিয়মেই সে পেয়েছে শিক্ষার সুযোগ। বাড়িতে পদে-পদে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে ভাই ছেলে বলেই তার থেকে অধিক দামি! তার তো বেশি করে চাওয়া উচিত ছিল অন্যরকম জীবন। স্বাধীন জীবন। সাম্যের জীবন। অথচ সে তা মোটেও চায় না। সে চায় বিবাহ। টাকার পুঁটুলি হাতে মাথা ঝুঁকিয়ে অন্যের ঘরে পদার্পণ! এই মেয়েরা মনে মনে সবাই বড়লোক বরের স্বপ্ন দেখে। নিজের প্রতাপে, নিজের ক্ষমতায় কেউ চায় না বড়লোক হতে।

রোহিত আবার বিশাখার গালে হাত দিল। তার প্রিয়তম এই নারীটির বাস্তব-বুদ্ধি খুব কম। আদর্শ-টাদর্শ আছে বটে। আবার মারাত্মক মহান হওয়ার লোভ! এই ক্ষেত্রে শুধু আদর্শের কারণেই যে চিন্তিত, তা হয়তো নয়। সূক্ষ্ম হিসেব কিছু আছে। সেটা ঠিক কী, রোহিত ধরতে পারছে না... মাথাটা ঝম্পু হয়ে আছে এখন... পরে সে সব নিয়ে ভাবা যাবে! তবে কেসটা কী, বুঝলেও রোহিত মনে মনে বিশাখাকে ভয় পায়। সব দিক বজায় রেখে এ ঝঞ্ঝা কী ভাবে পেরোবে ভাবতে ভাবতে সে ফের একখানা সিগারেট ধরায়, "বিশাখা, খাবারটা খেয়ে নে এবার, তারপর ঘুমোতে আয়। আমার খুব টায়ার্ড লাগছে।"

বিশাখা থালায় হাত দিল না। রোহিতের দিকে খরখরে চোখে তাকিয়ে বলল, "কেন টায়ার্ড লাগছে? বেশি মদ খেয়ে ফেলেছ বলে?"

বিশাখা আর রোহিত অবলীলায় 'তুই' আর 'তুমি' পাল্টাপাল্টি করে পরস্পরকে সম্বোধন করে। সূক্ষ্মভাবে খেয়াল করলে বোঝা যায়, প্রেমে ঘাটতি পড়লে তুই হয়ে যায় তুমি।

"তোকে সব বলতাম। তোর ফোন সুইচড অফ ছিল। ক্লাসে ছিলি নিশ্চয়ই। অফিসে ঝামেলা হয়েছে একটা, সেই কারণেই ক্লাবে যাওয়া... সেখানেও নিস্তার পেলাম না... তুইও তো শুনতেই চাস না আমার সমস্যা।"

"কী সমস্যা তোমার রোহিত? তোমায় লেঙ্গি মেরে কেউ বেরিয়ে গেছে, এই তো? আর সেই শোক মদের গেলাসে ডুবিয়ে নিতে তুমি গিয়েছিলে ক্লাবে, যেখানে তোমার মনের মতন আতসবাজি পোড়েনি আজ! এই তো?"

রোহিতের চোখে ছায়া পড়ে কষ্টের। এভাবে বলছে বিশাখা? সে কোনও উত্তর দেয় না। বিশাখার দিকে তাকিয়ে থাকে চুপ করে। বিয়ের পরে, ঘুমোতে যাওয়ার আগে স্বামী-স্ত্রী এভাবেই কথা বলে থাকে? সব বাড়িতেই কি চিত্রটা একরকম?

বিশাখা চিড়বিড়িয়ে বলল, "আমি কাজ করি না? আমার কাজের জায়গায় ফ্রাস্ট্রেশন নেই। কোনও দিন শুনতে চেয়েছ সে সব? কলেজ থেকে আমি কোথায় যাই আমার দুঃখ ভুলতে?"

"তুইও ক্লাবে চল না। আমি কি তোর মদ খাওয়ায় আপত্তি করি?"

বিশাখা কোনও উত্তর না দিয়ে ভাত মাখতে থাকে মন দিয়ে। অধিকাংশ মেয়ে মন খারাপ হলে খেতে ভুলে যায়। বিশাখা ঠিক তার উল্টো। মন খারাপ হলেই সে বেশি বেশি খেতে থাকে। রোহিত ছটফট করতে থাকে। বিশাখা যে ধরনের স্বাধীনতা পায় এ বাড়িতে, তা অনেক মেয়েই স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। এর পরেও বিশাখার মনের এই অবস্থা! কী চায় সে?

বিশাখা খেতে থাকল। রোহিত বিছানায় শুয়ে পড়েছে, হাতে পামুকের একটা উপন্যাস। সে আবার কিছু না-পড়ে ঘুমোতে পারে না। বিশাখা আধখাওয়া প্লেট নিয়ে বারান্দায় চলে গেল। রাতের আকাশ দেখতে-দেখতে মাছের কাঁটা চেবানো তার প্রিয় ব্যসন!

রোহিত নয়, কোনও বন্ধুও নয়, তার এখন ইচ্ছে করছে নিজের সঙ্গে থাকতে। এর পর কী? বিশাখার কী করা উচিত? টাকা সে দিক, না দিক, বুলির বিয়ে ওই প্রসেনজিতের সঙ্গেই হবে। মেয়ে হয়েও তার শাশুড়ি কী অবলীলায় মেয়ে পার করার কথা বলছিলেন। বিশাখার মনে হচ্ছিল তার কানে কেউ গরম তরল ঢালছে। সেটা নিশ্চয়ই একান্তই তার কানের দোষ। রোহিতের তো কোনও হেলদোল হল না কথাগুলো শুনে। আদর্শ-টাদর্শ তার মানে ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে আলোচনা করার বিষয়। নিজের পরিবারে সে সবের উল্টো দিকে হাঁটলেও চলে।

তাহলে আর সমাজ-টমাজ নিয়ে এত কথা কিসের? বামপন্থী নেতা গাড়ি চড়লে সেটা আপস? প্রগতিশীলতার ধ্বজাধারী বাঁকা পথে যৌতুক দিয়ে বোনের বিয়ে দিলে সেটা মানিয়ে নেওয়া? বিশাখার চোখ দিয়ে আগুনের হল্কা বেরোতে থাকে। সে ঠিক করে নেয় তার পথ। সে তার মতোই থাকবে। যা তার আদর্শের বাইরে, তাতে সে সামিল হবে না। খাওয়া শেষ করে সে বাথরুমে গিয়ে ব্রাশ করল হিংস্রভাবে। তারপর নাইটি পরে বেডরুমে ঢুকে দেখল, রোহিতের বুকের ওপর পামুক আধখোলা পড়ে আছে, রোহিত ঘুমিয়ে কাদা।

বিশাখা বিছানার কোনায় বসে রোহিতের মুখটা দেখতে থাকে। এই সেই ছেলে, যার জন্য বিশাখা একসময় বাড়িতে রীতিমতো যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল! বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর, প্রেমের সেই শিহরন বা রোমাঞ্চ গায়েব হয়েছে বটে, কিন্তু ছেলেটাকে সে এখনও ভালবাসে। দূরত্ব বেড়েছে তাদের মধ্যে অনেক। সেটা তো অস্বাভাবিক নয়... সারাদিন দু'জন একেবারে আলাদা দু'টো জগতে কাটায় অনেকটা সময়। বাড়ি ফেরার পর দু'জনেই থাকে ক্লান্ত। খুব যে আদান-প্রদান হয়, তা নয়। তবু রোহিতই, আজও তার সবচেয়ে কাছের মানুষ।

রোহিত একটু পলায়নবাদী টাইপ আছে, তা বিশাখা বিয়ের আগে থেকেই জানত। তাদের বিয়ের আগে, রোহিত তাকে বারবার বলেছিল, এ বাড়িতে বিশাখা থাকতে পারবে না। বিশাখাই জেদ করে শ্বশুরবাড়িতে থাকতে এসেছিল।

সমস্যা হয়েছে অনেক। তবু বিশাখা দাঁতে দাঁত চেপে এখানেই রয়ে গিয়েছে। বিশাখা নিপাট ভালমানুষি দেখাতে এসব করেনি, তা বিশাখা যেমন জানে, রোহিতও জানে। বিশাখার প্রভুত্বের লোভ আছে। এই বাড়িতে থাকলে সে প্রভু হতে পারে। বিশাখার তাতেই সুখ। রোহিত এড়িয়ে

থাকতে চায় বলেই বিশাখাকে সরাসরি কোনও দিন কথাগুলো বলেনি। শাশুড়ির হাতে যখন তখন পাঁচশো টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বিশাখা মনে মনে মিটিমিটি হেসেছে। অসচ্ছল পরিবার তার অনেক কু-অভ্যেস ঢোঁক গিলে মেনে নেয়। এ হল টাকার দাপট!

কিন্তু এবার এ বাড়ি ছাড়ার সময় হয়েছে। শ্বশুরবাড়ি নামক এক্সপেরিমেন্টটার অনেকটাই তো দেখা হল! আর কেন? বুলির বিয়ের পণ দেওয়াকে কেন্দ্র করে সে এবার এ বাড়ি ছাড়বে। সেক্ষেত্রে তার লাভ বই লোকসান নেই। সে অন্তত বলতে পারবে, সে পণপ্রথা-বিরোধী বলে তাকে বাড়ি ছাড়তে হয়েছে।

রোহিতের কপালে গাল ঠেকিয়ে শোয় বিশাখা। চোখবুজে বলল, "অ্যাই হাঁদারাম... এত মদ খাও কেন? আমার যে এখন ভীষণ গল্প করতে ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গে! তার কী হবে?"

রোহিত আঁউআঁউ করে কিছু বলে পাশ ফিরল।

বিশাখা শ্বাস ফেলল। হঠাৎ তার এ বাড়ির সব ক'টা লোভী আর বোকা প্রাণীগুলোর জন্য ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। এরা অন্যরকম বলেই না তার এই বাড়িতে এত ফাঁটবাজি।

৫

ক্রিসমাস ইভ এখন বাঙালির প্রধান পার্বণের একটি। বাইশ-তেইশ তারিখ থেকেই বিভিন্ন অবয়ব আর বৈভবে ক্রিসমাস ইভ পালন করতে লেগে পড়ে বাঙালি। এ বছর ক্রিসমাস ইভে ঋষিকার একাধিক নেমন্তন্ন ছিল। কিন্তু বিতানের হঠাৎ মৃত্যুর কারণেই ভেবেছিল, সে পার্টিতে যাবে-টাবে না। মন ভাল ছিল না ঋষিকার। সমুদ্র বলল, তারও মন খারাপ বটে, কিন্তু সে তার নিজের ক্লাবের পার্টিতে যাবে। ঋষিকা চাইলে তার সঙ্গে যেতে পারে।

ঋষিকা যথারীতি দোনামনায় ছিল। প্রথমটায় ঠিক করেছিল সমুদ্রর সঙ্গেই যাবে, কিন্তু বিকেল গড়াতে না গড়াতেই এত ফোন আসতে লাগল, সে বেশ বুঝল, তার সংকল্প ধোপে টিকবে না। মন খারাপের অজুহাত কেউ কানে তুলতে রাজি নয়। তিনটে হাউসের জন্য যে কলম ধরেছে, তাকে এত সহজে রেহাই দেবে কেন ইন্ডাষ্ট্রির বন্ধুরা?

রাত আটটা নাগাদ তারা দু'জন বাড়ি থেকে একসঙ্গেই বেরল। বেরনোর আগে সমুদ্রকে অস্থির লাগছিল ঋষিকার। বারবার মেসেজ আসছে তার ফোনে। ঝটঝট করে উত্তর লিখছে। সিগারেট খাচ্ছে বেশি-বেশি... কেমন যেন অন্যমনস্ক।

"কী হয়েছে তোমার? এনি প্রবলেম?" জানতে চাইল ঋষিকা।

"হুঁ...ওই অফিসের একটা সমস্যা... মিটে যাবে। নট টু ওয়রি।"

সমুদ্র বোধহয় সত্যি বলল না, ভাবছিল ঋষিকা। সে পিছন থেকে সমুদ্রকে জড়িয়ে ধরে বলল, "আমাকে তুমি খুব বোকা ভাবো না?"

সমুদ্র চমকে তাকাল ঋষিকার দিকে। তারপর অনেকক্ষণ তাকিয়েই রইল। ঠোঁট উল্টে বলল, "বোকা ঠিক ভাবি না। তবে হ্যাঁ, তোমায় খুব প্রোটেক্ট করতে ইচ্ছে করে। হয়তো তোমার সেটা পছন্দ নয়। আফটার অল তুমি এখন একজন স্টার!"

ঋষিকা বরের পিঠে কিল মেরে বলল, "কী জানি, হয়তো বোকা স্টার ভাবো! তোমার অবশ্য দোষ নেই, আমি এখনও সেই হাবাগোবা মফস্সলিই আছি। সেটা বেশ বুঝতে পারি... সেদিন বিতানের বাড়িতে..."

সমুদ্র তাকে কথা শেষ করতে দিল না। বলল, "আঃ, ঋ... এবার বিতানের প্রসঙ্গটা থাক। প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা হয়ে গেছে, আর ভাল লাগছে না।"

ঋষিকা থতমত খেয়ে যায়। বলল, "ছত্রিশ ঘণ্টা! এ আবার কেমন ধরনের কথা? হঠাৎ কী হল গো?"

সমুদ্র ক্লান্ত স্বরে বলল, "কিছু হয়নি। ঘণ্টার কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে! ও সব ধরো না। আজ আর এসব ভাবতে ভাল লাগছে না। আজ প্রাণ চাইছে ফূর্তি। চলো.... গেট রেডি... লেটস গো অ্যান্ড পার্টি! কত দিন মস্তি করিনি বলো তো!"

ঋষিকা চুপ করে গেল। সমুদ্রর কথা সে পুরোটা খেল না। কিন্তু প্রতিবাদও করল না। সমুদ্র কোনও দিন তেমন 'মস্তির' ভক্ত ছিল না! আজ হঠাৎ কী হল তার? বিতানের শোক ভুলতেই কি সমুদ্র পার্টি-উন্মুখ? কে জানে! সমুদ্রকে কবেই বা সে ঠিকঠাক ধরতে পেরেছে?

লেক গার্ডেন্সে তাকে নামিয়ে সমুদ্র চলে গেল নিজের ক্লাবে। গাড়িটা পাঠিয়ে দিল ঋষিকার জন্য। আরও দু' জায়গায় মুখ দেখিয়ে ঋ ক্লাবে পৌঁছল যখন, তখন রাত অনেক গভীর হয়েছে। মানুষ-মানুষী হয়ে উঠেছে ছায়া-ছায়া। সবুজ-ঘিয়ে জংলা প্রিন্টের শিফন আর স্লিভলেস ঘিয়ে ব্রাউজ ঋ'কে বেশ শ্রীময়ী লাগছিল আজ। রোগা বলেই তাকে শিফনে খুব মানায়। তাছাড়া এখন তার রোগা-কালো শরীরে লেগেছে কিছু সাফল্যের ছাপ। সফল মানুষকে কম বিবর্ণ দেখায়।

দু'টো পার্টিতেই সে তার লেখার প্রশংসা শুনেছে। শুনেছে, তার অভিনয় সংক্রান্ত ভাল ভাল কথা। সিরিয়ালের সহকর্মীদের চাপাচাপিতে দু'-এক পেগ ভদকাও খেতে হয়েছে তাকে। সব মিলিয়ে তার মনটা ছিল ফুরফুরে। আর এ কথা কে না জানে, মন খুশ থাকলে মানুষকে দেখতেও ভাল লাগে?

ঋষিকা ক্লাবে ঢুকল যখন সমুদ্রর সহকর্মীদের বউরা ততক্ষণে শাশুড়ির নিন্দে, চিকেনের রেসিপি আর শাড়ির দাম নিয়ে আলোচনা করে ক্লান্ত ও বোরড। বোতল-বোতল ঠান্ডা পানীয় বা এক পেগ ভদকা খেয়ে ব্যোম! তারা ডাকসাইটে সুন্দরীর দল। গায়ের রং আর মুখের আদল দেখিয়ে ঘ্যামা-ঘ্যামা বিয়ে হয়েছে। মনে-মনে তারা ঋষিকাকে করুণা করতেই অভ্যস্ত। সেই ঋষিকা এল রাত এগারোটায়? নিজের কর্মজগতের স্বাধীন পার্টি সামলে? তাও আবার মুখে ঝলমলে হাসি ঝুলিয়ে? এ কি মেনে নেওয়া যায়? কর্পোরেটের বউরা ধরে নিল ঋষিকা ভাও খাচ্ছে। টার্বো স্টিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের স্ত্রী, মিসেস মল্লিকা সিনহা, মিষ্টি করে সবাইকে শুনিয়ে বললেন, "এই তো ডায়লগ-রাইটার এসে গেছেন! হ্যাঁরে ঋষিকা, তোদের কি ডায়লগ অনুযায়ী পেমেন্ট দেয়?"

ঋষিকা প্লাস্টিক হাসি হাসল! তারপর একটা বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে বসে বলল, "পেমেন্ট দেয়ই না ধরে নিতে পার। আমার লেখা অতি লো স্ট্যান্ডার্ডের। কে আমায় পেমেন্ট দেবে?"

"এই তো! বিনয় শুরু হয়ে গেল! তুই এখন তিনটে সিরিয়াল লিখছিস না? লো স্ট্যান্ডার্ড বললেই হল?"

"তুমিই বলো না, ওগুলোর স্ট্যান্ডার্ড হাই? তোমার কী মনে হয়?"

মল্লিকা আমতা-আমতা করে বলল, "নিশ্চয়ই হাই! এত লোক দেখছে যখন!"

"এত লোকের কথা বাদ দাও। তুমি নিশ্চয়ই দ্যাখো না। কি? দ্যাখো তুমি?"

"নারে, আমার সময় হয় না..."

"জানি...যাদের হাতে অনেক সময়, ওসব তাদের জন্য... তুমি তো কত ব্যস্ত।"

মল্লিকা রাগে গরগর করতে থাকল। ঋষিকা মোক্ষম জায়গায় ঘা মেরেছে। মল্লিকা যে আদৌ ব্যস্ত নয়, সে খবর এখানে উপস্থিত সবাই রাখে। মফস্সলের কেল্টে মেয়েটা বেশ কথা শিখেছে তো, মনে-মনে বলল সে! মল্লিকার স্বামী, শুভময় এবার একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলল। সে মাতাল হাসি হেসে বলল, "এই যে ম্যাডাম, তোমার পরের সিরিয়ালে তুমি আমায়

একটা রোল দাও না। আমিও কিন্তু নাটক-ফাটক করেছি এক সময়। আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল বলতাম যখন, ওঃ, সে কী ফাটাফট হাততালি!"

ঋষিকা সাদা মাথায় থাকলে এ কথার উত্তর দিত না। কিন্তু আজ রাতে সে কিছুটা রঙিন বলেই হেসে বলল, "ফাটক! বাঃ এই নিন, আজ আবার হাততালি!"

আশ্চর্য ব্যাপার! ঋষিকার সঙ্গে সঙ্গে আরও দু-একজন হাততালি দিল। হাততালি ব্যাপারটা সংক্রামক, নাকি মাতালরা হাততালি দেওয়ার অজুহাত খোঁজে! শুভময় নিজেও হাততালি দিয়ে চিৎকার জুড়ল। তারপর বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফাটক... বিবাহিত পুরুষের ফাটক ছাড়া আর গতি কি আছে বলো না? আমরা তো সবাই স্বেচ্ছায় ফাটকে আটক! হে-হে! কী, সমুদ্র? ঠিক বলছি? নাটক-ফাটক-আটক? বাবা, আজ তো দেখছি আমার হেবি কবিতাও আসছে! ওয়ান কবি গন... ওয়ান কবি অন!"

ওয়ান কবি গন বলতে শুভময় বিতানকে বোঝাচ্ছে বোঝা গেল। কিন্তু ওয়ান কবি অন মানে কি? ও নিজের কথা বলছে?

"তোমাদের বন্ধু ছিল না? ওই যে বিতান বোস? এই ক্লাবে দেখেছি যেন তোমাদের সঙ্গে দু'একবার?"

"হ্যাঁ, আমাদের দু'জনেরই বন্ধু ছিল বিতান। এই ক্লাবেও এসেছে... তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল?"

সমুদ্র ক্লান্ত গলায় বলল।

"বিতানের আলোচনা থাক শুভময়... ওর মৃত্যুটা বড় আকস্মিক... এখনও ডিস্টার্বড আছি আমরা!" ঋজু গলায় বলল ঋষিকা। "ডিস্টার্বড থাকার কী আছে বলো তো? মালখোর লোকেরা এভাবেই মরে! ভণ্ড, ইরেসপন্সিবল... মেয়েবাজ... অতি বাজে লোক।"

"তুমি ভণ্ড নও? তুমিও চান্স পেলে মেয়েবাজি করবে! যাদের জোটে না, তারাই চরিত্রবান! ওর মতন লিখতে পারবে? ও ইরেসপন্সিবল হলে আমাদের কী? হি ওয়জ় আ পোয়েট। ওর লেখা নিয়ে কথা হতে পারে। লোকটাকে নিয়ে নয়! তুমি কি ওর একটা লেখাও পড়েছ? মনে হয় না!"

ঋষিকা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। বোধিরূপ এভাবে বিতানকে নিয়ে ঝগড়া করবে, সে আশা করেনি। সে জানত, বোধি বিতানকে পছন্দ করে না! শুভময় ভেবলু হাসি হাসল। তেমন রাগ করল না বোধিরূপের ওপর। হাতের গ্লাসটা তুলে ধরে বলে, "ইয়াপ বাডি... মি টু...ভণ্ড, ইর...ইর... আমরাও ওভাবেই মরব! ম্যাসিভ সেরিব্রাল অ্যাটাক! তখন মনে রেখো একদিন আমি... আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল বলে হাততালি পেয়েছিলাম!"

ঋষিকা হাই চাপল খুব কায়দা করে। তারপর সমুদ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, "ভীষণ খিদে পেয়েছে। তোমরা ডিনার করেছ?"

অঙ্গীরা একসময় খুব ভাল নাচত। তারপর 'ভাল' বিয়ে করে মোটা হয়ে এখন ফ্রাস্ট্রেশনে জেরবার। তার ধারণা তার বর অন্য মহিলায় আকৃষ্ট। যদিও অঙ্গীরার স্বামী নিজের উন্নতি আর ছেলের ক্রিকেট খেলা ছাড়া অন্য আর কোনও বিষয় নিয়ে ভাবে কি না সন্দেহ। অঙ্গীরা শব্দ করে হেসে বলল, "যাও সমুদ্র। স্টার ওয়াইফের জন্য খাবারের বন্দোবস্ত করো গে যাও।"

সমুদ্র নয়, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বোধিরূপ। ঋষিকার দিকে তাকিয়ে বলল, "আগে একটা ড্রিঙ্ক নাও। তারপর তো ডিনার।"

ঋষিকার অস্বস্তি হচ্ছিল। এক দঙ্গল রূপসীর সামনে এক রূপহীনাকে যদি অনেক পুরুষ মনোযোগ দিতে থাকে তাহলে ফল ভাল হয় না। সে শুধু রূপহীনাই নয়, ইদানীং স্বাধীন নারী হিসেবে তার যাপন এদের সবার থেকে অন্যরকম। তার ওপর টিভিতে কিঞ্চিৎ মুখ দেখা যায়। একসঙ্গে অনেক অপরাধের ছাপ্পা তার ওপর লেগে গেছে। ঋষিকা টক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। তারপর বোধির দিকে তাকিয়ে বলল, "না-না, আমি অলরেডি তিনটে খেয়ে আছি। খাবার চাই এখন। তুমি বোসো। আমি খাবারটা নিয়ে আসি।"

খাবার নিয়ে ঋষিকা ফিরল যখন, তখন জমায়েতে বিতানের কোনও রেশ নেই! পার্থ, খুশবন্ত, আবিরা, মল্লিকা ও বাকিরা, নিজেদের মধ্যে আলোচনায় ব্যস্ত। সমুদ্র আর বোধিরূপ এক কোণায় দাঁড়িয়ে ষড়যন্ত্রীর ভঙ্গিতে হাসতে-হাসতে কী সব কথা বলে নিচ্ছে! এত কী কথা ওদের? সারাদিন তো এক অফিসে কাটায়, তবু এত কথা? ঋষিকারই যেন কারও সঙ্গে কোনও কথা নেই! ফোন বের করে সে তার মেসেজ বক্স দেখতে শুরু করল। মেসেজ দেখল... ফের তাকাল সামনে পুলের দিকে। বোধি আর সমুদ্র হাসছে খুব। হাসতে-হাসতে বোধিরূপ সমুদ্রর শার্টের হাতা খামচে ধরেছে।

ঋষিকার খুব কান্না পেতে থাকে। সমুদ্রকে তার হিংসে হয়। এমন তীব্র বন্ধু তার তো একটাও নেই! কেন? শহরে এল তবু কারও সঙ্গেই সেভাবে সখ্য গড়ে উঠল না। শহর তাকে নিল না, নাকি সেই পারল না শহরকে আপন করতে। বিপন্ন মফস্সলি! জলপাইগুড়িতে শ্যাম্পুর সঙ্গে ছিল তার গভীর বন্ধুত্ব। তারপর শ্যাম্পুও কোথায় হারিয়ে গেল! কার কাছে যেন শুনেছিল ঋষিকা, সেই ফাঁকিবাজ, ফেলু মেয়ে নাকি পরে পড়াশোনায় খুব ভাল হয়েছিল। ঋষিকা কলকাতায় চলে আসার আগেই শ্যাম্পুরা বাড়ি বিক্রি করে শিলিগুড়ি চলে যায়। মামার বাড়ি। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে কারও কাছে ঋষিকা শুনেছিল শাম্পু ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছে...

হঠাৎ ঋষিকার চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল, হেমাঙ্গিনী নস্কর! বিতানের হেমা-ধরম! বিতানের শেষ আশ্রয় তার ছোটবেলার বন্ধু শ্যাম্পু নয়তো? আবার পর মুহূর্তেই মনে হল, যাঃ, তা কী করে হবে? সেই ছ্যাবলা, প্রেম কাঙালিনী, ইঞ্জিনিয়র হয়েছে যদিও বা মেনে নেওয়া যায়, সে হবে কমিউনিস্ট? ইস্তাম্বুলে গিয়ে করবে কৃষক সভা!

তাড়াতাড়ি ফোনে চিরদীপের নম্বর ডায়াল করল ঋষিকা। তিন-চারটে রিং হওয়ার পর চিরদীপ ফোন তুলল। কিন্তু নাঃ, শ্যাম্পু কোথাকার মেয়ে সে জানে-টানে না!

"কেমন দেখতে, এই হেমা-ধরমকে একটু বলবে? লম্বা?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, লম্বা-লম্বা।"

"কালো?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, কালো-কালো।"

"ঠোঁটের ওপর লাল আঁচিল?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, লাল আঁচিল-লাল আঁচিল।"

ঋষিকার কেমন সন্দেহ হল, চিরদীপ ঠিক ঠিক বলছে তো? কেমন একঘেয়ে সুরে, রিপিট করছে!

"অ্যাই চিরদীপ, তুমি কার কথা বলছ বল তো?"

"কার কথা বলছি? কার কথা বলছি?"

"ধ্যাত! তুমি কিচ্ছু শোনোনি আমার কথা! বলো তো কী বললাম?"

"রুনুর গার্লফ্রেন্ড তো? ওকে তো সেকেন্ড হুগলি ব্রিজে ধরেছে! ট্যাক্সির মধ্যে..."

ঋষিকা বিরক্ত মুখে ফোন কেটে দিল। নাঃ, অন্যকে প্রশ্ন করে লাভ নেই। সে নিজে যাবে বিতানের শেষ মিছিলে। জে-লোকে ফোন করলেই জানা যাবে, মিছিল কখন বেরবে। নিজেই যাচাই করে নেবে, এই হেমা তার শ্যাম্পু কিনা। ঋষিকা খুব অন্যমনস্ক হয়ে গেল। শ্যাম্পুকে নিয়ে একটু বেশি বেশিই ভাবতে থাকে সে। ভাবতে থাকে বলে খেয়াল করল না, তাদের জটলার থেকে তিন হাত দূরে এসে বসেছেন ধীরা আর আর-একজন পুরুষ। এই পুরুষের সঙ্গে ঋষিকার দেখা হয়েছে আগে, তবে আলাপ বা কথা হয়নি। এই পুরুষের নাম বিল্বমঙ্গল। এ বিশাখার

বন্ধু। বিতানের বাড়ি থেকে ফেরার সময় ওর সঙ্গে ঋষিকার দেখা হয়, রাস্তায়... খুব উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে সে বিতানের সঙ্গে শেষ দেখা করতে ছুটেছিল...

তবে তার আলোচনা পরে। তার আগে দেখতে হবে, কে এই ধীরা?

ধীরাকে জানতে হলেও বছর কয়েক পিছিয়ে যেতে হবে। পৌঁছতে হবে রাকার আশীর্বাদের দিনে। রাকা ঋষিকার একমাত্র ননদ। বলাই বাহুল্য, সুন্দরী ও বর্তমানে বড়লোক বাড়ির বউ। আর সেই কারণেই তার বিশ্বাস, তার কিছু না-করলেও চলে।

সে সকালে ঘুম থেকে উঠে দু'-তিনজন কাজের লোককে ধমক-ধামক দেয়, খুঁটিয়ে কাগজ দেখে বের করে কোথায় কোথায় 'সেল'-এ ভাল জিনিস পাওয়া যাচ্ছে, তারপর বর বেরিয়ে গেলে বাড়ির গাড়ি নিয়ে শাশুড়ির সঙ্গে বাজার করতে বেরয়। রাকার বরের নাম জনার্দন, তাকে সবাই আদর করে জনি বলে ডাকে। তবে রাকার বর্তমান মেদবহুল জীবন নয়, আমরা ফিরে যাচ্ছি ওর আশীর্বাদের দিন... রাকাকে সাজিয়ে দিয়েছে ঋষিকারই পরিচিত এক মেক-আপ আর্টিস্ট। রাকা সবুজ তসর আর হিরের গয়না পরে একেবারে নেকু-পুসু-মুনু হয়ে বউদির পায়ে-পায়ে ঘুরছে। ঋষিকা তার ছিরিছাঁদ-হীন চুলটা একবার হাতখোঁপা করছে, একবার হর্সটেল, একবার টপনট। অন্যান্য সব বিষয়ের মতন এই তুচ্ছ বিষয়েও সে দোনামোনায়। সমুদ্র ডিজ়াইনার পাঞ্জাবি আর ধুতি পরে টানা মেসেজিং করে যাচ্ছে কারও সঙ্গে। হাসছে আর ঋষিকাকে মাঝেমাঝে আওয়াজ মারছে। আনন্দী অর্থাৎ, রাকার মাতা দারুণ সুন্দর একখানা সাদা বেনারসি পরে ভুরু প্লাক করতে বসে গলদঘর্ম। ঋষিকার শ্বশুরমশাই, কন্যে-কর্তা, তাঁর বাঁ নাকের ফুটোর থেকে বেরিয়ে থাকা একখানা পাকা চুল খুব সাবধানে গোঁফ কাটার কাঁচি দিয়ে কেটে নিচ্ছেন। মিনতি তার নখে গোলাপি 'লেলপালিশ' মেখে লজ্জা-লজ্জা মুখে ডাইনিং টেবলে প্লেট মুছে-মুছে রাখছে...অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে ঠিক যেমন যেমন হয়ে থাকে, ঠিক তেমনটাই!

সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ কুটুমরা এসে পড়লেন মোট চারখানা গাড়ি চেপে। সবাইকে চিনলেও, জনির বাবার সঙ্গে আসা এক অচেনা মহিলাকে ঋষিকা চিনতে পারল না। অসম্ভব ব্যক্তিত্বময়ী ও সুন্দরী সেই ভদ্রমহিলা উপস্থিত সবার থেকে যে আলাদা, তা যেন কীভাবে বোঝা যাচ্ছিল। মাইক্রোওয়েভে চিকেন টিক্কা গরম করছিলেন ঋষিকার শাশুড়ি আনন্দী।

ঋষিকা গিয়ে তাঁকেই ধরল,

"মেসোমশাইয়ের সঙ্গে একজন ভদ্রমহিলা এলেন, সাদা শাড়ি পরে, উনি কে? রাকার শাশুড়ির বোন?"

আনন্দী চিকেন টিক্কার পাশে স্যালাড সাজাতে-সাজাতে মুখ বেঁকিয়ে বললেন, "বোন না হাতি! লোকটার কোনও কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকে। আজকেও নিয়ে এসেছে রক্ষিতাটাকে। তুমি শোনোনি কিছু? বাবান বলেনি?"

বাবান অর্থাৎ সমুদ্র এসেছিল ফ্রিজ় থেকে কোল্ড ড্রিঙ্কের বোতল বের করতে। সে সহাস্যে বলল, "কে কাকে রাখে মা? ভদ্রমহিলা গত মাসে রিস্কাম টি-এর জেনারেল ম্যানেজার হয়েছেন। রক্ষিতা-টক্ষিতা বোলো না প্লিজ়। এটা কি নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি নাকি?"

আনন্দী ঝামড়ে উঠে বললেন, "আমাকে ওসব সেঞ্চুরি-ফেঞ্চুরি দেখাবি না। বিয়ে হয়নি, রক্ষিতা ছাড়া কী? আর মহিলাও বাবা বলিহারি! তোকে বলল আর তুই চলে এলি? শুভ কাজে এসব বেলেল্লাপনা! রাগে আমার গা রি-রি করছে। আমি কিন্তু ওর সঙ্গে দাঁত বের করে হেঁ-হেঁ করতে পারব না বলে দিলুম।"

সমুদ্র মাথা চুলকে বলল, "রাকার জন্য ভদ্রমহিলা ডায়মন্ড নেকলেস এনেছেন, তোমাকে ডাকছেন ডিজ়াইনটা দেখাবেন বলে... দেখো কী করবে। আর মেসোমশাই মিঠুকে ডাকছেন। ভদ্রমহিলার সঙ্গে মিঠুর আলাপ করাবেন... ওকে নিয়ে যাই ভেতরে? তোমার অসুবিধে হবে না তো?"

আনন্দী কোনও উত্তর দিলেন না। চিকেন টিক্কার ট্রে-টা পুত্রবধূর হাতে দিয়ে রান্নাঘরে চলে গেলেন। এ-বাড়ি, ও-বাড়ি মিলিয়ে জনাকুড়ি লোক। সমুদ্রর অফিসের গেস্ট হাউসের কুকের কেটারিং। তারা সকালবেলা খাবার ডেলিভারি দিয়ে চলে গিয়েছে। গরম-টরম করে অতিথির মুখের সামনে ধরার কাজটা বাড়ির লোকেদের। দু'টো ট্রে নিয়ে ঋষিকা ড্রয়িংরুমে ঢুকে দেখল, জনির বাবা শিবদাসবাবু আর তার শ্বশুর হাঁ করে টেনিস দেখছেন টিভি'তে। বাকিরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আড্ডায় মশগুল। জনি আর রাকা চোখে চোখে খুনসুটি করছে। আর সেই ভদ্রমহিলা সবার থেকে আলাদা হয়ে একটা চেয়ারে কাঠের মতো ঋজু ভঙ্গিতে বসে আছেন। মুখে অদ্ভুত প্রশান্তির আলো। না, প্রশান্তি ঠিক নয়। প্রসন্নতার আভা বলা যায়। বা আরও সোজা বা সঠিক হবে বলা, ভদ্রমহিলার মুখে কোনও তেতো ভাব নেই।

ঋষিকা ঢুকতেই শিবদাসবাবু হইহই করে উঠলেন, "অ্যাই তো এসে গেছে। এই দেখো ধীরা, এর কথাই বলছিলাম তোমায়। আমার ফেভারিট ডটার ইন ল ঋষিকা। তোমার সঙ্গে আমার বান্ধবীর আলাপ নেই। ও ধীরা। আর এ হল ঋষিকা। আমাদের সমুদ্রর গুণী বউ। ও একজন লেখক। অভিনেত্রীও। একই অঙ্গে অনেক রূপ।"

ঋষিকা দারুণ অবাক হয়ে গিয়েছিল। শিবদাসবাবুর বান্ধবী? মানে গার্লফ্রেন্ড! সামাজিক অনুষ্ঠানে তাকে নিয়ে এসেছেন! ভদ্রলোকের এলেম আছে তো!

"আর শোনো, এই যে লাজুক মুখে বসে আছে ধীরা... একে এলেবেলে ভেবো না কিন্তু, এ খুব বড় চাকরি করে। তাছাড়া খুব ভাল রুটিও করতে পারে। নরম-সরম, ফুলকো-ফুলকো! তুলনা নেই-তুলনা নেই।"

কথাটা বলে শিবদাসবাবু ঘর কাঁপিয়ে হাসলেন। ধীরার মুখে হাল্‌কা লজ্জার আভা খেলে গেল। ঘরে উপস্থিত অন্যরা একটি কথাও বলল না। ঋষিকা বুঝতে পারল না উনি কিসের তুলনা নেই বলতে চাইলেন। ধীরার, না ধীরার তৈরি রুটির? ঘরের মধ্যে তখন ঘোর অতিথিপরায়ণতা! ঋষিকা আড়চোখে দেখল রাকার হবু শাশুড়ি তাঁর বড় জায়ের ওপর জোরাজুরি করছেন চিকেন টিক্কা নেওয়ার জন্য।

সমুদ্র কোল্ড ড্রিঙ্কের ট্রে হাতে ঘরের এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো... রাকা লবস্টারের

কথাটা বলে শিবদাসবাবু ঘর কাঁপিয়ে হাসলেন। ধীরার মুখে হাল্‌কা লজ্জার আভা খেলে গেল।

টুকরো ফর্কে গেঁথে মুখে তুলছে। লিপস্টিক লাগানোর ভঙ্গি তার... আনন্দী তাঁর কলেজের বান্ধবীর দলের সঙ্গে মাথা ঝুঁকিয়ে হেসে-হেসে কিছু বলছেন... মধুমিতা চোখ বড় বড় করে বক্তব্য রাখছে... পারিবারিক সুষমায় কোথাও কোনও ঘাটতি নেই। সব স্বাভাবিক। যেমন হওয়ার কথা, তেমনই। ঋষিকা সমুদ্রর হাত থেকে একটা কোল্ড ড্রিঙ্কের গ্লাস নিল। সমুদ্র কানে-কানে তাকে বলল, "এক পেগ রাম মিশিয়ে দেব? খাবে?"

ঋষিকা দু'দিকে ঘাড় নাড়ল। বাক্‌রহিত সে। মুখে ভ্যাবলা ভাব। সমুদ্র ভ্রু তুলে মাথা চুলকে, দুষ্টু প্রেমিকের ভঙ্গিতে বলল, "আজ পরিস্থিতি এমনটাই দাবি করছে কিন্তু। ভেবে দ্যাখো! নেশায় অন্তর্দৃষ্টি ভাল খোলে। তোমার ভ্যাবলাভাব কেটে যাবে। একে তো হাতখোপা, তার ওপর এমন ঢোঁক গিলছ... শেক ইট আপ বেবি... বলো, মাইকেল ডাট কি জয়!"

সমুদ্রর এই সব আনসান কথায় ঋষিকার মনে একটু বল এল। সে ঠোঁটের ওপর আত্মবিশ্বাসহীন হাত চালিয়ে বলল, "আমি এমন কাণ্ড জীবনে দেখিনি। অ্যাই, চুলটা খুলে ফেলব? বাজে দেখাচ্ছে?"

"নারে বাবা। এই ঘরে তুমিই বেস্ট। এই মোবাইল ছুঁয়ে দিব্যি দিলুম।"

ঋষিকা হেসে ফেলল। বলল, "এত পাজি কেন তুমি? এই ধীরার কথা আগে জানতে? আমায় বলোনি তো! মহিলা কিন্তু দুরন্ত। একদম ভ্যাম্প মনে হচ্ছে না।"

"ওসব সেভেন্টিঙ্কে হত। বিবাহিত লোকের গার্লফ্রেন্ড মানেই চালাক-চালাক কথা বলে, মদ খেয়ে মাতাল হয় না বা সিগারেটের ধোঁয়ায় রিং ছাড়ে। বাঙালি কি আর এক আছে রে পাগল! শি ইজ রিয়েল কুল। ওই কুলাঙ্গারটার প্রেমে কেন পড়েছে তা অবশ্য বলতে পারব না!"

"কুলাঙ্গার? কে? শিবদাসকাকা?"

"কাকা? ও আমার বাপের থেকে ঢের বড়। কাকা-ফাকা নয়। শালা... শি ইজ আ কর্পোরেট বিগউইগ! কয়েক লাখ টাকা মাইনে পায়। শিবদাসকেই রাখতে পারে, এমন কোমরের জোর!"

"তোমার খুব রাগ না? সব পুরুষগুলোই সেন্সুয়াল জেলাসিতে ভোগে। অবশ্য এই মহিলা জব্বর। হ্যাঁ গো, তুমি জানতে এঁর কথা?"

"হুঁ, জানতাম। অনেকেই জানে। রাকাও তো জানে। অবশ্য সবাই ভাব করে যেন ঘটনাটা ঘটছে না। যতই তরাজি করুক, মধ্যবিত্তর ন্যাকামি তো আর ঝেড়ে ফেলতে পারে না। লোকটাকে এই একটা কারণেই আমার পছন্দ। তথাকথিত শিক্ষিত, প্রগতিশীল বাঙালির মাথায় লোকটা একখানা জব্বর হাতুড়ি।"

"তুমি কারও প্রেমে পড়লে, এভাবেই আমার নাকের ডগায় তাকে নিয়ে ঘুরবে? মধ্যবিত্তর ভণ্ডামি নেই তোমার মধ্যে, প্রমাণ করতে?"

সমুদ্র থমকে গেল। অল্প হেসে বলল, "না আমি কোনও লন্ডভন্ডয় বিশ্বাস করি না। তাছাড়া..."

ঋষিকা উৎসুক হয়ে বলল, "তাছাড়া?"

বউকে বেশ খানিক হতাশ করে সমুদ্র বলল, "আমি তোমায় কষ্ট দিতে পারব না মিঠু। তার থেকেও বড় কথা, তুমি এতটা অসম্মান মেনে নিয়ে আমার এবং আমার প্রেমিকার সামনে বসে বসে ফিশ ওরলি

ঋষিকা মন্ত্রমুগ্ধের মতো ধীরার দিকে এগিয়ে গেল। শাশুড়িকে চটানোর রিস্ক নিয়েই!

খাবে না তারিয়ে-তারিয়ে..."

ঋষিকার মনটা মেঘলা হয়ে গেল। সমুদ্র তো কই ভালবাসার কথা বলল না! নাকি যা সব বলল, আদতে সে সব ভালবাসারই কথা? আবার দোনামনা। আবার ঠোঁটচাটা। আবার হাতখোঁপায় হাত, ঋষিকা আড়চোখে দেখল শিবদাসবাবুর স্ত্রী সত্যিই একখানা মাছের টুকরো মুখে চালান করছেন চকচকে মুখে।

সমুদ্র আচমকা ঋষিকার হাতখোঁপাটা খুলে দিল। একরাশ চুল ঝামড়ে পড়ে ঋষিকার মুখে। চুলগুলো ঋষিকার কানের পিছনে সরিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি নিশ্চয়ই বুঝে উঠতে পারছ না, ওঁদের এ খুল্লামখুল্লা আচরণের কী নাম দেবে! ভাবো... ভেবে-ভেবে আরও ঢোঁক গেলো... আমি আসছি একটু পরে..."

ঋষিকা বলল, "এনাদের দু'জনের কারও মধ্যে ব্যভিচারীর চোর-চোর ভাব নেই তো!"

"তা থাকবে কেন? চুরির দায়ে তো তুমি ধরা পড়েছ মনে হচ্ছে!"

কথাটা বলে ঋষিকাকে অকূল-পাথারে ভাসিয়ে দিয়ে সমুদ্র কেটে পড়ল। আর ঋষিকা ঘেমেটেমে অস্থির হতে থাকল। বাকিরা কিন্তু একেবারেই স্বাভাবিক। শিবদাসবাবু যথার্থ পুরুষ-সিংহের ন্যায় গডিগাডি করে ফ্রান্সের প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের ওপর লেকচার দিচ্ছেন। ঋষিকার শ্বশুরমশাই মাঝে-মাঝে মাথা নেড়ে কিছু বলছেন। জনির মা, একদম স্বাভাবিক ভঙ্গিতে রাকার সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলছেন, মোটেও নির্যাতিতা নারীর চিহ্ন নেই ওঁর হাবভাবে... আর ধীরা?

নাঃ, শিবদাসের সংসার ছারখার করতে ছলাকলায় মজিয়েছে বুড়ো শিবদাসকে, এমন কথা তাকে দেখে কেউ বলবে না! ঋষিকা বিস্মিত। হতবাকও বলা যায়। তবে তার প্রধান কাজ, নিজের মুখ নির্লিপ্ত রাখা। দেহভঙ্গিতে তাকে বুঝিয়ে দিতেই হবে, অন্য সবার মতোই সেও একেবারেই চমকায়নি ধীরাকে দেখে। সে মোটেও আর মফস্সলি নেই।

সে এখন আইডেনটিটির অন্বেষণে বেরিয়েছে না? আঁট হয়ে বসা শিকড় উপড়োতে হবে, তবে না ব্যক্তিত্ব আসবে! লোকে তাকে সমুদ্রর উপযুক্ত বউ মানবে! সমুদ্রর ওপর তার ভীষণ অভিমান দেখা দিল হঠাৎ করে। সমুদ্র তাকে বলেনি কেন? কেন চেপে গিয়েছে? রাতে সমুদ্রকে চেপে না ধরা পর্যন্ত তার শান্তি নেই, এ বেশ বুঝতে পারছিল সে...

দক্ষ শিকারি যেমন দূর থেকে নজরে রাখে অসতর্ক শিকার, ঠিক সেই ভঙ্গিতে ঋষিকা চোখের ফ্রেমে ধরে রাখল ধীরা, শিবদাস ও শিবদাসের স্ত্রী নিয়ে তৈরি ত্রিভুজটিকে। ধীরা নামক ভদ্রমহিলার কাঁচা-পাকা চুল দারুণ স্টাইল করে কাটা। চওড়া সবুজ পেড়ে বুটিক স্টাইল টাঙাইল আর সবুজ লম্বা হাতা ব্লাউজে এই সমাবেশে এমনিতেই তিনি সবচেয়ে আকর্ষক। ঋষিকা প্রায় মন্ত্রমুগ্ধের মতো ধীরার দিকে এগিয়ে গেল। শাশুড়িকে চটানোর রিস্ক নিয়েই! ধীরার সামনে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। প্রায় মৃত মানুষের হাসি তার মুখে। বলল, "গুণী-টুনি কিচ্ছু নই। আমি খুব অর্ডিনারি।"

ভদ্রমহিলা হাসলেন। বললেন, "নিজেকে অর্ডিনারি ভাবতে পারা সহজ কথা নয়।

আমি শুনেছি, টিভি খুললেই তোমায় দেখা যায়!"
ঋষিকা হাঁ-হাঁ করে বলল, "আরে, ওসব আপনাদের জন্য নয়। ওসব মাথাহীন ব্যাপার-স্যাপার।"
ধীরা ভ্রু কুঁচকে বললেন, "মাথাহীন? তোমায় কে বলেছে এ কথা? মাথাহীন বলে কোনও কিছুই হয় না, ঋষিকা! যারা ওসব বলে তারা নিজেরাই মাথাহীন। শুধু শুধু নিজের কাজটাকে ছোট কোরো না। আমি তো একটা চায়ের ব্যবসা চালাই। চা খেতে তো আর মাথা লাগে না! তাহলে আমার কাজটাও মাথাহীনের কাজ? আমি বেচি চা, তুমি বেচো এন্টারটেনমেন্ট... দু'টোই মাথার কাজ, বুঝেছ মেয়ে?"
খাওয়া-দাওয়ার পর আশীর্বাদ। একে-একে সবাই ধান, দুর্বা, সোনার গয়নায় রিচুয়াল সারার পর ধীরা এগিয়ে গেলেন রাকার কাছে। ওর হাতে একটা বাক্স ধরিয়ে বললেন, "এটা বউভাতের রাত্তিরের জন্য। তোমার কাতান বেনারসির সঙ্গে ম্যাচ করবে।"
রাকার মুখের হাসি একেবারে ফ্রিজ় শট হয়ে আছে। সে বাক্সটা কাঁপা-কাঁপা হাতে খুলতেই বেরিয়ে পরল হিরের নেকলেস। এটার কথাই তখন সমুদ্র বলেছিল। ঋষিকা দেখল জনির মায়ের একেবারে সাড়ে বত্রিশভাজা চেবানোর দশা! সব দাঁত এলিয়ে পড়েছে।
হিরের নেকলেস অনেক কিছু কিনে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে! মরালিটিও!
নেকলেস পরানো শেষ হলে ধীরা বের করলেন একটা খাম। লজ্জা-লজ্জা কণ্ঠে বললেন, "আর এটা বউভাতের পরের দিনের উপহার। অল দ্য বেস্ট রাকা। অল মাই উইশেজ় টু ইউ অ্যান্ড জনি!"
রাকা টালুমালু হয়ে ধীরাকে পেন্নাম ঠুকল। ধীরা ওর চিবুক ছুঁয়ে আদর করলেন। বললেন, "সুখী হও মা।"
শিবদাসবাবু দাপুটে গলায় বললেন, "দ্যাটস ধীরা। অ্যান্ড হার স্টাইল। ওই খামে তোদের জন্য চিয়াংমাইয়ের একটা রিসর্টের বুকিং স্লিপ... রিসর্টটা ইজ় বাই দ্য রিভার কোয়াই! ইজ় নট দ্যাট আ ফ্যাবিউলাস আইডিয়া?"
কেউ তেমন কোনও কথা বলল না। রাকা মিনমিন করল, "থ্যাঙ্ক ইউ আন্টি।"
আর শিবদাসবাবুর ছোট শ্যালক, জনির মামা বলল, "রিভার কোয়াই? 'দ্য ব্রিজ অন দ্য রিভার কোয়াই'-এর সেই কোয়াই নাকি?"
শিবদাসবাবু ছেলেমানুষের মতো উত্তেজিত হয়ে বললেন, "আলবাত! ধীরা তো এত দিন তাইল্যান্ডেই পোস্টেড ছিল। আমার অবশ্যি ওই দিকটা যাওয়া হয়নি... শুনেছি বেড়ে জায়গা!"
ঋষিকার চোখে পলক পড়ছিল না। যতই টাকাপয়সা থাক, পরিবারটি ভাবনায়, বিশ্বাসে মধ্যবিত্ত বই কিছুই না। এমন খোলামেলাভাবে অবৈধ প্রেমিকাকে মেলে ধরতে সাহস লাগে। লাগে দম। লম্বা, ফরসা ও সুদর্শন শিবদাসের তার বান্ধবীকে নিয়ে কুণ্ঠাহীনতা ঋষিকাকে আশ্চর্য করে দিচ্ছিল।
এখানে যারা উপস্থিত আছে, তারা কেউ ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখছে না এবং ধীরার প্রতি একেবারে কাঠের মতো শুকনো হয়ে আছে। অথচ ধীরার তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা আছে বলে ঋষিকার মনে হল না। আর শিবদাসবাবু তো ভাব করছেন, তিনি ধীরাকে নিয়ে হানিমুনে এসেছেন!
কোল্ড ড্রিঙ্ক খেতে বারণ করলেন, ধীরার নাকি ঠান্ডা লেগেছে... চকোলেট মুসের তারিফ করে বললেন, ধীরা নাকি এটাও

দারুণ বানায়। আবার নিজের গিন্নির কানে-কানে ফিসফিস করেও কী সব বলে এলেন এক ফাঁকে গিয়ে! ভদ্রলোকের তো হেবি এলেম। দু'জনকেই সামলাচ্ছেন উদার ভঙ্গিতে!

লোকটা কি একটু ক্রুড? ঋষিকার হাত নিশপিশ করছিল। তার সিরিয়ালের গপ্পে এই সব দিলে বাঙালি খাবে! এসি ঘরে বসেও হাল্কা ঘামছিল সে। বাঁহাতে কপালের ঘাম মুছে দেখল, রাকার শাশুড়ি মাথা নাড়িয়ে-নাড়িয়ে মুখে হাসি নিয়ে রাকাকে দেওয়া গয়নার ডিজাইন দেখছেন। চিকেন ট্রে থেকে ফোর্কে গেঁথে এক পিস মুখে চালান করলেন। তারপর চকোলেট মুসে খাবেন না বলে হাত নাড়তে লাগলেন।

এই কি নির্যাতিতা নারীর হাবভাব? চলনে-বলনে, কথনে ইনি তো যথার্থ ছেলের মা। সেদিন রাতে সমুদ্রের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলে তার মন ভরেনি। সমুদ্রর সব উত্তর ঋষিকার বড্ড ভাসা-ভাসা, এড়িয়ে যাওয়া ধরনের মনে হয়েছিল। ধীরা বিষয়ে সে যেন কিছুই বলতে চাইল না ঋষিকাকে। "এত দিন বলোনি কেন?" প্রশ্ন করেছিল ঋষিকা।

হাই তুলে সমুদ্র বলেছিল, "মনেই ছিল না! বোনের শ্বশুর কার সঙ্গে প্রেম করে, এটা একটা জরুরি বিষয় হল?"

এর মাসখানেক পর রাকার বিয়ের দিনেও ধীরা ছিলেন তাঁর নিজস্বতা নিয়ে। শিবদাসবাবুর স্ত্রী, অর্থাৎ রাকার শাশুড়ি আসেননি বরপক্ষের সঙ্গে। সেটাই নিয়ম। হিন্দু বাড়িতে ছেলের বিয়ে দেখার অধিকার নেই মায়ের। ধীরা আর শিবদাস বিয়েবাড়িতে বিরাজ করছিলেন স্বাভাবিক, প্রৌঢ় স্বামী-স্ত্রীর মতোই।

যাঁরা নিমন্ত্রিত, তাঁরাও শিবদাসবাবুর সঙ্গে হেসে-হেসে কুশল বিনিময় করছেন, নির্বিকার মুখে ফিশফ্রাই চেয়ে খাচ্ছেন, বা চিকেন ইন হোয়াইট সসের কাইয়ের সঙ্গে জমিয়ে মাখছেন জিনজার-পাইনঅ্যাপেল রাইস। এত উদারতা ঋষিকাকে বিরক্ত করছিল খুব। কেসটা কী, কেসটা কী ভেবে-ভেবেই সে অস্থির হচ্ছিল। সমুদ্র কিন্তু বেশ স্বাভাবিক।

রাতে শুয়ে ঋষিকার একঘেয়ে টানা প্রশ্নে যেন একটু বিরক্তই হল। বলল, "অসুবিধে কী? কারও তো ক্ষতি হচ্ছে না মিঠু! তুমিই একা ভেবে মরছ! জনির মা তো মেনেই নিয়েছেন। এই কারণে স্বামীকে ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবেননি কোনও দিন!"

ঋষিকা ধন্দে পড়ে গেল। সত্যিই তো! জনির মা ছেড়ে চলে যাননি কেন? তাঁর মন খুব প্রসারিত বলে? তাঁর কোনও উপায় ছিল না তা তো নয়! শিবদাসবাবুকে ছেড়ে চলে গেলে অন্তত খাওয়া-পরার অভাব হত না। জনির মামার বাড়ি বিরাট ব্যবসায়ী পরিবার। জনির মায়ের সে ব্যবসায় ভাগ আছে। জনির মামারা তাদের একমাত্র দিদি, মানে জনির মাকে শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে।

এ কি নেহাত বিয়ে না ভাঙার সংস্কার? ডিভোর্সি মহিলাকে সাধারণ মানুষ সহজভাবে কোথাও গ্রহণ করে না। সেটাই কারণ? কিন্তু এই অবস্থানে ওঁর সম্মানহানি হয় না? ঋষিকা এও খেয়াল করছিল, শিবদাসবাবুর দুই শ্যালক, তাদের স্ত্রীরাও শিবদাসবাবুকে বিশেষ মান্য করে। অর্থাৎ, তারাও তাদের জামাইবাবুকে ধীরার কারণে ত্রাতা করেনি।

টাকা? টাকার স্বার্থ?

হ্যাঁ, আছে বটে শিবদাসের টাকা ও কানেকশানের জোর। সে সবের সুযোগ কাজে লাগে শিবদাসের শ্বশুরবাড়ির লোকজনের। মধ্যবিত্তের যে কত রকম হিসেব থাকে!

সময়ে-সময়ে সে প্রাচীন প্রথা আঁকড়ে থাকার অছিলায় রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে রাজি। আবার কখনও সে এতই মুক্তমনা ও উদার যে চেনা মানুষের চোখ কপালে উঠে যায়। মধ্যবিত্তের মতো রাজনীতিক আছে নাকি আর কোন শ্রেণি? তবে, পুরোটাই হয়তো স্বার্থের অঙ্ক বা সূক্ষ্ম হিসেব নিকেশ নয়।

শিবদাসবাবুর চরিত্রে উষ্ণতাও আছে কিছু বেশি মাত্রাতেই। লোকটা ক্ল্যানিশ এবং ফিউডাল। এছাড়াও কিছু ম্যাজিক জানে। বিয়ের সন্ধেতে শিবদাসবাবুর পাশে অন্য সব 'নর্মাল' মানুষজনকে ঋষিকার বেশ ম্রিয়মাণ আর এলেবেলে লাগছিল। সামন্ততান্ত্রিকতার দাপ কথাটা শিবদাসের ক্ষেত্রে খাটে খুব। শিবদাসবাবু অন্যায় করছেন কি না, ঋষিকা একবাক্যে বুঝে উঠতে পারেনি।

আর ধীরা? সে কী পায়, শিবদাসের কাছে? কলকাতার সেরা ইনস্টিটিউট থেকে ম্যানেজমেন্ট পাশ করা এই উচ্চশিক্ষিতা শিবদাসের উপপত্নী হয়ে থাকেন কেন? টাকার লোভে যে নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে? ঋষিকা অনেক ভাবল-টাবল ব্যাপারটা নিয়ে। কোনও থই পেল না। সে বুঝে উঠতে পারল না তাকে কোন বিষয়টা বেশি বিচলিত করছে? ধীরা নামক হাই প্রোফাইল কর্পোরেটের প্রসন্নতা? রাকার শাশুড়িমায়ের নির্লিপ্তি, না শিবদাসবাবুর সব-চলতা হ্যায় অ্যাটিটিউড? তার নিজের শাশুড়ি, যিনি কি না আড়ালে শিবদাসবাবুকে কাণ্ডজ্ঞানহীন, মহিলাদোষে দুষ্ট পুরুষ বলে চিহ্নিত করেন, তিনিই কেন শিবদাসবাবুর খাওয়ার তদারকি করেন হেসে-হেসে? ধীরার হাত জড়িয়ে ধরে তাঁর এত কী কথা? সমুদ্র যতই বলুক, মধ্যবিত্তর ভড়ংবাজির উপর নিটোল কশাঘাত, ঋষিকা নিজেও কি মধ্যবিত্ত নয়? তার অস্বস্তি হওয়াও স্বাভাবিক। তবে সে এটা বোঝে, তার ভাবনা গলদপূর্ণ। সে যেন ধরেই নিয়েছে পুরুষের জীবনে দ্বিতীয় রমণী বা অবৈধ স্ত্রীর প্রসঙ্গ থাকতে নেই! এমন তো হতেই পারে ধীরা নিজেকে মনে মনে এসব কিছুই ভাবেন না। তিনি অর্থনৈতিকভাবে শিবদাসবাবুর ওপর নির্ভর নন। শিবদাসবাবুর পদবির প্রয়োজন হয় না নিজের সন্তান মানুষ করার জন্য। হয়তো সে জন্যই তিনি নির্ভার ও মুক্ত মানবী হয়ে শিবদাসবাবুর ঘর করেন। এই প্রসন্নতা তাঁর দর্শনের বহিঃপ্রকাশ। অন্য দিকে রাকার শাশুড়িমায়ের অস্তিত্বই তাঁর বিবাহকে কেন্দ্র করে।

বেঁচে থাকার জন্য তাঁর যা-যা প্রয়োজন, তার সবটাই বকলমে শিবদাসবাবুই জোগান। পারিবারিক নাম, টাকা, ব্যাঙ্কের লকারে উত্তরাধিকারের ভ্যাপসা গন্ধমাখা সোনার গয়না... এমনকী নিজেকে বেচারা ও মহান ভাবার সুযোগও। সমাজের চোখে তিনি স্ত্রী। সতী নারী। স্বামী নির্যাতিতা। আর ধীরা কুলটা নারী। শিবদাসবাবুর সমান রোজগার করলেও পুরুষের লাম্পট্যের অসহায় শিকার ও রক্ষিতা! শিবদাসবাবুর নাম করে সিঁদুর পরার অধিকার আছে রাকার শাশুড়িমায়েরই। ধীরার নেই! মনে-মনে ক'জন মেয়ে সিঁদুরের আবেগ উপেক্ষা করার ক্ষমতা রাখে?

ওঁর জীবন আর ধীরার জীবন সম্পূর্ণ আলাদা। জীবনের থেকে চাহিদাও দু'জনের তুলনীয় নয়। সে জন্য হয়তো মহিলা দাঁড়িপাল্লায় শিবদাস আর নিউ আলিপুরের উচ্চ মধ্যবিত্তের জীবন ওজন করে দেখে নিয়ে বুঝে গিয়েছেন, তিনি তেমন ঠকছেন না। আর শিবদাসবাবু পোড়খাওয়া, সফল পুরুষ। তিনিও কি আর বোঝেন না কোন নারী তাঁর থেকে কী কী চায়?

"কেমন আছ ঋষিকা? অনেক দিন বাদে দেখছি তোমায়," ধীরা উঠে এসেছেন ঋষিকার কাছে। একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ঋষিকার দিকে, ঋষিকা প্রথম কয়েক সেকেন্ড যেন ধীরাকে চিনতেই পারল না।

"কী হল? আমি ধীরা..."

"ওঃ, হ্যাঁ...অবশ্যই...আমি এত অন্যমনস্ক ছিলাম... আপনি... আপনি কেমন আছেন? মেসোমশাই ভাল আছেন?'

"হ্যাঁ, তা আছেন...যত বুড়ো হচ্ছেন তত

লোভ বাড়ছে। আদারওয়াইজ় ভালই আছেন। সমুদ্র কই? তাকে দেখছি না?"
"ওই তো...দাঁড়ান ডাকছি। আপনি একা? মেসোমশাই আসেননি?"
"নাঃ, ও বাড়িতে থাকবে বলল। না আমি একা নই... আমার সঙ্গে..." ধীরার আহ্বানের অপেক্ষা না করে উঠে এল বিল্বমঙ্গল। ঋষিকার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "হাই। আমার নাম বিল্বমঙ্গল। হ্যাভ উই মেট বিফোর?"
ঋষিকা চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর হাসিমুখে বলল, "নিশ্চয়ই... গতকাল, তুমি বিশাখার বন্ধু..."
"হ্যাঁ, হ্যাঁ..."
"ও মা! বিশাখা তোমার বন্ধু নাকি? বিশাখা তো আমার বোনঝি! দেখেছ! দ্য ওয়র্ল্ড ইজ় রিয়েলি স্মল!" ধীরা হাসিমুখে বলেন।
বিল্ব বলল, "বিতানটা চলে গেল, মনটা খুব ভেঙে গিয়েছিল। আমরা অফিসে বসে মদ্যপান করছিলাম। বিতানের কবিতা পড়তে-পড়তে কী মনে হল, আমরা বেরিয়ে পড়লাম আমার জিপটা নিয়ে। পুলিশ ধরেছিল আমাদের বাইপাসের ধারে। বলল, এত রাতে কেন ঘুরে বেড়াচ্ছেন? বিশাখাকে তো জানো তোমরা। বেহেড হয়ে গেলে কী-কী করতে পারে! বলল, 'ডায়াবিটিস আছে দাদা, একটা ক্লিনিক খুঁজছি যেখানে ফ্রিতে সুগার টেস্ট করে দেয়... দাদা, টাকা পয়সার খুব টানাটানি... সুগার টেস্ট করে দেবে বিনিপয়সায়, এমন কাউকে চেনেন?' ভাবো! পুলিশকে এসব প্রশ্ন করছে!"
ঋষিকা হাসল। সারা সন্ধের গ্লানি যেন উধাও হয়ে গেল। বলল, "সত্যি মেয়েটা একরকম পাগলই রয়ে গেল!"
বিল্বমঙ্গল ইতিউতি তাকিয়ে বলল, "তুমি একা এসেছ? না সঙ্গে কেউ আছে?"
"নাঃ, একা নই, দাঁড়াও, আমার বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই... অ্যাই সমুদ্র..."
ঋষিকা গলা তুলে সমুদ্রকে ডাকল। কিন্তু সমুদ্রকে ধারে কাছে দেখতে পেল না সে। দেখে বোধিরূপ এগিয়ে আসছে তাদের দিকে।
"সমুদ্র কী করছে?"
"ওর ওভারসিজ় ক্লায়েন্ট ফোন করেছে। একটু ব্যস্ত হয়ে রয়েছে... বলো..."
"না-না, তেমন কিছু নয়... ও বিল্বমঙ্গল... ওর সঙ্গে আলাপ করাতাম... বাই দ্য ওয়ে, ও আমাদের বন্ধু, ওর নাম বোধিরূপ।" ঋষিকা স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করায় বিব্রত। কিন্তু তার কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। সমুদ্রটা গেল কোথায়? ফোন করতে লুকিয়ে পরার কী কারণ থাকতে পারে? এর আগেও তো অনেকবার ফোনে কথা বলল, তখন এমন অলক্ষ্যে চলে যায়নি তো! বোধিরূপের সঙ্গে আলাপ সেরে বিল্ব আর থাকল না। তাকে একটু অস্থির লাগছিল। ঋষিকার সঙ্গে ফোন নম্বর আদান-প্রদান করে একটু তাড়াহুড়ো করেই সে কেটে গেল। ধীরার আবার অন্য একজন চেনা বেরল। তিনি সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।
"সমুদ্র কি প্রেম-টেম করছে নাকি? এমন লুকিয়ে-লুকিয়ে ফোন করছে কেন?" ঋষিকা ভ্রুকুটি করে বোধিরূপকে প্রশ্ন করল। বোধিরূপ আঙুল থেকে আংটি খুলে, ফের সেটা পরে বলল, "নাঃ... প্রেম করবে কেন? বললাম না ক্লায়েন্টের কল।" ঋষিকার বুকে ধুপধাপ আওয়াজ হতে থাকে। বোধিরূপকে তার সম্পূর্ণ অচেনা লাগছে। বোধিরূপ কোনও দিন এভাবে কথাও বলে না। ঋষিকা ঘাবড়ে যাওয়া গলায় বলল, "ওঃ... আচ্ছা... ঠিক আছে। তুমি... তুমি... যাও... আমি একটু মল্লিকাদের সঙ্গে গল্প করি..."
বোধিরূপ বলল, "বেশ... যাই তাহলে..."
খাওয়া-দাওয়া সেরে ঋষিকা-সমুদ্র যখন বাড়ি ফিরল, তখন প্রায় রাত একটা। রাতে শুয়ে শুয়ে তারা ফের ধীরা-শিবদাসকে নিয়ে একপ্রস্ত আলোচনা করে। ইদানীং শিবদাস আর নিউ আলিপুরে থাকছেন না। ধীরার তিন হাজার স্কোয়ার ফিট ফ্ল্যাটে শিফ্‌ট করে গিয়েছেন। এবং সেখানে নাকি জনি-রাকাও যায় মাঝেমধ্যে। কোথাও কোনও গন্ডগোল নেই!
"তবু ভাল, সেখানে জনির মা সত্যনারায়ণের পুজো দিতে যাননি! ওনারা এতই স্বাভাবিক আচরণ করছেন, আমার কেমন অস্বস্তি লাগে! কিছুটা বিষণ্ণও। পুরোটাই কেমন হিসেব হিসেব লাগে। প্রেম নেই কেন? কেন নেই হৃদয়পুরের লন্ডভন্ডের কাহিনী? আমি শিবদাসবাবুর স্ত্রী হলে ওই ধীরাকে খুন করে ফেলতাম। আর আমি ধীরা হলে, শিবদাসবাবুকে ওঁর স্ত্রীর মুখও দেখতে দিতাম না! এত শান্তশিষ্ট কেন ওরা?"
সমুদ্র হাসছিল ঋষিকার কথা শুনে। বলল, "সব প্রেম তুমি বুঝতে পারবে ভেবেছ? কত রকমের প্রেম হয়!"
ঋষিকা এসব আলোচনার সময় একবার তার ফাটা রেকর্ড বাজাবেই। সে সমুদ্রর চোখে চোখ রেখে বলল, "তোমার কোনও দুঃখবোধ নেই? তোমার বউ তো সুন্দর নয়!"
সমুদ্র একটুও না হেসে বলল, "কী করব বল তো! আমার যে তোকে ভীষণ সুন্দর লাগে!"
ঋষিকার এসব 'তুই তুকারি' পছন্দ নয়। সে 'তুমি' 'তুমি' 'তুমি'তে বিশ্বাস করে। মুখ বেঁকিয়ে সে বলল, "ইস্! আমায় কখনও তুই বলবে না। বন্ধুতে বন্ধুতে তুই-তুই চলতে পারে। বর-বউ বা প্রেমিক-প্রেমিকায় কখনও নয়!"
সমুদ্র হাসল। ঋষিকা কথা চালাচ্ছিল বটে, কিন্তু কিছুতেই বোধিরূপকে তাড়াতে পারছিল না তার ভাবনা থেকে। হঠাৎ বলল, "বোধিরূপ তোমার কতটা বন্ধু সমুদ্র?"
ঘর অন্ধকার বলে সমুদ্রর মুখ দেখতে পেল না ঋষিকা। তবে উত্তর দেওয়ার আগে সমুদ্র একটু সময় নিল। তারপর বলল, "কেন বলো তো? হঠাৎ এ প্রশ্ন!"
"না। এমনিই। আজ ওকে একটু কেমন কেমন লাগছিল যেন। ভাবলাম, কোনও প্রবলেম হয়েছে হয়তো। তুমি জানো কি না।"
"নাঃ। কিছু হয়নি। কিছু হলে জানতাম। শুনলাম, তোমার নাকি কোনও বন্ধু এসেছিল আজ ক্লাবে..."
"হ্যাঁ, বিল্বমঙ্গল। আমার বন্ধু ঠিক নয়। আমার বন্ধুর বন্ধু। বিশাখা বলে একজন, সে আবার ধীরামাসির বোনঝি...অ্যাই

ঘর অন্ধকার বলে সমুদ্রর মুখ দেখতে পেল না ঋষিকা। উত্তর দেওয়ার আগে সমুদ্র সময় নিল।

শোনো না, বোধিরূপ বিয়ে করবে না? ও প্রেম করে না কেন গো? কোনও পুরনো কেস আছে নাকি?"
"বিল্বমঙ্গলকে তুমি ক্লাবেই প্রথম দেখলে? এই বিশাখার কথা তো তোমার মুখে শুনিনি কখনও... এটা আবার কে?"
"আছে... অ্যাই বলো না, বোধিরূপের কোনও অ্যাফেয়ার-ট্যাফেয়ার নেই?"
"নাঃ...শুনিনি..." সমুদ্র শব্দ করে হাই তুলল। তারপর ঋষিকার পায়ে পা তুলে দিয়ে বলল, "আমি আর পারছি না।.. কাল কথা হবে..."
ঋষিকার ঘুম চটকে গিয়েছে। সে বলল, "আমি তোমার পুরনো বউ, তাই না? তাই আর গল্প করতে ভাল লাগে না! আদর কম... কিন্তু সেটাও ভাল লাগে, জানো?"
সমুদ্রর চোখ বুজে আসছিল। এমন অদ্ভুত কথা শুনে সে সজাগ হল। সে ভাল বুঝতে পারে না ঋষিকার কথা। চোখ বুজেই বলে "কোনটা? সেটাও মানে? কোনটা ভাল লাগে?"
"ওই তোমার কম আদর। খুব বেশি-বেশি হলে কেমন অস্বাভাবিক হত। এই যে মাঝেমাঝে তুমি নিজের কাজ নিয়ে ডুবে যাও, ভুলেই যাও আমি আছি, আমার সেটাই ভাল লাগে। বেশ কষ্ট কষ্ট একটা বোধ। আমি উপেক্ষিত, আমি অনাদরের... এসব ভেবে বেশ লাগে... কান্না পাকায় মনের ভিতর। এই কান্নাগুলো জরুরি। দ্যাখো সমুদ্র, আমাদের তো টাকাপয়সার ক্রাইসিস নেই। এই সব ক্রাইসিসেই আমি বেঁচে থাকি, চনমনে থাকি। সত্যি বলতে কি তুমি কারও প্রেমে পড়লেও আমার ভালই লাগত। অপরাধবোধে মরে যেতে, আমায় খুশি করতে গিয়ে ভুলভাল করতে... উঃ, আমি তারিয়ে-তারিয়ে সেটা উপভোগ করতাম... লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করতে তোমার প্রেম, কিন্তু আমি ঠিক ধরে ফেলতাম... তারপর কাঁদতে-কাঁদতে ঘুমোতে যেতাম... ঘুম থেকে জেগে উঠে নিজেকে বলতাম, তোর বর অন্য নারীতে মজেছে... তুই আর একটু কেঁদে ভাসা, তবে না মজা!"
সমুদ্র ব্যাজার মুখে বলল, "বেশ চেনা স্ক্রিপ্ট। স্ক্রিপ্টের বাকি অংশটা নট ব্যাড, যদিও পুরো গল্পটায় আমার পার্ট তিন লাইনের। তা আমার প্রেমিকাটিকে আর একটু চেনাও! সে কেমন তাই তো বোঝা যাচ্ছে না!"
ঋষিকা বিহ্বল হয়ে পড়ল। সত্যিই তো, তার স্বামীর প্রেমিকাটি ঠিক কেমন? ঋষিকা ভ্রূকুটি করে ভাবতে থাকল। সমুদ্র অধৈর্য গলায় বলল, "শোনো মিঠু, তুমি কষ্ট পাচ্ছ দেখলে, আমি প্রেমে পড়লেও সে প্রেম টিকবে না। আমি পারবই না তোমাকে কষ্ট দিয়ে প্রেম করতে! তুমি ওসব উচ্চাশা ছাড়ো। তোমার ইচ্ছে-টিচ্ছে আমি বুঝি না? আমাকে প্রেম করতে পাঠিয়ে ওই রক্তিমের সঙ্গে পুরনো প্রেমটা একবার ঝালিয়ে নেবে!"
"ধুস! ওসব বাচ্চা বেলার গপ্প! সে সব আমার মনেই নেই!"
"ওর হয়তো আছে! ফোন নম্বর-টম্বর জোগাড় করে হয়তো একদিন ফোন করল! দেখা করতে চাইল, তখন কী করবে?"
"কী আবার করব? বাড়িতে ডেকে নেব! দেখা না করার তো কিছু নেই। বাড়িতে সবাই মিলে আড্ডা মারব!"
"যাঃ! হাউ আনরোম্যান্টিক! বাড়িতে ডাকবে? আর ইউ ক্রেজি? শ্বশুর, শাশুড়ি, ছানাপোনার মাঝখানে প্রাক্তন প্রেমিক... ছ্যাঃ মিঠু, তুমি এত অ্যাভারেজ আমার জানা ছিল না!"

বিশাখা শুকনো নেশা পছন্দ করে। অনেকক্ষণ থেকেই সে সিগারেটে গাঁজা ভরে খাচ্ছে।

"ওমা! তাহলে কী করব?"
"বাইরে দেখা করো। গো টু আ মুভি। নিদেন পক্ষে গো টু আ কফিশপ... দেখো, আবার নতুন কিছু ঝলসায় কি না! জীবনে স্পার্ক আনো ডিয়ার! না তো লিখবে কী করে? এত সাদামাটা জীবনযাপন করলে, লেখাগুলোও সাদামাটাই হবে... বর্ডার ঘোচাও ঋষিকা... মার্জিন মুছে ফেলো। তবে না জম্পেশ লেখা হবে!"
ঋষিকার এবার সত্যি-সত্যিই ঘুম এসে গেল। হাই তুলে বলল, "কোথায় রক্তিম! হায়রে! হচ্ছিল বোধিরূপের গল্প... এ চলে গেল একটা ফিকটিশাস ক্যারেক্টারে!"
"লিভ বোধি অ্যালোন.। চলো, ঘুমনো যাক এবার। রুকুর সুইমিং আছে কাল... ভোরে উঠতে হবে..."
ঋষিকা প্রায় শ্বাস বন্ধ করে বলল, "তুমি..."
"কী? আমি কী?"
সমুদ্রর মুখে এখনও ভ্রূকুটি। তা অবশ্য ঋষিকা দেখতে পেল না। সে অন্ধকারেই মাথা নাড়ল। নাঃ, সমুদ্রকে নিয়ে সন্দেহের কোনও কারণ নেই তার কাছে। থাকলেও সে পারবে না মুখ ফুটে প্রশ্ন করতে। বড্ড লজ্জা... এত দিন পরেও বড্ড ফর্মালিটি তাদের মধ্যে।

৬

বিল্বমঙ্গল রায় মজুমদার আর বিশাখা সেদিন বিতানের শব-মিছিলের সঙ্গী হয়নি। পিস হাভেনের বদলে তারা সল্ট লেকের একটা পাবে গিয়ে বসেছিল বিতানের প্রতি শোকজ্ঞাপন করতে! সেখানে বিতানের বাড়ি-ফেরত আরও অনেক শোকগ্রস্তর সঙ্গে ওদের দেখা হয়ে যায়। সবাই মদ জাপটে হা বিতান, জো বিতান করছে। সৌম্য নামধারী এক তরুণ কবি, 'বিত গ্যায় বিতান', 'বিত গ্যায় বিতান' বলে হেঁড়ে গলায় খুব চেঁচাচ্ছিল। পাবের স্বাস্থ্যবান এক কর্মচারী এসে তার ঘাড় ধরে বের করে দিল।
'তরুণ কবিদের অপমান করা হয়েছে' বলে জড়ো হওয়া সবাই তখন প্রচণ্ড চিৎকার জুড়ল। বিশাখা বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল। বিল্বর অফিস সল্ট লেকে। বিল্ব সেখানে বসার প্রস্তাব দিল। বিল্বর পার্টনার পারিখ কলকাতায় নেই। তাছাড়া অফিসে কর্মীরাও বাড়ি চলে গিয়েছে। সেখানে এখন উপযুক্ত নিরিবিলি। মৃত মানুষটাকে নিয়ে ভাবার ঠিকঠাক পরিবেশ।
বিশাখা শুকনো নেশা করতে বেশি পছন্দ করে। অনেকক্ষণ থেকেই সে সিগারেটে গাঁজা ভরে খাচ্ছে। বিল্ব হুইস্কি আর গ্লাস বের করল। কিন্তু বিল্ব বেচারাকে তো আর নির্জন মদ্যপানের দিকে ঠেলে দেওয়া যায় না, তাই বিশাখাও নিল একটা পেগ। বোতল অর্ধেক শেষ হওয়ার আগেই বিতানের শোক বিশাখার কোলে আধশোয়া হয়ে ঢেলে দিল বিল্ব। বিশাখা সুদূরে মন ভাসিয়ে দিয়ে বিল্বর চুলে হাত বোলাতে শুরু করল।
কেউ যদি ভেবে থাকে, ওরা গোপনে প্রেম করছে বা এর পরেই শুয়ে পড়বে একে অপরের সঙ্গে, তাহলে কিন্তু তারা চরম ভুল করছে। ওদের দু'জনের মধ্যে নিপাট বন্ধুত্ব ছাড়া কিছুই নেই। বিল্ব ফোকটে

মেয়েদের গায়ে হাত বোলানো পার্টি নয়। বিশাখার গা নিয়ে সে আবডালে কোনও দিন ভাবেওনি। বিল্ব আসলে এক ধরনের, মানসিক আশ্রয় পায় বিশাখার কাছে। বিল্বরও একটা লুকনো জীবন আছে। সে জীবনের কথা তার লুকনো জগতের লোকেরা জানে। বিশাখা, সে জগতের নয়। তবু অকপটে, তার লুকনো জীবনের কথা বিল্ব একমাত্র বিশাখাকেই বলতে পারে। কারণ, বিশাখা সম্পূর্ণ নন-জাজমেন্টাল। একটা সময় হু-হু করে বিল্ব আর বিশাখা কাঁদতে লাগল, গলা জড়াজড়ি করে। বিতান ছিল আর-একজন, যার কাছে বিল্ব তার লুকনো জীবনের কথা বলতে পারত লজ্জাহীন। বিতানও পারত, বিশাখা যেমন পারে, বিচার না করে বন্ধুর কথা শুনত মন দিয়ে।

কাঁদাকাটার পর সেক্রেটারিয়েট টেবলের ওপর চিৎপটাং হয়ে শুয়ে শুয়ে বিশাখা খানিক সিগারেট ফুঁকল, তারপর চোখ মুছে কম্পিউটার খুলে মেল চেক করতে বসে গেল। ওর বর্তমান প্রেমিক হায়দরাবাদ গিয়েছে, দু'দিনের জন্য। দিনে তিন চারবার বিশাখাকে সে মেল করবেই করবে। বিশাখা তাই চারঘণ্টা অন্তর মেল চেক করে নেয়...

রোহিতাশ্ব টু বর্তমান প্রেমিক শীলভদ্র— এই চোরকাঁটাবিদ্ধ পথের মাঝে হেমন্তের অরণ্যে একাকী বিচ হাইকারের মতো আছে একজন 'দ্বিতীয় স্বামী', তাকে পেরিয়ে আমাদের শীলভদ্রে যাওয়ার উপায় নেই। এই রুটটা এবার উন্মুক্ত করার সময় এসেছে। প্রথমে রোহিতাশ্ব টু দ্বিতীয় স্বামী... তারপর ফের ডিভোর্স ও বর্তমান প্রেম। বিশাখার দ্বিতীয় বিয়ের আয়ু ছিল দু'বছরের কিছু কম। প্রশ্ন করলে সে বলে, 'ম্যারেড ফর মোর দ্যান ফোর ইয়ার্স!' চার বছরে স্বামী বদল হয়েছে, তা অবশ্য খোলসা করে না!

নাঃ, শীলভদ্রর মেল এল না এখনও। নেশাগ্রস্ত চোখ বিশাখা আর মেলে রাখতে পারছে না... সে ফের টেবিলের ওপর শুয়ে পড়ল। আর প্রেমিকের মেল-প্রত্যাশী, হতভাগী মেয়ে, এক লহমায় তলিয়েও গেল গভীর ঘুমে। ওর ঘুমমাখা মুখ বড় সুন্দর। পাপ-পুণ্যর কোনও হিসেব লেখা নেই ও মুখের কোনও বিন্দুতে। সুন্দর এই মুখটা দেখতে-দেখতে খানিকটা পিছিয়ে যেতে অসুবিধে নেই।

প্রাক্তন ননদ বুলি ও প্রসেনজিতের বিয়ের পর রোহিতাশ্ব আর বিশাখা উঠে গিয়েছিল সল্ট লেকের ভাড়াবাড়িতে। বুলির বিয়েতে রোহিতাশ্বর মায়ের সব স্বপ্নই পূরণ হয়েছিল। তাঁর কোনও সাধ মেটাতে কার্পণ্য করেনি রোহিতাশ্ব। বিশাখা নিজেও তার ননদকে প্রায় লাখখানেক টাকা খরচ করে গড়িয়ে দিয়েছিল সোনার নেকলেস। বাড়ি ছেড়ে চলে আসার দিন শ্বশুরমশাই ছাড়া আর কাউকেই তেমন বিষণ্ণ লাগছিল না।

'শ্বশুরবাড়ি-শ্বশুরবাড়ি' খেলা সাঙ্গ, তা বিশাখা একাই বুঝেছে এমনটা যে নয়, তা সবার ব্যবহারেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সেদিন। বাড়ি ছেড়ে চলে আসার পর রোহিতাশ্বকে একটু বুড়োটে দেখাত। আসলে রোহিত-বিশাখারও বিয়ের বয়স বাড়ছিল। তারা নিজেরাও ছড়িয়ে পড়ছিল আরও অন্যান্য সমীকরণে। ধীরেধীরে তাদের দেখার মন পাল্টাচ্ছিল। পাল্টাচ্ছিল বোঝার চোখ। তবু ভালবাসা তো মরে যায়নি। কারণে-অকারণে মন খারাপ ছিল। ছিল মান, অভিমান, যৌনতা, খুনসুটি, সাত দু'গুণে চোদ্দো, হাতে রইল পুজোর ছুটিতে সিকিমের ট্রেকিং ও জন্মদিনে রেড ওয়াইন।

সময়-অসময়ে খুব মন খারাপ লাগে... বিশাখার, রোহিতেরও। সারাদিন সাপলুডো খেলতে গিয়ে মোকাবিলা হয় সে সব মন খারাপের। রাতে যখন দেখা হয়, তখন আর মনে থাকে না, কখন, কীভাবে, আলাদা আলাদা তারা সামলে নিয়েছে নিজের নিজের কষ্ট। সপ্তাহান্তের হুল্লোড় জারি থাকে। মাঝেমধ্যে দলবেঁধে সিনেমা দেখা বা রাত-ভোর পার্টি... বেশ আছি হে বেশ আছি ভাব নিয়ে আবার সারা সপ্তাহের দৌড়। কেমন ছিল রোহিত-বিশাখা? প্রেম, শুধুমাত্র প্রেম দ্বারা চালিত উজবুক মেয়ের প্রেম ছিল রোহিতের প্রতি? সেই উদ্দাম প্রেম?

ছিল হে, ছিল! দৈনন্দিনতায় চাপা পড়া হলেও, ছিল বইকি!

স্নান করার সময় অন্যমনস্ক রোহিত চোখের মধ্যে সাবান দিয়ে ফেলে। প্রায়ই। তারপর জল খুঁজে পায় না। হেঁড়েগলায় বিশাখার নাম ধরে চেঁচায় বাথরুম থেকে। সেই 'জলে পড়া' মুখের চোখ কুঁচকে দাঁড়িয়ে থাকা অসহায় রোহিতকে দেখে, তখনও, বিয়ের অত দিন বাদেও, বিশাখার প্রেম একেবারে উথলে ওঠে। আদরে-আদরে চোখ মোছানো চলে। এই সব ছোটিমোটি খেলা খেলার নামই কি প্রেম নয়?

বিশাখার রাগ হলে রোহিতকে গাইতে হবে একটা বিশেষ গান। কিশোরকুমারের 'ও হানসিনি...' সেখানে একটা বিশেষ শব্দ গাইবার সময় রোহিতের সুন্দর ঠোঁটটা বেঁকে যায়। কী যে ভাল লাগত বিশাখার... এসব, এসবই কি প্রেম নয়?

নাইট শোয়ে সিনেমা দেখে ফেরার সময় ট্যাক্সি না-পেয়ে লরি চেপে বাড়ি ফেরা... লরি ড্রাইভারের বিশাখাকে দেখে বলা 'আপ বহুৎ সুন্দর হায়...' তাই শুনে রোহিতের হঠাৎ করে লরির মধ্যেই বিশাখাকে জাপটে ধরে চুমু খাওয়া... ভীষণ মেঘলা বিকেলে গাড়ির সব কাচ তোলা... পরিত্যক্ত বন্দরের ঘুমন্ত কর্মীকে ঘুষ দিয়ে নদীর ধারের পোড়ো গোডাউনের টিনের চালে ঝমাঝম ঝমাঝম... ধুলোমাখা মেঝেতে আদিম দুই নর-নারী...

অবশ্যই প্রেম হে!

এভাবেই চলে যেত বছরের পর বছর। কিন্তু বিশাখার নিয়তিতে লেখা ছিল আরও কিছু টালমাটাল।

বিল্বমঙ্গলের সঙ্গে বিশাখার আলাপ করিয়েছিল পারিখ। পারিখের তখন ব্যবসা এতটা জমে ওঠেনি। সে ছিল বইয়ের ফেরিওয়ালা। বিশাখার কলেজে বই বেচতে আসত। কিন্তু সাজপোশাক ছিল হিরোর মতো। ওর মতন নির্লজ্জ ব্যবসায়ী বিশাখা একটাও দেখেনি। নাছোড়বান্দা, মুখ মিষ্টি আর ফ্লার্ট। পারিখের বাবা আহমেদাবাদে বিরাট কারখানার মালিক। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে কলকাতায় চলে এসেছিল পারিখ, ব্যবসা করে বাপকেও টেক্কা দেবে বলে।

"কেন? কলকাতা কেন? কলকাতায় তো ব্যবসা হয় না বলে জানি!" প্রশ্ন করেছিল বিশাখা।

"কলকাতা গার্লস আর ভেরি প্রিটি। তাই!" অকপট জবাব পারিখের!

"তুমি বইয়ের ব্যবসা করো কেন? বইয়ের ফেরিওয়ালাগিরি করে তুমি বড়লোক হতে পারবে? বাবাকে টেক্কা দিতে তো বুড়ো হয়ে যাবে!" বলত বিশাখা।

পারিখ মিষ্টি মিষ্টি হাসত। কিছু বলত না। বিশাখার সঙ্গে পারিখের একটা আলগা-আলগা বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। কথা বলে বিশাখা বুঝেছিল লোকটা ধুরন্ধর এবং বেশ শিক্ষিত।

পার্ক স্ট্রিটে পারিখের একটা ঠেক ছিল। মদের ঠেক। সেখানে আসত কিছু অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। আসত বড়লোক বাবার উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলেমেয়েরাও। একটা পারসি মেয়ের সঙ্গে পারিখ তখন প্রেম করে, সেই মেয়ের সঙ্গে আলাপ করাতে বিশাখাকে নিয়ে পারিখ সেদিন সেই ঠেকে গিয়েছিল। ব্রিটিশ আমলের বিরাট একখানা, ভগ্ন-স্বাস্থ্যের বাড়ি। পোর্টিকো পেরলেই মস্ত একটা দালান। তাতে প্লাইউডের দেওয়াল তোলা অজস্র খুপরি। সবক'টাই অফিস।

দালান পেরলে একখামচা মাঠ। সেই মাঠের ধার ঘেঁষে একখানা পেল্লাই ভিনটেজ গাড়ি, ঝুরঝুরে অবস্থায় এলিয়ে দাঁড়ানো।

"ক্যাট ওয়াকে বেরিয়ে ফ্রিক্ড শট!"

গাড়িটাকে দেখিয়ে বলেছিল পারিখ। গাড়িটা পেরিয়ে গেলে বাড়ির একদা আউট হাউস। বর্তমানে পারিখের ঠেক। বিশাখার নতুন বন্ধু পাতাতে যেমন বাছবিচার নেই, তেমনই নেই মদখেকো লোকেদের নিয়ে কোনও ছুঁৎমার্গ। দিনদুপুরে সাত আটখানা মুশকো লোককে লালচোখে মদ খেতে দেখে তার সেদিন কিছুই মনে হয়নি। অবলীলায় সে একটা প্যাকিং কেসে বসে টেরিয়ে-টেরিয়ে দেখে নিচ্ছিল চারপাশ আর মোবাইলে ছবি তুলছিল ক্যাট ওয়াকের ফ্রিক্ড-শটের!

পারিখের প্রেমিকার অপেক্ষায় বসে, এছাড়া আর কীই বা করার ছিল তার? পারিখের প্রেমিকা সেদিন একা আসেনি। ফিল্ম স্টারের মতো রূপসি সেই মেয়ের সঙ্গে সেদিন ঠেকে এল দু'টি পুরুষ। একজন বিশাখার অচেনা। আর একজন মুখচেনা। অচেনা জনের সঙ্গে পরে আলাপ থেকে বন্ধুত্ব হবে বিশাখার। তার নাম বিল্বমঙ্গল। আর দ্বিতীয়জন বিতান বসু। বইমেলায় একবার বিতানের সঙ্গে আলগা আলাপ হয়েছিল বিশাখার। অসামান্য সুন্দরী সব মহিলা-পরিবৃত হয়ে মাতলামি করছিল বিতান। বিশাখার ধারণা ছিল কবিদের স্মৃতিশক্তি কম হয়। সে বিতানকে দেখে হাসব কী হাসব না মুখ করে বলেছিল, "তুমি বিতান না? তুমি তো একটা কলেজে পড়াও! কলেজ কেটে দিনের বেলায় মাল খেতে এসেছ?"

চোখের পলক না ফেলে বিতান বলেছিল, "তুই বিশাখা, তাই না? তুইও তো কলেজে পড়াস! তুই যে এসেছিস!"

বিশাখা অবাক হয়ে সামলে নিয়ে বলেছিল, "আমার আজ অফ-ডে।"

বিতান ঝকঝকে হাসি হেসে বলেছিল, "কী করে জানলি, আমার অফ-ডে নয়?"

বিশাখাকে কথায় জব্দ করতে পারে, এমন মানুষ বেশি দেখেনি বিশাখা। সে বেশ মুগ্ধ হয়েছিল সেদিন বিতানের অ-কবিমার্কা ব্যবহারে! ওই যে অবলীলায় 'তুই' বলা, হাল্কা চাঁটি মারা... সব ভঙ্গির মধ্যেই বিতানকে তার খুব ফ্রেন্ডলি লেগেছিল। বিশাখার উত্তরের অপেক্ষা না করে, বিতান বাকি মাতালদের দলে ভিড়ে গিয়েছিল। বিশাখা 'যাঃ, গোল খেয়ে গেলাম' মার্কা মুখ নিয়ে বসে পা নাচিয়ে গিয়েছিল! আর কখনও বিতানের সঙ্গে দেখা হয়নি বিশাখার। আজ বিল্বমঙ্গলের চাপে পড়ে মৃত বিতানকে দেখতে গিয়েছিল বিশাখা। ভিড়ের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে বিতানের বন্ধুদের দেখছিল সে চোখ খুলে।

আত্মা-ফাত্মায় বিশাখার বিশ্বাস নেই। মৃত বিতানের আত্মার শান্তি-টান্তি কিছুই কামনা করেনি সে। পারসি মেয়েটির নামটা আজ আর বিশাখার মনে নেই, কিন্তু বিল্বমঙ্গলের সঙ্গে সেদিন দুরন্ত আড্ডা জমে গেল। পারিখ ঘণ্টাখানেক বাদে প্রেমিকাকে বাসে তুলে দিয়ে এল... তাদের আড্ডা গড়াল প্রায় সন্ধে সাতটা অবধি। পারিখ তখন বেশ মাতাল। বারবার প্রশ্ন করছে "তোমাদের টেগোর ব্রাহ্মভণ নয়? আমি জানতাম ব্রাহ্মভণ!"

"ব্রাহ্মভণ, ব্রাহ্মভণ! উঃ, অসহ্য! অ্যাই তুমি বামুন বলোতো, নয়তো ব্রাহ্মিন! ব্রাহ্মভণ আবার কী?"

কিন্তু বিশাখার আপত্তি পারিখ কানেই তুলল না। ওই 'ব্রাহ্মভণ, ব্রাহ্মভণ'-এর জ্বালাতেই বিশাখা সাতটা নাগাদ উঠে পড়ল আড়মোড়া ভেঙে।

বিল্ব বলল, "তুমি উঠে পড়লে? নালকের সঙ্গে আলাপ করবে না?"

বিল্বর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগেই বিশাখা দেখল একটা ভীষণ লাজুক দেখতে ছেলে, পিঠে রুকস্যাক, এক হাতে আইসক্রিম, অন্য হাতে মোবাইলে হাত নেড়ে নেড়ে, শক্ত আর বাছাই করা শক্ত— সাধু বাংলা ভাষায় ঝগড়া করতে-করতে তাদের টেবলের দিকে আসছে।

টেবিলের কাছে এসে ফোনটা কেটে দিয়ে বিশাখার দিকে তাকাল ছেলেটা। বিশাখা হেসে ফেলল।

নালক বলল, "এ কী অবমাননা!"

বিশাখা তখন দু'পাত্তর ডাউন। অত কন্ট্রোল নেই নিজের হাসির ওপর! সে ফের হেসে ফেলেছিল। কিন্তু হাসির সঙ্গে আরও কিছুও মিশছিল। বিশাখার চোখ সরছিল না নালকের মুখের ওপর থেকে। নালক তার নরম দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, "পুরো নাটিকাটাই আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সাজানো... একটা ড্রামাটিক এন্ট্রি কীভাবে দেওয়া যায় ভাবতে-ভাবতে দেখলাম তৎসম শব্দের ওপর আমার জ্ঞানটাই ফলানো যাক! বাইরে থেকে আপনাকে দেখে চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। আমি কস্মিনকালে আইসক্রিম খাই না। মাইরি বলছি।"

বিশাখার হাসি তখন মুছে গিয়েছে। চোখে পলক পড়ছে না, কান ও মুখে আগুনের হল্কা...

নালক বিশাখার কনুই ছুঁয়ে বলল, "নমস্কার। আমার নাম নালক। আমি একজন শিক্ষিত বেকার, বাবা একাধারে পুঁজিপতি ও সামন্ততান্ত্রিক। মা হাসিমুখে চরম পুরুষতান্ত্রিকতার শিকার। আমি অঘোষিত ডান ও ঘোষিত বামপন্থী। ভাল সাইকেল চালাতে পারি। আর আপনি?"

চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা বলা বিশাখার তখন কথা উড়ে গিয়েছে। ওই ক্যাটওয়াকে বেরিয়ে ফ্রিক্ড-শট কেস! ঠিক একহাত দূরে দাঁড়ানো নালকের গা থেকে উড়ে আসছে আগুনের ফুলকি... নালকের হাল্কা রোমশ, বলিষ্ঠ হাত, শার্টের তিনটে বোতাম খোলা বলেই দেখা যায় ওর ফরসা আর চওড়া বুক...

বিশাখার ফোন বেজে উঠল বলেই রক্ষে, নাতো সম্মোহন সেদিন, পাবলিক প্লেসে কত দূর গড়াতে কে জানে? ফোন করেছিল রোহিতাশ্ব।

"তুই কোথায় রে?"

"আমি পারিখের সঙ্গে, ঠেক মারছি। কেন বলতো?"

"রাতে খিচুড়ি খাবি?"

"নাঃ, বাড়িতে ঘি নেই, ঘি ছাড়া জমবে না... রাখছি এখন।"

"ঘি জোগাড় হয়ে যাবে। শোন না, তোর মনে আছে আমাদের প্রথম শান্তিনিকেতন? খোয়াইয়ের ধারে সেই অভীকের বাড়ি? খিচুড়ি রেঁধেছিলি তুই? আমি রান্নাঘরের দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে বসে তোকে কবিতে শুনিয়েছিলাম... বড্ড মনে পড়ছে দিনগুলো, তা ভাবলাম..."

"কবিতাকে কবিতে বলছিস কেন?"

"খুব ইমোশনাল হয়ে আছি রে বিশ... তাই হয়তো..."

"বিতানের কবিতা পড়েছিলি, খুব মনে আছে। অ্যাই জানিস, এখানে বিতান এসেছিল একটু আগে, মাল খেতে, এখন অবশ্য নেই..."

"হুঁ...তুই চলে আয় তাড়াতাড়ি... আজ আবার কবিতা পড়ব। খিচুড়ি খাব। আয় তাড়াতাড়ি..."

"তুই আজ ক্লাবে যাসনি? কী হল হঠাৎ?"

"নস্টালজিয়া...বললাম তো তোকে... খিচুড়ি... তুই... সেই দিনগুলো..."

"তুই কী খেয়েছিস রে? গলাটা কেমন লাগছে?"

"কিচ্ছু খাইনি...তুই আয়, একসঙ্গে খাব... হিমাচলী চরস... কাবুল এনে দিয়েছে..."

রোহিতাশ্ব যেমন আচমকা ফোন করেছিল, তেমনই দুম করে ফোন কেটে দিয়েছিল। বিশাখা তাকিয়েছিল নালকের হাতের দিকে... হাত নয়, আঙুল, আঙুল... বিশাখা তার ভাল লাগা পুরুষদের হাতের আঙুল দেখে নেয় প্রথমেই... তার গা শিরশির করে।.. ওই শিরশিরানিটা তার ভাল লাগে...

আঙুল থেকে চোখ। ঠেকের টুলে বসে বসেই বিশাখা দেখল, নালকের চোখগুলো অসাধারণ। গড়পড়তা বাঙালি ছেলের থেকে অধিক ফরসা বলেই তার দীঘল, শ্যাম চোখ আর আঁখিপল্লব মারাত্মক অ্যাট্র্যাক্টিভ। নরম কালচে দাড়ির ফাঁকে প্রায় গোলাপি ঠোঁট।
নালক কি সিগারেট খায়? ভাবছিল হীনমন্যতায় ভুগতে থাকা বিশাখা। সে নিজে চেন স্মোকার। এবং সে কারণেই তার ঠোঁটদু'টি কালচে, দাঁতে নিকোটিনের ছোপ। কাঁপা-কাঁপা হাতে বিশাখা একটা সিগারেট ধরিয়ে বলেছিল, "তোমার নাম নালক কেন?"
নালক কোনও উত্তর দিল না। হাত বাড়িয়ে বিশাখার হাত থেকে সিগারেটটা নিয়ে একটা গভীর টান দিল। ধোঁয়া ছাড়তে গিয়ে বিষম খেয়ে কাশতে লাগল। কী ছেলেমানুষ, অপাপবিদ্ধ আর অসহায় লাগছিল ওকে...

ঠিক কুড়ি ঘণ্টা বাদে নালক আর বিশাখা বসেছিল শান্তিনিকেতন থেকে তিন কিলোমিটার দূরে, বল্লভপুর যাওয়ার পথে, একটা শালবনের ভেতর...
শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে এসে তারা উঠেছে নালকের এক পুরনো বন্ধুর বাড়িতে। এই বন্ধু কলকাতায় থাকে। কোনও বিদেশি কোম্পানির হোমরাচোমরা। ভদ্রলোক সপ্তাহান্তে শান্তিনিকেতন আসেন। সারা বছর বাড়িটায় থাকে কলাভবনের এক ছাত্র। স্টেশনে নেমে নালক ছাত্রটিকে ফোন করে দিয়েছিল। সে লাইব্রেরির সামনে এসে নালকদের বাড়ির চাবি দিয়ে গেল। ছেলেটি জানাল তার নাম ক্রিশ। এই ছেলে ভদ্রলোকের প্রাক্তন প্রেমিক।
নালক স্বাভাবিকভাবে তথ্যটা দিল বটে, কিন্তু বলার সময় মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠল।
বিশাখা বলল, "ওরকম নাক সিঁটকে বলছিস কেন?"
"প্রাক্তনদের সঙ্গে কোনও রকম যোগাযোগ রাখায় আমি বিশ্বাসী নই, তাই!"
"আমার ধারণা হেটেরো-সেক্সুয়াল প্রেমের ক্ষেত্রে যতটা তিক্ততা থাকে, প্রেম কেটে গেলে, হোমোসেক্সুয়ালদের ভেতর ততটা থাকে না।"
নালক ঝলমলিয়ে বলেছিল, "চল, তুই আর আমি মিলে এটার ওপর একটা জয়েন্ট রিসার্চ-ওয়ার্ক করি। করবি?"
বিশাখা বলল, "আমার ওসব লদকালদকি নিয়ে অ্যাকাডেমিক পড়াশুনো করতে বয়ে গেছে!"
নালক হেসে বলল, "লদকালদকি! উঃ ফাটাফাটি!"
দুপুরে বিশাখা আর নালক ক্যানালের ধারের বউদির হোটেলে ভাত খেয়ে নিল। বোলপুরে সেদিন একখানা খুনখারাপি রঙের বিকেল নেমেছিল...লাল শুকনো মাটির ওপর দু'জনে বসেছিল...
রামকিঙ্কর বেজের মূর্তির মতো স্থির। অসংখ্য সিগারেটের ধোঁয়া মিলিয়ে গেল বল্লভপুরের বাতাসে... একটাও কথা হল না ওদের মধ্যে।
এভাবে কাটল প্রায় সাড়ে চৌত্রিশ মিনিট। তারপর নালক তাঁর ঠোঁট দু'টো মিশিয়ে দিতে লাগল বিশাখার ঠোঁটে। বিশাখা চাতকপাখির মতো নালকের চুম্বনে তলিয়ে যেতে-যেতে বাঁ হাতের মুঠিতে ধরল ওর কালো চুল।
বিশাখার বাহুমূল উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। নালক তার নরম দাড়িমাখা মুখ বিশাখার বাহুসন্ধিতে ঘষতে শুরু করল। তার মুখ তখন টকটকে লাল, নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে। বিশাখা আকাশের দিকে তাকাল। তাকাল সামনের উন্মনা বিস্তারের দিকে।
সে আসলে উত্তর খুঁজছিল। এ কি পাপ? বিবাহিত নারীর, পরপুরুষের সঙ্গে এইভাবে খোলা আকাশের নীচে সব ভুলে ভেসে যাওয়ার নাম কী? প্রকৃত সঙ্গম? ওরা চারপাশ ভুলে আদর করছিল একে অন্যকে।
'আ...আ...আ' করে বিশাখার ভেতর থেকে আছড়ে পড়ছিল আবেশের গোঙানি। নালক তখন কাঁপছে থরথর করে। বিশাখার কণ্ঠার হাড় কামড়ে ধরে সে বলল, "ছেড়ে যাস না বিশাখা... তুই ছেড়ে গেলে মরে যাব!"
খিলখিল করে হাসির শব্দে দুই নরনারী সংবিৎ ফিরে পেল। চমকে তাকিয়ে দেখে, তাদের পাগলামি দেখতে জড়ো হয়ে গিয়েছে দু'টি অল্পবয়সি সাঁওতালি মেয়ে। ঝকঝকে হলুদ, কমলা শাড়ি, মেটে রঙের ব্লাউজ, মাথায় খড়ের বোঝা নিয়ে তারা হেসে কুটিপাটি হচ্ছে। বিশাখা ছিটকে সরে গিয়ে লজ্জায় মুখ ঢেকে ফেলল।
নালক হেসে বলে, "কী দেখিস বটেক? আদর খাবি?"
মেয়ে দু'টো হিহি করে হেসে হাতে ধরা কাস্তে দেখাল। তারপর তুরতুর করে দৌড়ে পালিয়ে গেল।
বিশাখা বড় বড় চোখ করে বলল, "এটা কী বললি তুই? আদর খাবি মানে?"
নালক বলল, "তুই কি খুব জেলাস? তোকে ছাড়া আর কাউকে আদর করতে দিবি না?"
বিশাখার মাথা দপদপ করছিল। সত্যিই তো! এ তো অমোঘ প্রশ্ন! এই প্রায় অচেনা একটা লোক, আর-একজনকে কাউকে আদর করতে চায় শুনে তার এমন রি-রি করছে কেন শরীর? চিড়বিড় করছে কেন মন? আবার এক ধরনের যৌন উত্তেজনাই বা হচ্ছে কেন? এই সব কি প্রেমের সিম্পটম? এত সহজে প্রেমে পড়ে যাওয়া যায়?
বিষয়টার গোলকধাঁধা থেকে বেরনোর জন্য বিশাখা তার অধ্যাপকসুলভ গলাটা বের করল। বলল, "আমাকে কখন থেকে ছক করছিস বলতো? কী-কী জানিস আমার সম্বন্ধে? জানিস, আমি বিবাহিতা?"
নালকের চোখের সব আলো যেন নিভে গেল দপ করে। মাথা নিচু করে নিয়ে সে বলল, "তুই জানিস না বিশাখা, শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে তুই একটা বইয়ে মুখ ডুবিয়ে বসেছিলি বলে আমায় খেয়াল করছিলি না... আমি তোর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। আমার সঙ্গে সারাজীবন থাকবি বিশাখা? তোকে খুব ভালবাসব, দেখিস..."
বিশাখার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। নালকের কথায় এমন আশ্চর্য সারল্য, এমন ছেলেমানুষি শপথ, যেন মেলায় লাল ফিতে কিনে দেওয়ার লোভ দেখাচ্ছে কাঙালিনিকে!
নালক আপন মনে বলে চলল, "তোকে আমি চিনি না। ঠেকে সেদিন তোকে যখন দেখলাম, তোর নামটাও জানা নেই, আমার মনে হল তুইই আমার জীবনের শেষ স্টেশন। তুই রাজি কি না বল!"
বিশাখা হাঁ করে তাকিয়ে ছিল নালকের দিকে। এই ছেলেটা পাগল নাকি? এমন অবলীলায় একজন বিবাহিত মহিলাকে এসব বলছে?
সে বড় একটা হাঁফ ছেড়ে বলল, "শোন নালক, আমি নিজে কিছু ছিটেল বলেই আজকে তোর সঙ্গে এরকম উদ্ভট কাণ্ডে ঢুকে পড়েছি। তুই বড্ড অ্যাট্রাক্টিভ। বেখেয়ালে, কাণ্ডজ্ঞানহীন। পুরো প্যাকেজটা আমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। কিংবা হতে পারে আমার বোরিং বাস্তবটার থেকে পালানোর অপশন এল তোর মতন এক পাগলের হাত ধরে... কিন্তু..."
নালক আচমকা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "ঠিক আছে। বুঝে গেছি। আমি চললাম। তুই নিশ্চয়ই আলাদা যেতে চাইবি... এখানে রিকশা পেয়ে যাবি।"
বিশাখার দম আটকে আসছিল পুরো পরিস্থিতিটায়। নিজেকে মনে-মনে ধিক্কারও দিচ্ছিল সে। এই সব বদ খেয়াল তাকে

বিপদে ফেলতে পারে যে কোনও দিন। সব কিছু ভুলে সে কেন এল এই অচেনা ছেলেটার সঙ্গে, তার স্পষ্ট কোনও ব্যাখ্যা নেই তার নিজের কাছে। সেমিনারের নাম করে রোহিতাশ্বকে মিথ্যে বলে এসেছে সে। কেন এল, কেন এল ভাবতে-ভাবতে এখন তার হাড়ের ভিতর সরসর করে ছুটে চলেছে অস্বস্তির কয়েক লক্ষ দানা...

এর নাম নালক। এ ছাড়া এর সম্বন্ধে সে এখনও কিছুই জানে না। বিশাখা স্মার্ট হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। বলল, "ওরে বাবা, তুই কি অভিমান-টভিমানের খেলায় ঢুকে পড়ছিস নাকি? আমরা তো বন্ধুও হতে পারি। রাখহরিবাবুর মিষ্টি সংসারের স্বপ্নে তাল মেলাইনি বলে এত ক্ষেপে গেলি? আচ্ছা, এবার তোর কথা বল। দাড়িতে তো দু'-একটা রুপোলি রেখা দেখতে পাচ্ছি, বিয়ে হয়নি তোর? তোর সম্বন্ধে আরও কিছু ইনফো অন্তত দিবি তো, নাকি? নাতি-নাতনিদের বলতে হবে না? 'সোনাঝুরির সেই সকালটা' নিয়ে বলতে গেলে আমার আরও কিছু জানা দরকার নালক। চল, আমরা বরং একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ফিরি... শান্তিনিকেতন আর রবীন্দ্রনাথ বাঙালি ছেলে-ছোকরার মাথা খেয়েছে, এমন অপবাদ অনেক ঘরপোড়া বাঙালি দিয়ে থাকে।"

রোহিতাশ্ব-বিশাখার ঘর পোড়ানোর পিছনে রবিবারুর একটুকু ছোঁয়া রয়েই গেল। সোনাঝুরির বন পেরোতে গিয়ে সেদিন নালক আর বিশাখার চমৎকার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। বিকেল গড়িয়ে গিয়েছিল। তারা বিশ্বভারতীর ক্যান্টিনে চা খেয়ে পূর্বপল্লি, রতনপল্লি, শ্যামবাটীর রাস্তায়-রাস্তায় ফিরতে লাগল নেশাগ্রস্তর মতো। ছাতিমের নেশা ধরানো, রোমাঞ্চকর গন্ধ আর মার-মার কাট-কাট পূর্ণিমার রাত ছিল সেটা। অজস্র গান, কবিতা, আগড়ম, বাগড়ম কথার ফাঁকে বিশাখা জানল নালক কলকাতার ছেলে নয়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে সে নেট পরীক্ষার জন্য পড়াশোনো করছে। মেডিকাল কলেজের হোস্টেলে, বন্ধুর সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা।

বামপন্থা, রবীন্দ্রনাথ, রায় বনাম ঘটক, বাঙালির বেঙ্গালুরুতে বিশ্বদর্শন, ফড়ে বনাম বড় কর্পোরেট—সব বিষয়েই সে কথার ফুলঝুরি ছোটাল আর মাঝেমাঝে বিশাখার হাতে হাত রেখে ঝুম হয়ে বসে রইল। মাঝে দু'-তিনবার রোহিতাশ্বর সঙ্গে বিশাখার কথা হল। রোহিতাশ্ব জানাল, সে বিশাখাকে ভীষণ মিস করছে! উত্তরে বিশাখা কাঠহাসি ছুড়ে দিল রোহিতের কানে। রাত দশটায় ওরা বাড়ি ফিরল। ফিরেই নতুন চমক।

বাড়ি সরগরম। ক্রিশের একগুচ্ছ বন্ধু এসেছে। পরের দিন মেলার মাঠে তাদের 'ছবিতা' উৎসব। কবিতাপাঠ হবে। কলাভবনের ছেলেমেয়েরা ছবি আঁকবে সে সব কবিতার সঙ্গে-সঙ্গে। ওরা সারারাত জেগে আঁকবে পোস্টার, ফেস্টুন, ব্যানার... 'শ্রেণিসংগ্রাম...তুঁহু মম শ্যাম সমান...' বিতান বসুর কবিতার এই লাইন লেখা একটা বিশাল ব্যানারের সামনে দাঁড়িয়ে বিশাখা কেঁপে উঠেছিল। রোহিতের বড় প্রিয় এ কবিতা। লাইনগুলো তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল রোহিতের কাছে... কিন্তু সে তো রোহিতের কাছে আর নেই! সে এক বাউন্ডুলে উন্মাদের সঙ্গে অন্য নগর... অন্য পাড়া...

ছেলেগুলি নেশা করে আছে। তাই বেপরোয়াভাবে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে তারা বিতানের লাইন আওড়াচ্ছে, কাঁদছে, একে অন্যকে জড়িয়ে ধরছে...এক কার্নিভালের আয়োজন হয়েছে শান্তিনিকেতনে বিতান বসুর কবিতা ঘিরে। সেই কার্নিভালে মিশে যায় নালক। বিশাখা শোকে, অপরাধবোধে, লজ্জায়, ভালবাসায় শিহরিত হতে থাকে, ভাসতে থাকে... বিতান তাকে ঠেলে নিয়ে যায় ফেলে আসা রোহিতের দিকে, আবার ঝাঁকি মেরে ফেরত আনে বর্তমানে, নালকের কাছে... রাতে কেউ ঘুমোবে না। হাতে হাতে ঘুরতে লাগল গাঁজার ছিলিম। বিশাখার চোখ জ্বালা করছিল। সে ঘর ছেড়ে উঠে গেল লাগোয়া বারান্দাটায়। অস্থির আঙুলে টিপল রোহিতের নম্বর, "কী করছিস রোহিত?" রোহিত খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, "হাত মারছি।"

বিশাখার কান ঝাঁঝাঁ করে উঠল। কী ভীষণ অসম্মানজনক আর অশ্লীল! অথচ একসময় বিশাখাই রোহিতকে উৎসাহ দিত অশ্লীল কথা উচ্চারণ করার জন্য। এইটুক সময়ের মধ্যেই রোহিত এমন দূরের হয়ে গেল?

বিশাখা ঢোঁক গিলে বলেছিল, "যাঃ..."

"কী করব বল? হাত যেখানে যেখানে যেতে চায়, সে সব জায়গা তো হাতের কাছে নেই!"

বিশাখা দমে গেল। এর কাছে তাকে ফিরে যেতে হবে? তার থেকেও যেটা আরও বিভীষিকাময়, এই ছেলেটার সঙ্গে শেষ যখন তার দেখা হয়েছে, তখন পর্যন্ত এ ছিল বিশাখার প্রেমিক ও স্বামী। ফিরে গিয়ে কোন মুখে বিশাখা একে পাল্টানো সমীকরণের কথা বলবে? এত সহজে ওলট-পালট হয়ে যায় হৃদয়? নাকি এ শুধুই শরীর! শরীর!

সারারাত বিশাখা জেগে থাকল। তীব্র অপরাধবোধ, লজ্জা, দ্বিধা আর এক অবর্ণনীয় আনন্দে ভাসতে-ভাসতে বিশাখার রাত কেটে গেল। শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে এসে, বিশাখা দেখল রোহিত তার জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে। অফিস কামাই করে, বিরিয়ানি রান্না করেছে। সঙ্গে ইলিশমাছ ভাজা।

"এ আবার কী অদ্ভুতুড়ে কন্সিনেশন... শুধু শুধু এসব করতে গেলি কেন?" মিনমিন করে বলল বিশাখা।

রোহিত তার মাথায় আর কানে চুমু খেয়ে বলল, "বেশ করেছি... আমার বউয়ের জন্য আমি সিলিং থেকে ঝুলে ঝুলে মিশিমাখা, শিখিপাখার গানও গাইতে পারি! বুঝলি?"

কথাটা শুনে বিশাখার হাসা উচিত ছিল। কিন্তু ওর একটুও হাসি পেল না। রোহিতের স্পর্শে এমনিতেই ও কাঠ হয়ে গিয়েছিল, কথাটা শুনে বিরক্তই লাগল!

"তোর বাড়ির সবার জন্য শনিবারের হাট থেকে কিছু টুকিটাকি জিনিস কিনে নিয়ে এসেছি... তুই আজ যাবি ও বাড়ি? জিনিসগুলো দিয়ে আসবি?"

রোহিত ইলিশের কাঁটা নিয়ে হিমসিম খেতে খেতে বলল, "তুই যাবি না?"

"আমার কোয়েশ্চেন পেপার সেট করতে হবে রে... যেতে খুব ইচ্ছে করছে, কতদিন ওদের দেখি না... কিন্তু হবে না। এই যে সেমিনারে পেপার পড়ে এলাম, হেড ডিপের মুখ ভার... আমায় কেন ডেকেছে, ওকে কেন ডাকেনি? আমাদের কলেজে এত পেটি পলিটিক্স... নিজের যোগ্যতা আছে কি নেই, সেটা দেখার দরকার নেই। আর একজনের হচ্ছে কেন, সেটাই মূল ব্যথার জায়গা..."

রোহিত অবাক হল। কলেজের গল্প বিশাখা একেবারেই করে না বাড়িতে। আজ যেন বিশেষ উৎসাহ নিয়ে বকে চলেছে! সে চোখ নাচিয়ে বলে, "তোর হলটা কী? এত ডিটেলে এই সব আনসান বিষয় নিয়ে কথা বলছিস?"

বিশাখা থম মেরে গেল। রোহিতের সঙ্গে এসব আনসান বিষয়ে ছাড়া আর কী নিয়ে কথা বলা যায়, তাই তার মাথায় আসে না! রোহিত বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশাখা নালককে ফোন ধরল। ফোন টানা বেজে গেল। নালক ফোন ওঠাল না। এক মিনিট বাদে বিশাখা ফের ডায়াল করল। টেলিফোন তুলল না নালক। সেদিন সারা সন্ধে জুড়ে বিশাখা সাতাশবার নালককে ফোন করল। নালক ফোন তুলল না। ঘড়ি যখন ন'টা ছুঁয়েছে, বিশাখা তখন সম্পূর্ণ ধসে পড়া এক নারী। বিকেলে চা খায়নি,

মুখ ধোয়নি, পাল্টায়নি বাইরের পোশাক। উড়োখুড়ো চুলে তাকে দেখে উন্মাদিনী মনে হচ্ছে... সে মোবাইলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে চুপ করে শুয়ে রইল। নালক কোথায়? কেন সাড়া দিচ্ছে না? ও অসুস্থ? কোনও বিপদ হয়েছে?

সাড়ে ন'টা নাগাদ রোহিত ফিরল। বিশাখা দুরু-দুরু বুকে, বাথরুমে ঢুকে ফোন করতে লাগল। সে তখন ঠিক করে ফেলেছে, নালক যদি ফোন ওঠায়, রাতেই রোহিতকে সব বলে দেবে বিশাখা... যা ঝড় উঠবে সব সামলে নেবে সে। শুধু একটিবার নালকের গলা শুনতে চায় বিশাখা। না, এবার নালকের ফোন ব্যস্ত। অর্থাৎ, নালক অন্য কারও সঙ্গে কথা বলছে। বিশাখার ফোন সে ধরতে চায় না বলেই ধরছে না। কোথাও কোন ধন্দ নেই। নেই কুয়াশা। নালক তার সঙ্গে যোগাযোগ চাইছে না, ব্যস!

রাতের কিছুই খেতে পারল না বিশাখা। ভাতের থালার ওপর কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। রোহিত তখন টোটাল ব্যোমকে গিয়েছে। বউ কাঁদছে, কিন্তু কেন কাঁদছে বলছে না। ঘনঘন মাথা নাড়ছে আর আউআউ করে কী সব বলছে। রোহিত তাকে ছুঁতে গেলে ছিটকে সরে যাচ্ছে। কোথায় গেল সেই বিধ্বংসী নারীবাদী? এ তো সেই চিরাচরিত রহস্যময়ী, ছলনাময়ী, 'বুঝতে নারি' নারী?

জলে নালক, ডাঙায় নালক অবস্থা নিয়ে বিশাখা শুতে গেল। ছেলেটির এই অদ্ভুত, ব্যাখ্যাহীন আচরণ তাকে বিশাখার কাছে আরও বেশি-বেশি অপ্রতিরোধ্য করে তুলল। দিন কাটতে লাগল। নালকের নো পাত্তা! কিন্তু এ তো আর সহজ সরল 'বৈধ' প্রেম নয়। এর সিম্পটম বেজায় ঘোলাটে। নালকের প্রেমে পড়ে, বিশাখা হঠাৎ করে রোহিতাশ্বর প্রতি সাংঘাতিক যত্নবান হয়ে গেল! 'হ্যাঁ গো, না গো' ছাড়া কথা বলছে না।

সামনেই ছিল রোহিতের জন্মদিন। সে রায়চকের একখানা রিসর্টে দু'দিনের একখানা প্যাকেজ বুক করে ফেলল! রোহিতকে তার জন্মদিনের উপহার! এছাড়া শ্বশুরবাড়ির প্রতিও সে যেন রাতারাতি দারুণ মনযোগী! রাতে শাশুড়িকে ফোন করে কুশল জিজ্ঞেস করে। সিরিয়াল দেখে পছন্দ করা শাড়ি কিনে দেয় ননদকে। শ্বশুরকে মেসেজ করে পাঠায় বোকা-বোকা সর্দার জোক! প্রসেনজিৎকে পাঠায় ডিজাইনার পাঞ্জাবি! ফেমিনিস্টের ঝাঁঝ মরে গেল। নালক তার ভিতর জন্ম দিল এক টিমটিমে ঘরেলু গৃহবধূর!

এক রাতে সঙ্গমকালীন রোহিত প্রশ্নটা সোজাসুজি তুলে ফেলল বিশাখার কাছে, "আমি তোকে মাঝে-মাঝে চিনতে পারি না বিশাখা। তুই অনেক বদলে গেছিস!"

বিশাখা কোনও উত্তর দিল না। চোখদু'টো খুলে ফের বন্ধ করে নিল। রোহিত চাইছিল এই বিষয় থেকে কিছু উত্তেজনার জন্ম হোক। সে ফের বলল, "কীরে? কিছু বলবি-টলবি না? তুই এত শান্ত হলি কবে?"

সাড়ে ন'টা নাগাদ রোহিত ফিরল। বিশাখা দুরু-দুরু বুকে, বাথরুমে ঢুকে ফোন করতে লাগল।

বিশাখার মুখটা একটু কুঁচকোল। সে খসখসে গলায় বলল, "যেটা করছিস কর না। এত কথা বলছিস কেন?"

স্বাভাবিক অবস্থায়, রোহিত তার নিজস্ব নারীর মুখে যৌনক্রীড়া-কালীন, আদেশ শুনতে পছন্দ করে। এই ধমকানিতে তার কাম আরও চাগিয়ে ওঠার কথা ছিল, কিন্তু বিশাখার গলায় এমন কিছু ছিল, সে শিথিল হয়ে পড়ল। কুলকুল করে ঘামতে ঘামতে রোহিত অনুভব করল কোথাও একটা বিরাট গন্ডগোল বেঁধে গিয়েছে। রোহিত ভেতরে-ভেতরে ভিতু। সামলে-সুমলে চলা তার ধর্ম। এড়িয়ে থাকা তার দর্শন! ঘামতে-ঘামতে সে বুঝতে পারছিল, বিশাখা আর তার নেই। কিছু প্রশ্ন না করে সে বাথরুমে ঢুকে গেল। বিশাখার দমফোট লাগছিল। তির-তির করে তার ভেতর জন্মাচ্ছিল এক ধরনের অসহায় অপমানবোধ। রোহিত কিছু জিজ্ঞেস করলে সে হয়তো রোহিতকে আঁকড়ে ধরেই তার পিছলে পড়ার গল্পটা বলত। নালক সেই যে হাওয়া হয়ে গিয়েছে, তারপর তার আর টিকি দেখা যায়নি। রোহিত হয়তো তাকে সাহায্য করতে পারত, বিষয়টা ভুলে যেতে। কিন্তু রোহিতের এই বিষণ্ণতা, লুকোচুরি আর এড়িয়ে চলা যেন গোটা বিষয়টাকে একটা অন্য ধরনের গম্ভীর মাত্রা দিয়ে দিল। বিশাখার বেশি-বেশি করে মনে পড়তে লাগল নালকের নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান। বিশাখা মিশে যেতে লাগল অপমানে, গ্লানিতে আর ভালবাসায়। রোহিতের প্রতি, নালকের প্রতি, নিজের প্রতি সে এক অসহ্য মায়ায় আক্রান্ত হচ্ছিল।

অনেক দিন পর বিশাখা কাঁদছিল। বিশাখা ওর বন্ধ চোখের ওপর ফেলে রেখেছিল রোহিতের ছেড়ে যাওয়া পাঞ্জাবি। কখন রোহিত বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে, সে জানতে পারেনি। রোহিতের গলার আওয়াজে সে চোখ আরও তীব্রতায় বন্ধ করে নিয়েছিল।

"আমার পাঞ্জাবিটা দে..."

চোখ বন্ধ অবস্থাতেই বিশাখা পাঞ্জাবিটা এগিয়ে দিয়েছিল। তারপর লাল চোখ মেলে রোহিতের দিকে তাকিয়েছিল। রোহিত পাঞ্জাবিটা মাথার ওপর দিয়ে গলাতে গলাতে বলেছিল, "পাশের ঘরে আছি। ঘুম আসবে না। একটু টিভি দেখি।"

বিশাখা ভাবল, একটু হাল্কা কথা বলে দেখা যাক, হয়তো ঘরের গুমোট ভাবটা তাতে কাটবে। সে বলল, "পাঞ্জাবি তো পরছিস, নীচে তো কিছু নেই!"

রোহিত কোনও উত্তর না দিয়ে, বেড-সাইড টেবল থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার নিয়ে বসার ঘরে চলে গেল। যে-ঝগড়াটা বিপজ্জনকভাবে দুলছিল খাদের ধার বরাবর, রোহিতের এই পদক্ষেপে, সে ধপাস করে জমিচ্যুত হয়ে অনন্ত তলহীনতার দিকে উড়ান দিল।

"তুই কথা বলছিস না কেন, আমার সঙ্গে? আমি কী করেছি রোহিত?" মরিয়া আর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল বিশাখা।

"তুই নিজে উত্তরটা জানিস... আমায় একটু একা থাকতে দিবি প্লিজ?" টিভির রিমোট হাতে তুলে নিয়ে নাক টেনে বলল রোহিত, "কী জানি আমি? কী জানি?" বিশাখা ভাঙা গলায় চ্যাঁচাচ্ছিল।

রোহিত এবার পুরো চোখ মেলে বিশাখাকে দেখল। তারপর খুব অদ্ভুতভাবে হেসে বলল, "আমি কিছু জানতে চাই না... আমি ভিতু লোক। সহ্যই করতে পারব না... আমার এখনও সব কিছুই তুই... আমি পারব নারে... এই পরদাটা থাক। এটা সরাস না।"

একটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ নারী ও একটি অর্ধ উলঙ্গ পুরুষ, যদি ঝগড়া করে, তাহলে দৃশ্য হিসেবে তা একাধারে হাস্যকর ও করুণ। সে রাতে বিশাখা আর রোহিত বিচ্ছিরি ঝগড়ায় ফাঁসল। দু'জনেই কাঁদল অনেক, থুথু ছেটাল ইতস্তত, কে কতটা হারিয়েছে এই বিবাহে তার ফিরিস্তি দিল আর শেষমেশ সঙ্কল্প করল, আবার ভালবাসার চেষ্টা করবে একে অন্যকে।

বিশাখা মনে-মনে বলল, 'নালক, আমি সব অর্থে তোমার.... কিন্তু রোহিত আমায় বড্ড ভালবাসে। আমি ওর কাছে না থাকলে ও ভেসে যাবে... আমি ওকে ভালবাসব। তোমাকে ভুলতে পারব না কোনও দিন। তাও ওকেই ভালবাসব...'

নালকের নরম দাড়ির ওম ভাবতে-ভাবতে বিশাখা আবার সিক্ত হল। আবার যৌনক্রীড়া হল বিশাখা আর রোহিতের। কিন্তু রোহিতের লিঙ্গ আর তত দৃঢ় নয় তখন। রোহিতের মাথার মধ্যে তখন হিংসার বিষ আর সন্দেহের দানা... তার নিজস্ব নারী কি আরও কারও সঙ্গে শুচ্ছে? এই ঘটনার ঠিক সতেরো দিন বাদে, সেদিন ভীষণ বৃষ্টি, বিশাখা কলেজের গেট থেকে বেরিয়ে দেখল, নালক, সম্পূর্ণ ভিজে, গেটের বাঁ-দিকটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোঁফে তা দিচ্ছে।

বিশাখার বুকে কে যেন একটা পাথর গড়িয়ে দিল। একে তো আচমকা এই আগমন। দ্বিতীয়ত, নালককে দেখেই বিশাখা বুঝল, এই ছেলেই তার নিয়তি। তার সর্বনাশ! একে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার ক্ষমতা বিশাখার নেই। হিন্দি ছবিতে একটু বাড়িয়ে দেখায় বটে, কিন্তু সেদিন বিশাখার সত্যি-সত্যিই সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, তার চারপাশের বাস্তব হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। সেন্ট্রাল এভিনিউ খাঁ খাঁ করছে। শুধু গুঁড়ো-গুঁড়ো বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে সে, নালক আর তাদের সর্বনাশা গোলকধাঁধা।

বিশাখা এক পা, এক পা করে এগিয়ে গেল নালকের দিকে। তারপর ওর চোখের দিকে তাকিয়ে গলে গলে মিশে গেল রাস্তার পিচ, ছেঁড়া কাগজ, পানের বোঁটা, পোড়া সিগারেটের ছাই আর বাসের নিঃসঙ্গ টিকিটের সঙ্গে!

সে রাতে বিশাখা আর তার নিজের বাড়ি ফিরে গেল না। রোহিতাশ্বর বাড়ি ছেড়ে সটান চলে এল তার মাসির বাড়ি। যাদবপুরের এক উঠতি বড়লোক পাড়ায় মাসির তিন হাজার স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট। সঙ্গে থাকে তিনটে কুকুর আর এক প্রেমিক।

আর এই প্রেমিকেরই নাম শিবদাস রায়চৌধুরী।

দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য বিশাখা তার মাসি ধীরাকে বলল, সে বাড়িতে শুধু রাতটুকু থাকবে। সারাদিন সে কলেজে থাকবে বা নালকের সঙ্গে প্রেম করবে। ধীরা বোনঝিকে স্মিত হাসি উপহার দিলেন। মুখে কিছু বললেন না।

বিশাখা চিরকেলে ঠোঁটকাটা। সে বলল, "বেশিদিন থাকব না। ট্যাক্সিতে আর নালকের হস্টেলে কতটাই বা কী করা যায় বল? আমি একটা বাড়ি খুঁজছি... বাড়ি পেলেই কেটে পড়ব।"

ধীরা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ঠান্ডা গলায় বললেন, "তোমার মা-বাবাকে জানিয়েছ তো

দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য বিশাখা তার মাসি ধীরাকে বলল, সে বাড়িতে শুধু রাতটুকু থাকবে।

তোমার ডিসিশন?"

বিশাখা দু'দিকে মাথা নাড়ল। নাঃ, রোহিতাশ্ব ছাড়া কাউকেই সে জানায়নি তার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার কথা। নালক জানে, এখন জানল মাসি।

"ওদের অন্তত একটা ফোন করে দাও। রোহিতাশ্বর কাছ থেকে ব্যাপারটা জানতে পারলে ওদের খারাপ লাগবে," বললেন ধীরা।

উত্তরে বিশাখা মুখ বেঁকিয়ে বলল, "রোহিতাশ্ব অতি উইক ক্যারেক্টার। ও মরে গেলেও মা-বাবাকে জানাবে না। বউ ছেড়ে চলে গেছে কথাটা মুখেই আনতে পারবে না ও।"

ধীরা হেসে বললেন, "রোহিতাশ্ব উইক বলেই দিদি-জামাইবাবুকে জানাবে। আশা করবে বুঝিয়ে শুনিয়ে তোমাকে রোহিতের কাছে ফেরত পাঠাবে তারা।"

বিশাখা মাসির কথায় কোনও উত্তর দিল না। ভাবনায় যখন জেরবার সে, তখনই বিশাখার মোবাইল বেজে উঠল। ধীরা ঘরের ভেতরে এতক্ষণ কম্পিউটারে বসে তাঁর কোম্পানির কী একটা ফাইল দেখছিলেন, ফোনটা বাজতেই কম্পিউটার স্ক্রিন থেকে চোখ না সরিয়েই বললেন, "সামলাও এবার নিজের মাকে!"

বিশাখা খচ করে ফোন কেটে দিয়ে চোখ ছানাবড়া করে বলল, "শালা নিশ্চয়ই রোহিত চুকলি খেয়েছে!"

ধীরা তার ডেস্ক থেকে উঠে এসে বিশাখার ফোনটা নিয়ে নিজেই বিশাখার মাকে ডায়াল করলেন। ঠান্ডা গলায় বললেন, "ছোড়দি, আমি বলছি। বিশাখা আমার বাড়িতে। তোমরা চিন্তা কোরো না। কাল সকালে ও ফোন করবে।"

অন্য প্রান্তে কী প্রশ্ন করেছিল জানা নেই, তবে ধীরার বাকি সব কথা শুনছিল বিশাখা মন দিয়ে। ধীরা খুব শান্ত গলায় বিশাখার মাকে সব সত্যি বলে দিচ্ছিলেন!

"না, না ও রোহিতের সঙ্গে থাকতে চাইছে না আর... নালক, নালক নামের একটি ছেলের সঙ্গে ওর সম্পর্ক হয়েছে, সে কারণেই রোহিতের বাড়ি ছেড়ে আমার বাড়িতে এসে উঠেছে। ও নিশ্চয়ই সবই জানাবে। ওকে একটু সময় দে প্লিজ... না, না আমাদের সাপোর্ট বা সাপোর্ট না-দেওয়ার ব্যাপার নয়, এটা, এটা একেবারেই ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার... তুই শান্ত হ একটু..."

কথা বলতে-বলতে ধীরা চলে গেলেন। প্রায় আধঘণ্টা পর যখন ফিরলেন তখন রাগে তাঁর মুখ থমথমে। বিশাখার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী হল? বলেছিলাম না? এটাই ঘটতে চলেছে? আমার ঘাট পেরতে চলল! এখন যদি শুনতে হয় আমায় দেখেই তুমি উচ্ছন্নে যাওয়ার মনের জোর পাও, তাহলে সেটা আমার শুনতে ভাল লাগে না! আমি নাকি অবৈধ সম্পর্কের ইশকুল খুলেছি আমার বাড়িতে!"

উত্তরে বিশাখা বিকট হাসতে লাগল। বলল, "তোমাকে আবার রিং ব্যাক করতে কে বলেছিল? এত খোলাখুলি কথাই বা কে বলতে বলেছে? বেশি সততা দেখাতে গেলে এই হয় ধীরামাসি! এতে কারও লাভ হল না। মা এখন বাবার ওপর হাডিমাডি করবে... রোহিতের সঙ্গে ফোনে চেঁচামেচি করবে... ফালতু অশান্তি! কেন বোঝো না আসলে কেউই সত্যি শুনতে চায় না? মাকে যদি বলতে আমি রোহিতের

সঙ্গে ঝগড়া করে একদিনের জন্য এসেছি, কালকেই ফিরে যাব, মা এখন সিরিয়াল দেখতে বসত। তারপর গোপালকে জল দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে চলে যেত! তুমি হিউমান সাইকোলোজি কিসসু বোঝো না মাসি, এটা স্বীকার করো।"

ধীরা ভ্রু কুঁচকে বললেন, "সত্যিটা চেপে রেখে কত দিন চালাবে বিশাখা? তাছাড়া যা করছ, তা যদি খোলাখুলি নিজের মাকেই না বলতে পার, তাহলে নিজেকে স্বাধীন নারী বলো কেন?"

বিশাখা বেশিক্ষণ মাথা ঠান্ডা রেখে আলোচনা চালাতে পারে না। তার যুক্তি কেউ খণ্ডন করলেই রাগে তার গলা কাঁপতে থাকে। সে ভ্রু কুঁচকে, চোখে জল নিয়ে বলল, "মিথ্যে বলাটা আমার চয়েস। সেটাই আমার স্বাধীনতা। নালকের সঙ্গে আমার ঠিক কেমন সম্পর্ক, সেটা আমি বাইরের কাউকে বলতে যাব কেন? মাকে তো নয়ই... মা আমার কোনও কথা কোনও দিন বোঝেনি, এটাও বুঝবে না। মায়ের মতে, সারাজীবন স্বামীকে গালাগাল দেওয়া যায় কিন্তু তাকে ছেড়ে যাওয়া যায় না! মায়ের ইস্যুগুলোও অত্যন্ত মোটা দাগের। মা বলবে, নালকের চাকরি-বাকরি নেই, ওদিকে রোহিতের বিশাল চাকরি... এসব আউডাটের উত্তর আমি ওদের দেব? আমি নিজেই যথেষ্ট ঘেঁটে আছি ব্যাপারটা নিয়ে, এখন এই সব ফ্রন্ট আমার না খুললেও চলত!"

ধীরা আর কিছু বললেন না। বেডরুম থেকে দু'টো বালিশ এনে বিশাখার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "নালক তো দেখছি ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেছে। ওকে সোফা থেকে তুলে বিছানায় নিয়ে যাও।"

"শিবদাসবাবু আসেননি আজ?"

"না। শিবদাসের মেয়ের সন্তান হয়েছে। শিবদাস আজ ও বাড়িতে থাকবে।"

বিশাখা মৃদু 'ও' বলে বালিশে ঘাড় এলিয়ে দিল। ধীরা নিজের ঘরে চলে গেলেন। শুরু হয় নালক-বিশাখা অধ্যায়।

৭

আজ কলকাতা ভেসে যাচ্ছে বৃষ্টিতে। অকাল বর্ষণের উচ্ছ্বাস সামলাতে পারছে না রাকা। সে এসেছে তার মায়ের কাছে। দুপুরে ইলিশমাছ ভাজা আর খিচুড়ি খেতে চাইল। ঋষিকার বাপের বাড়িতে সরস্বতী পুজোর আগে ইলিশ খাওয়ার চল ছিল না। এরা অবশ্য সে সব মানে-টানে না। এরা ডিসেম্বরেও ইলিশ খায়। ঋষিকার আজ কোথাও বেরনোর নেই। সমুদ্র অফিসে, রুকু ফিরে এসেছে মর্নিং স্কুল সেরে, ঋষিকার প্ল্যান ছিল টানা লেখার। দিনের কোটা শেষ করে একখানা স্প্যানিশ ছবির ডিভিডি দেখার কথা। ওই ছবির গল্প টুকে একখানা টেলিফিল্ম লিখতে হবে তাকে। জে-লোর আদেশ। জে-লোর কাছে এমন বিদেশি ছবির খবর থাকে সব সময়। ইন্টারনেটে গিয়ে ছবি ডাউনলোড করো, দেখো, উনিশ-বিশ পাল্টে টুকে দাও! সস্তায় পুষ্টি আর কী!

রান্নাঘর থেকে এককাপ কফি করে ঋষিকা বেরচ্ছে, হইহই করে রাকা ঢুকে পড়ল। রাকার মুখে আহ্লাদী মার্জারীর সুস্পষ্ট ছাপ। গোলপানা মুখ, বড়-বড় চোখ, সরু করে প্লাক করা ভ্রু। চামড়ায় বড়লোকির জেল্লা। বৃষ্টিতে ভিজেছে বলে শাড়িটা শরীরের সঙ্গে লেপটে আছে। সুখের মেদ দেহ জুড়ে। রাকার আলগা চটক ঋষিকাকে থমকে দেয়। ননদের শরীরের সব ভাঁজের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেয় ঋষিকা। কে বলে মেয়েরা মেয়েদের মাপে না!

"কফি খাবে? এটা নিয়ে নাও। আমি আমার জন্য আর এক কাপ বানিয়ে নিচ্ছি।"

নিজের কফির কাপ ননদের হাতে ধরিয়ে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল ঋষিকা। মনে-মনে বলল, 'ভিজে বেড়াল।'

রাকার সঙ্গে এসেছে উজানবাবু। রাকার ছেলে। উজান আর রুকুর হুল্লোড়ের শব্দ ভেসে আসছে রান্নাঘরে। রান্নাঘরের জানলা দিয়ে ঋষিকা সামনের রাস্তা দেখছিল। বেশ জোরেই নেমেছে। কতক্ষণ চলবে কে জানে? রাতের মধ্যে ফরসা হবে তো? কাল একটা আউটডোর আছে ঋষিকার। টালিগঞ্জ বাজারে এক মিনিটের একটা শট। কিন্তু চড়া রোদ্দুরে না হলে শটটা নেওয়া যাবে না। বাজার কমিটির পারমিশন জোগাড় করতে অনেক ঝামেলা সহ্য করতে হয়েছে প্রযোজককে, কাল শুটিংটা না-হলে আবার কত দিনের জন্য পিছবে কে জানে? নতুন ডেট নিতে যাওয়া মানে আবার এক সেট নতুন ফ্যাসাদ... শুটিং পার্টি দেখলেই জনতা ভাবে কিছু খিঁচে নেওয়া যাক! ঋষিকার ভ্রু কুঁচকে আবার সোজা হয়। আজকাল তার ভাষায় কী ছিরি হয়েছে! 'খিঁচে' নেওয়ার মতো শব্দ কী অবলীলায় মাথায় আসে তার!

শহর তাকে গড়েপিটে ভালই মানুষ করেছে! কালকের আউটডোরটা একটা সিনেমার শুটিং। 'দেবুর মা' হয়ে সে মাছ কিনছে বাজার থেকে, এই হল মোদ্দা কথা। তারপর সে আর ফ্রেমে নেই। আছে মাছের রক্ত, আঁশ, পটকা, কানকোর ক্লেজঅআপ। তার চোখ এসব দেখছে নির্নিমেষে আর ফিরে যাচ্ছে তার ফেলে আসা জীবনে। ফ্ল্যাশব্যাক।

এই চরিত্রটি অর্থাৎ, দেবুর মা একদা ছিল গেরস্ত বাড়ির বউ। অবস্থার ফেরে এখন লোকের বাড়ির ঝি। দেবুর বাবা, এককালের মাছের কারবারি, এখন খুনের আসামি। মাছ কাটার বঁটি দিয়ে নিজের বড় দাদাকে কুপিয়ে মেরেছে। জেলে বন্দি এখন... সে এক দারুণ ঘোরপ্যাঁচওয়ালা গপ্পো! মাছের বাজার, মাছ, কাটাকুটি নাকি মোটিফের মতো বারবার ফিরে আসবে ছবিতে। সে আসুক, কিন্তু কাল আদৌ শুটিং হবে তো?

কফি নিয়ে ঋষিকা শাশুড়ির ঘরে গেল। শাশুড়ির খাটে রাকা জমিয়ে বসেছে। বউদিকে দেখে হইহই করে উঠল, "এসো ঋষিকা, আজ শুধু কফি আর জম্পেশ আড্ডার দিন, কী বলো? জনিটা এত বেরসিক, কতবার বললুম, কিছুতেই অফিস কাটতে রাজি হল না! বিয়ে করলেই ছেলেগুলো এমন পাল্টে যায়!"

উত্তরে ঋষিকা মিষ্টি হাসল। ভেঙে বলল না, সে কফি খেয়েই উঠে পড়বে। সারাদিন পিএনপিসি করার মতো সময় বা সুযোগ সত্যিই তার নেই। সে শ্বশুরবাড়ির মন রাখতে কফিটা শুধু একটু বেশি সময় নিয়ে শেষ করবে। অবশ্য তাতে লাভ হবে না। সে ঘর ছাড়া মাত্রই তাকে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে যাবে। তবু, এইটুকু দেখনদারি করতেই হয়। এর চেয়ে বেশি নির্মম হতে ঋষিকার আটকায়।

"তোর শাশুড়ি বসাকের থেকে ক'টা শাড়ি রাখলেন রে এবার? বসাক সেদিন ফোন করেছিল, বলল উনি ডেকে পাঠিয়েছেন।"

"একটা জলপাই রঙের যা শাড়ি এনেছিল না বসাক, ভাবতে পারবে না! জাস্ট টু গুড! সাত হাজার টাকা নিল বটে, বাট, আউট অফ দিস ওয়ার্ল্ড!"

ঋষিকা অন্যমনস্ক হয়ে গেল। মেয়ে হয়ে শাড়ির গল্প তার ভাল লাগার কথা, অথচ তার ভাল লাগছে না... তার মনে হচ্ছে, এখানে কেউ কারও কথা শুনছে না.... দু'জনেই আসলে নিজের সঙ্গে কথা বলছে! তাছাড়া রাকার শাশুড়ির তিন আলমারি ভরতি শাড়ি, তবু তাঁর শাড়ি কেনার বিরাম নেই। কোথায় পরেন অত শাড়ি? কে দেখে তাঁর সাজ?

ঋষিকা নিজের ওপরই বিরক্ত হয়। এই সব ভাবনার কোনও মানেই নেই। এই জন্যই সে দিন দিন একা হয়ে যাচ্ছে। এই যে রাকা, একজন উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে, সব পেয়েছির দেশে ওর বাস, তবু শাড়ি আর সংসারের কূটকাচাল ছাড়া কোনও গল্প নেই! অতি সুখে বৈরাগ্য না আসুক, এত অকর্মণ্য জীবন নিয়ে তার হাঁসফাস লাগে না? কীভাবে ও সারাদিন? কর্মহীন,

চ্যালেঞ্জহীন, রঙিন জীবন? ভাল লাগে? ধীরা ওকে একটা এনজিও-র সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন। তারা নাইট স্কুল চালায়, রাকাকে সপ্তাহে তিনদিন গিয়ে সেই স্কুলে পড়াতে হবে। রাকা যেতে রাজি হল না। সন্ধেবেলা জনিকে বাড়িতে রেখে সে কোথাও কাজ করতে যেতে চায় না! অথচ জনি যে বাড়িতে ফিরে রাকাকে বিরাট সময় দেয়, তাও নয়। সে আবার খেলা-পাগল ছেলে। অফিস থেকে বাড়ি এসেই টিভির সামনে বসে পড়ে। ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, হকি না পেলে সে মোটা-সোটা দাড়িওয়ালাদের কোস্তাকুস্তি দেখে! রাকা বরের পাশে বসে থাকে। একে-ওকে-তাকে মোবাইলে ফোন করে আড্ডা দেয়। হয়তো রাকার কাছে এটাই বরের কাছাকাছি থাকা!

ঋষিকা এবার নিজেকে বকুনি দিল। আহা, সেও বুঝি এমনটা ছিল না একসময়! রাকার নতুন বিয়ে হয়েছে, এখন তো ওর বরের গা-গেঁষে থাকারই সময়... শুধু-শুধু ওর ওপর রাগ করছে ঋষিকা। কফির কাপে চুমুক দিয়ে ঋষিকা একটা শ্বাস ফেলল। আসলে ননদকে নিয়ে ঋষিকার একটু জ্বালা আছে... কাপটা নামাতে গিয়ে আড়চোখে আবার ঋষিকা রাকার শরীর লক্ষ করে। লোভনীয়।

নাঃ, ওকে কেউ কোনও দিন ঝিয়ের রোল দেবে না। ও শুধু নায়িকার রোলে সাজবে আর নাকিকান্না কেঁদে নায়কের বক্ষলগ্না হবে।

কফি শেষ। ঋষিকা আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল।

"চললে কোথায়?" রাকা ভ্রু নাচিয়ে প্রশ্ন করল।

"ওমা, ও কি আর আমাদের মতন বেকার নাকি? ওর লেখা আছে না!" আনন্দীর গলা মোলায়েম, স্নিগ্ধ।

ঋষিকা হাসি দিয়ে ম্যানেজ করে নেয় পরিস্থিতি। তারপর কফির কাপগুলো নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

"তুমি কি একদম খাওয়ার সময় নামবে?" রাকা ফের প্রশ্ন করল।

"দেখি...তাড়াতাড়ি হয়ে গেলে আগেও নামতে পারি... জাগরীর ফোনটা আসুক, তখন বুঝতে পারব," অন্যমনস্ক গলায় বলল ঋষিকা।

"তুমি তো ইলিশ দিয়ে ভাত পছন্দ করো, আমি তোমার জন্য আলাদা করে ভাত বসাতে বলেছি। আর তেলটাও রাখতে বলেছি।"

আনন্দী আজ খুব ভাল মুডে বোঝা যাচ্ছে। ঋষিকা খিচুড়ি দিয়ে ইলিশমাছ একদম ভালবাসে না, ভালবাসে ইলিশ ভাজার তেল দিয়ে ভাত মেখে খেতে। এসব মনে রেখেছেন তিনি।

ঋষিকার একটু লজ্জাই লাগে। এরা সব দোষে গুণে মিলিয়েই মানুষ। তার নিজের চেহারার কমপ্লেক্সের কারণে শুধুশুধু সে এদের সন্দেহের চোখে দেখে সব সময়। এটাও ঋষিকার এক বৈশিষ্ট্য। সব পরিস্থিতিতেই সে নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করে। এতে তার ব্যক্তিত্ব মার খায় বটে, তবে শান্ত থাকতে পারে মন। লেখার জন্য সেটা জরুরি। রাকা আর তার পুত্রের এ বাড়িতে আগমন মানেই ঋষিকার ছাদের ঘরে অন্তর্ধান। এটাই এ বাড়ির অলিখিত নিয়ম।

লেখালিখির জন্য ঋষিকার কিছু আলাদা স্পেস দরকার বা প্রয়োজন, ননদ বা শাশুড়ির সেটা মাথায় থাকে না। এ বাড়ির একতলা একটা ব্যাঙ্ককে ভাড়া দেওয়া। দু'তলায় তিনটে ঘর। একটা শ্বশুর-শাশুড়ির বেডরুম। আপাতত সেটাতেই রাকা আর আনন্দী গল্প জুড়েছেন। বিয়ের আগে যেটা রাকার ঘর ছিল, সেটায় এখন রাতদিনের কাজের মেয়েটা থাকে। অন্য ঘরটা বাড়ির ড্রয়িংরুম। সেখানে শ্বশুরমশাই তাঁর ইনভেস্টমেন্ট এজেন্টের সঙ্গে গম্ভীর মুখে টাকায় কেমন টাকা বাড়ে, তার গল্প শুনছেন।

উজান আর রুকু, তিনতলার একটিমাত্র ঘরটার দখল নিয়েছে। এই ঘরটিই ঋষিকার ঘর। কিন্তু বাচ্চাগুলোর চেঁচামেচির মধ্যে তার লেখা হবে না। অগত্যা চিলেকোঠা। তিনতলায় তার ঘর আর বাথরুম ছাড়া বাকিটা খোলা ছাদ। সেখানে দোলনা আছে, আছে বাগান।

ঋষিকা জায়গাটা নিজের মতো সাজিয়েছে। পোড়ামাটির মূর্তি, মাদুর, মুখোশ আর ডোকরার পুতুল দিয়ে দারুণ সুন্দর তার ঘরের লাগোয়া ছাদ। সমুদ্রের অফিসের বন্ধুরা সস্ত্রীক এলে, এখানেই বসা হয়। 'ইকো-ফ্রেন্ডলি' জায়গায় নাকি মদ্যপান ভাল জমে। রাকা আর তার ছেলে যেহেতু প্রায়ই এসে পড়ে, তাই চিলেকোঠার সাদামাটা, এলেবেলে ঘরটার শ্রী ফিরিয়েছে ঋষিকা। এখানে বসে লিখতে তার খারাপ লাগে না। জে-লোর মতে, ঋষিকা ছাদের ঘরে বসে লিখলে, এপিসোডগুলো নাকি বেশি খোলে!

মাঝে মাঝেই শুটিং-এর ফাঁকে জে-লো ফোন করে তাকে বলে, "গুরু, সাতান্ন নম্বর পাতাটা তুমি ছাদে গিয়ে রি-রাইট করো... তেমন জমেনি... ওই ঘরে পা দিলেই দেখবে বিদ্যুৎ চমকের মতন তোমার মাথায় নানা আইডিয়াজ় আসতে থাকবে।"

জে-লো এই ঘরের নাম দিয়েছে স্পার্ক রুম। এই ঘরটা নিয়ে ঋষিকার মধুর স্মৃতিও কম নেই। তার বিয়ের পর সমুদ্র প্রায়ই তাকে নিয়ে এই ঘরে আসত, প্রেম করতে। নিলিমাসিমার ছেলের বিয়েতে পুরো বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল। সমুদ্র আর ঋষিকা যায়নি। ঋষিকার জ্বর হয়েছিল। জ্বোরো বউকে সে রাতে সমুদ্র খুব আদর করেছিল। ঋষিকার ধারণা, সে রাতেই সে রুকুকে কনসিভ করে। সেই গল্পটা শুনে জে-লো বলেছিল, "তাহলে ওই ঘরটাকে স্পার্করুম না বলে স্পার্মরুম বলা যেতে পারে।"

ঋষিকা এ ধরনের কথা খোলাখুলি বলতে একদম অভ্যস্ত নয়। সে কথাটা শুনে বেজায় লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল। এখন অবশ্য ঋষিকা অনেক পাল্টেছে। কথায়-কথায় লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে ফেলে না।

ঋষিকার আর-একটা লেখার ঠেক হল বোধিরূপের শান্তিনিকেতনের বাড়ি। এখন ইন্টারনেট হয়ে কত যে সুবিধে! রুকুর স্কুল টানা তিনদিন ছুটি থাকলেই মা মেয়েকে নিয়ে সটান সে বাড়িতে হাজির হয়। সঙ্গে ল্যাপটপ। সমুদ্রের ছুটি থাকলে সেও চলে যায় ঋষিকার সঙ্গে। সঙ্গে বোধিরূপ।

বোধিরূপের বাড়িতে কলাভবনের একটি ছেলে থাকে। কৃষ্ণ নাম। কায়দা করে বলে ক্রিশ। সেই ক্রিশের সারা গায়ে গয়না। লেখা হয়, হইহই হয়, আড্ডা হয়। ভাল কাটে দিন। রোগা, কালো ঋষিকা তার ভাগ্যের এই বদান্যতায় মনে মনে কৃতজ্ঞতায় নুইয়ে পড়ে। এতটা বুঝি তার প্রাপ্য ছিল না জীবনের কাছে।

বোধিরূপের বাড়িটা বিশ্বভারতীর ক্যাম্পাসে নয়। বল্লভপুর-ডাঙা বলে বিশ্বভারতীর গা-ঘেঁষে একটা গ্রামে। ছড়ানো ধানখেতের মাঝে সে বাড়িটায় থাকতে রুকুও খুব পছন্দ করে। একবিঘে জমির ওপর বাড়িটা কিন্তু খুবই ছোট। কিন্তু পুকুর আছে, বিশাল বাগান আছে, রুকু সেখানে গিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। একবার সিকিমে বেড়াতে যাওয়ার পথে, ঋষিকা মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিল তার বাপের বাড়ি দেখাতে। রুকু তখন আরও ছোট। বাড়িটা অবাক চোখে দেখে বলেছিল, "মাম্মা, দাদু-দিদু কি খুব গরিফ, গরিফ?"

রুকু ছোটবেলায় জোর দিয়ে কিছু বলতে চাইলে বা উত্তেজিত হয়ে উঠলে একটা শব্দ দু'বার ব্যবহার করত। আর 'গরিব' শব্দটা বোধহয় ঠিকঠাক জানা ছিল না, গরিবকে বলত গরিফ! কথাটা শুনে সমুদ্র আর ঋ হেসেছিল। সমুদ্র বেশি। ঋষিকা কম। ঋ

মেয়েকে জাপটে ধরে বলেছিল, "ভীষণ গরিফ... তোমার মাম্মাও তো গরিফ! কিন্তু তোমার বাবাই গরিফ নয়!"

রুকু রহস্যমাখা গলায় বলেছিল, "গরিফদের বাড়িতে মশারি থাকে। আর সেই মশারির ভিতর বাঘ!"

সমুদ্র মেয়ের কথা শুনে গদগদ! এ তো একরত্তি মেয়ে নয়, এ তো জিনিয়াস, এমন ভাব করে সে দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, "রুকু! এটা তো দারুণ বললি রে! ভাবা যায় না!"

ঋষিকা হাসতে গিয়েও হাসতে পারেনি। মশারির মধ্যে বাঘ! এমন অদ্ভুত দৃশ্য ও কল্পনা করল কেন? কীভাবে? ঋষিকার চোখে এক লহমায় জল এসে গিয়েছিল। কথাটা বলে রুকু দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। মেয়ের পিছনে-পিছনে হাসতে-হাসতে সমুদ্র। ঋষিকা অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের বিক্রি হয়ে যাওয়া বাড়ির সামনে। বাড়ির সামনের ঝাঁকড়া কৃষ্ণচূড়া গাছটা একইরকম রয়ে গিয়েছে আজও। গাছটার কি কথা ছিল না আরও একটু হাত বাড়িয়ে দেওয়ার, ছাপিয়ে ওঠার? কে জানে, গাছটা, এতদিন পরও কেন সেই মাপ মতো, ঠিকঠাক?

বাবা মারা যাওয়ার পর রক্তিম আর মাসি এসেছিল বাড়িতে। ছাদে বসেছিল সে আর রক্তিম... ঋষিকা অঝোরে কাঁদতে-কাঁদতে গেয়েছিল, 'তুমি কিছু দিয়ে যাও...' রক্তিমেরও গানটা মুখস্থ ছিল বোধহয়। 'বেদনা হতে বেদনে' গাওয়ার সময় রক্তিম গলা মিলিয়েছিল... সেই মাসির শেষ এ বাড়িতে আসা।

মাসির সঙ্গে মায়ের কোনও একটা বিষয়ে মন কষাকষি হয়েছিল, ঠিক কী বিষয়ে, তা মা কোনওদিন বলেনি তাকে। ঋষিকার আন্দাজ, তার আর রক্তিমের সম্পর্কটা মাসি হয়তো আন্দাজ করেছিল। রক্তিম হায়ার সেকেন্ডারিতে খুব খারাপ রেজাল্ট করেছিল। উত্তরবঙ্গের কোনও সাধারণ কলেজে ভরতি হয়েছিল রক্তিম। কী আশ্চর্য! যেই ছেলের তাগিদে, উদ্দীপনায়, সাধারণ ঋষিকা হয়ে উঠল সিরিয়াস, সেই ছেলেই কি না প্রেমে পড়ে জীবনটাকে নষ্ট করে ফেলল! তারপর তার কী হল, কে জানে? হয়তো বেজায় সামান্য চাকরি করে কোনও মফস্সলে! কবিতা, সাহিত্য হয়তো কবেই ছেড়ে চলে গিয়েছে তাকে। মাসিও কি বেঁচে আছে? আর কলকাতার কলেজে পড়তে গিয়ে রক্তিমকেও যেন কী অবলীলায় ভুলে গিয়েছিল ঋষিকা।

সেবার সিকিমের ট্রিপটা অসামান্য হয়েছিল। নর্থ সিকিম যে এত সুন্দর তারা জানতই না। হোটেলটাও ছিল সাহেবি কায়দায়। রুকু খুব আনন্দ করেছিল। সারাদিন হুটোপাটি করত আর সন্ধে হলেই এলিয়ে ঘুমোত। সমুদ্র অবশ্য সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে ছাড়েনি! কলকাতায় ফিরে ঋষিকা ইউরিন টেস্ট করতে দিল। যা ভেবেছিল, তাই। আবার অন্তঃসত্ত্বা সে। কিন্তু সমুদ্রের তখন মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। ঋষিকারও সায় ছিল না অত তাড়াতাড়ি আবার শারীরিক ধকল নেওয়ার।

রুকুও তখন মোটে আড়াই...বাচ্চাটা রাখেনি ওরা।

হেমাঙ্গিনী নস্কর।

বাপের বাড়ির কথা ভাবতেই ঋষিকার মনে পড়ে গেল জগরীকে জিজ্ঞেস করতে হবে, কে এই হেমাঙ্গিনী? তার বাড়ির সামনের সেই শ্যাম্পু নয়তো? কাল রাতে জে-লোকে ইচ্ছে করেই ফোন করেনি ঋষিকা। ওর পার্টি থেকে যখন সমুদ্রর ক্লাবে আসছে সে, তখনই জে-লোর কথা মদের তোড়ে দুলে দুলে উঠছে! দল বেঁধে চন্দননগর যাওয়ার প্ল্যান হচ্ছে শুনেছিল ঋষিকা। গঙ্গার ধারে বসে মদ্যপান করার প্ল্যান। যেন কলকাতায় গঙ্গা নেই!

আসলে সে সব নয়... জে-লো এখন একজন প্রাক্তন ফুটবলারের সঙ্গে প্রেম করে। সেই লোক থাকে চন্দননগর... ঋষিকা জানে না কাল জে-লো আর তার সাঙ্গোপাঙ্গ সত্যি-সত্যিই চন্দননগর চলে গিয়েছিল কি না! মদ্যপান করে অনেক আগড়ম-বাগড়ম প্ল্যান হয়। ফাইনালি সেসব অনেক সময়ই টেকে না। জে-লো কখন ফোন করবে?

ঋষিকা ঘড়ি দেখতে গিয়ে অধৈর্য হয়ে পড়ল...ছাদের ঘরে বসে ঋষিকা এখন পা দোলাচ্ছে। অপেক্ষা করছে জে-লোর ফোনের জন্য। ফোন কল সেরে লিখতে বসবে। তার আগে মাথার মধ্যে সাজিয়ে নিচ্ছে চরিত্রগুলোর সম্ভাব্য সংলাপ... তাদের রোড-ম্যাপ...

পা নাচানো বন্ধ করে ঋষিকা ঘরের কোণে রাখা বাতিল বুক শেল্‌ফটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পুরনো ম্যাগাজিন, রুকুর ছেঁড়া রং করার খাতা, সমুদ্রের অফিসের ফেলে দেওয়া কাগজ, ঋষিকার লেখার খাতা, ধুলো, চুয়িংগামের খালি প্যাকেট... ঋষিকা একটা লিটল ম্যাগাজিন টেনে বের করল সেই ডাঁই থেকে। আর তার পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে আশ্চর্যভাবে পেয়ে গেল বিতানের একটা লেখা।

প্রেমের পদ্য!

তবে কেন সবাই বলে বিতান রাজনৈতিক কবিতায় ফাটাফাটি? কাকে বলে রাজনৈতিক কবিতা? ঋষিকা জানে না। গরগরে রাগী স্লোগান ঠাসা লেখা? সে তো প্রোপাগান্ডা! তা কবিতা হবে কেন? রাজনৈতিক চেতনা বা বিশ্বাস কারও লেখায় ফুটে বেরলেই সে রাজনৈতিক লেখক? এসব কথার কোনও মানে আছে নাকি? প্রেমের কবি, রাজনীতির কবি, যুদ্ধবিরোধী কবি, লিরিকাল কবি... যত সব ফালতু ট্যাগ!

ঋষিকা মুগ্ধ হয়ে 'রাজনৈতিক কবির' প্রেমের কবিতা পড়তে শুরু করল। বেশ মিষ্টি লেখা তো। প্রেমের কবিতার খেলাচ্ছলে এভাবে লোকাল পলিটিক্স ঢোকাতে বিতানই পারে। এত ভাল লিখত যে লোক, সে কেন জীবন থেকে এভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল, কে জানে? ঋষিকার শ্বাস পড়ল। ম্যাগাজিনটার ধুলো-টুলো ঝেড়ে নিল সে। বিতানের জন্য একটা শোকসভার আয়োজন করছে জে-লো। ঋষিকা ঠিক করল এই কবিতাটাই সে সভায় পড়বে।

জে-লোর ফোন এল মিনিট দশেকের মধ্যে। জরুরি আলোচনা সেরে ঋষিকা চুল খাড়া-খাড়া করে লিখতে বসে গিয়েছিল দশটার কিছু আগেই। তারপর তার আর হুঁশ ছিল না।

আবহাওয়াবিদের বক্তব্য, ডিপ্রেশন। বেলা সাড়ে এগারোটায় চারপাশ যখন ছেয়ে ফেলেছে সন্ধেবেলার আঁধার, তখনও ঋষিকা সেই অসহ্য সুন্দর আলো আঁধারি অগ্রাহ্য করে ঘাড় গুঁজে লিখে চলেছে লাইনের পর লাইন।

"এত অন্ধকারে লিখছ কী করে?"

উড়োখুড়ো চুল আর শুকনো মুখের কালো মেয়েটা প্রথমটায় যেন চিনতেই পারল না সমুদ্রকে!

সমুদ্র!

সকালবেলা, অফিসের দিনে বাড়িতে সমুদ্র!

ঋষিকা ভ্যাবলার মতো তাকিয়ে রইল সমুদ্রের দিকে। সমুদ্র ঘরের আলোটা জ্বালাল। ঋষিকার মুখে তখন আরও বেশি আলো। সে ভীষণ উজ্জ্বল হেসে লেখার টেবল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এত সুন্দর দিনটা বলেই সমুদ্র তাকে চমকে দিতে বাড়ি ফিরে এসেছে? ঋষিকার পরনে রংচটা কাফতান। লম্বা চুলটায় হাতখোঁপা বেঁধে সে হাসতে-হাসতেই সমুদ্রের কাছে এগিয়ে এল,

"আমি এখনও স্নান-টান কিছু করিনি। আমায় খুব বাজে দেখাচ্ছে না?"

সমুদ্রের গলার টাইটা হাতে জড়িয়ে নিয়ে ঋষিকা মুখ তুলে তাকাল সমুদ্রের মুখের দিকে। আর সঙ্গে-সঙ্গেই তার মুখের সব আলো দপ করে নিভে গেল! সমুদ্রের মুখে

এমন কালি মাখাল কে? চুলগুলোয় যেন ঝড় উঠেছে। সমুদ্র দাঁত দিয়ে তার ঠোঁট কামড়ে কান্না চাপছে? এ কে? এই সমুদ্র তার স্বামী?

ঋষিকার চোখ বড় হয়ে গেল। সে সমুদ্রকে জড়িয়ে ধরে ভয়ার্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "কী হয়েছে তোমার?"

সমুদ্রের নাক লাল হয়ে আছে। সে নাক টেনে বলল, "আমি হয়তো চাকরি ছাড়তে বাধ্য হব মিঠু। তুমি... তুমি কিছুদিন কষ্ট করে চালিয়ে নিতে পারবে না?"

ঋষিকা থমকে গেল। মুখ তুলে দেখল সমুদ্রের চোখ বন্ধ। সে যেন প্রবল চেষ্টায় ভিতরের ভাঙচুর সামাল দিচ্ছে। ঋষিকা কোনও কথা বলল না। বড় করে শ্বাস নিল। চোখ বুজে ফেলল নিজের অজান্তে। বুকের ধুপধাপ সামলাতে চেষ্টা করল। তারপর স্বামীর হাত ধরে তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিল।

এই ঘর আসলে বাড়ির স্টোররুম। বাড়তি আর ঝড়তি-পড়তি সব জিনিস থাকে এই ঘরে। বাড়ির অতিরিক্ত স্ট্যান্ডিং ফ্যানটাও এ ঘরে রাখা। সমুদ্র বেশ বেশি রকমের ঘামছিল। ঋষিকা ঝটপট পাখাটা প্লাগ ইন করে সেটার মুখ সমুদ্রের দিকে ঘুরিয়ে দিল। কাফতানের ঝলঝলে হাতা দিয়ে মোছানোর চেষ্টা করল সমুদ্রের মুখ।

সমুদ্র তার হাত দিয়ে ঋষিকার কোমর জড়িয়ে ধরে তার পেটের ওপর মাথা রেখে কাঁদছে, "সরি, সরি, সরি মিঠু..." বলতে থাকল সে, বলতেই থাকল।

ঋষিকা হতবাক। আর তাই খেয়াল করল না, সমুদ্রের কথা জড়িয়ে আসছে, হাত হয়ে পড়ছে শিথিল। ঋষিকার কাফতানের সামনেটা সমুদ্রের চোখের জলে একদম ভিজে গিয়েছে।

ঋষিকা সমুদ্রের মাথায় হাত রেখে বলল, "তুমি শান্ত হও। ঠান্ডা হয়ে বোসো, প্লিজ... সমুদ্র... আমি আছি তো, তুমি এমন কোরো না... আর বড্ড ঘামছ তুমি, শরীর খারাপ করবে এবার... সমুদ্র... সমুদ্র..."

সমুদ্র মাথা তুলল না। কেমন ঘোলাটে, এলানো গলায় বলল, "ঋষিকা, মন শক্ত করো। আমি তোমায় একখানা কঠিন কথা বলব এখন। আমার বুকটা... বুকটা ভেঙে যাচ্ছে... আমি কোনও দিন চাইনি এই দিনটা আসুক... হয়তো মরে গেলে ভাল হত... কিন্তু... কিন্তু সাহস হল না মিঠু.... মরতে সাহস লাগে... আমি মরে যাইনি... আমি বেঁচে আছি। কিন্তু কেন? কেন?"

ঋষিকা এবার সত্যি ঘাবড়ে গেল। সমুদ্রের মুখে মরার কথা! এ যে অবিশ্বাস্য! সমুদ্রের মতো ঠান্ডা মাথার ছেলে ঋষিকা আর একটাও দেখেনি। সে বলছে মরতে চায়!

ঋষিকা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর ছুটে চলে গেল তার শ্বশুর আর শাশুড়িকে খবর দিতে। রাকা-সহ চারজন যখন আবার চিলেকোঠায় ফিরল, তখন সমুদ্র চেয়ার ছেড়ে মাটিতে শুয়ে আছে। সংজ্ঞাহীন। আনন্দী হাউমাউ করে কাঁদছেন। শ্বশুরমশাই মাথায় হাত দিয়ে ছেলের পাশেই ধপ করে বসে পড়লেন। রাকা ওর মোবাইল থেকে পারিবারিক চিকিৎসক ডক্টর মৈত্রকে ফোন করে দিল। বাচ্চাদু'টো কোলাহল শুনে উপরে উঠে এসেছিল। ঋষিকা দাঁতে দাঁত চেপে তাদের নিয়ে নীচে চলে গেল। তার চোখ দিয়ে একফোঁটা জল বেরচ্ছে না, তার সারা শরীর যেন অবশ হয়ে আসছে ধীরে-ধীরে...

"বাবাই একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে রুকু, তুমি আর উজান..." ছাদ থেকে ঝড়ের গতিতে নামল রাকা।

"ডাঃ মৈত্র অপারেশন করছেন। ওনার সেক্রেটারি ফোন ধরেছিল। ইমিডিয়েটলি হসপিটালে রিমুভ করতে হবে দাদাকে... আমি আন্টিকে ফোন করেছি... অ্যাম্বুল্যান্স আসছে... বউদি, তুমিও রেডি হয়ে নাও... মা থাকছে বাচ্চাগুলোর সঙ্গে... কুইক..."

এসব কথা শোনার পর ঋষিকার চলন-বলন ঠিক যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো হয়ে গেল। সে বাড়ির পোশাক ছাড়ল, সালোয়ার-কামিজ পরল, চুলে চিরুনি দিল, মেয়েকে আর ননদের ছেলেকে জড়িয়ে ধরে আদর করল, আলমারি খুলে টাকা বের করল। তারপর চিলেকোঠার ঘরে গিয়ে সমুদ্রের হাত ধরে স্থির বসে রইল। আসলে হয়তো মিনিট দশেক, কিন্তু এসব সময় মনে হয় অনন্তকাল... ধীরার পাঠানো অ্যাম্বুল্যান্সে সমুদ্রকে যখন তোলা হল, তখনও ঋষিকার চোখ খটখটে শুকনো। অ্যাম্বুল্যান্সে বসার সঙ্গে সঙ্গে ঋষিকার ফোন বাজল। বোধিরূপ।

"সমুদ্র ফোন ধরছে না... ও কোথায় জানো?"

ঋষিকা এবার কেঁদে উঠল। এতক্ষণ যেন বোধির জন্যই মনে মনে ও অপেক্ষা করছিল, "বোধি...বোধি...তুমি এক্ষুনি চলে এসো... আমরা ডেল্টা নার্সিংহোমে নিয়ে যাচ্ছি ওকে... আই থিঙ্ক... আই থিঙ্ক... তুমি চলে এসো বোধি... রাইট নাও... আমি পারব না... সমুদ্রকে ছাড়া... সমুদ্র, সমুদ্র..."

বোধিরূপ হয়তো সবটা শুনল না। ঋষিকা কেঁদেই চলেছিল ফোনে। রাকা ওর হাত থেকে ফোনটা নিয়ে নিল। তারপর শক্ত করে তার বউদিকে জড়িয়ে ধরে বসল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডেল্টায় পৌঁছে গেল ওরা। এই অভিজাত হাসপাতালের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের একজন ধীরার দাদা। অ্যাম্বুল্যান্স হাসপাতালের গেটে থামতেই তৎপরতা শুরু হয়ে গেল। লবিতেই ডাক্তার অপেক্ষা করছিলেন। পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রকে নিয়ে আইসিইউতে চলে গেলেন ডাক্তারবাবু।

সমুদ্রকে নিয়ে ট্রলি লিফ্‌টে ঢুকল, লিফ্‌টের দরজা বন্ধ হল... ঋষিকা ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল। রাকা আর সমুদ্রর বাবা মিলে ভরতি করানোর ফর্মালিটি সারছিলেন, ঋষিকা মাটিতে কতক্ষণ বসেছিল স্থাণু, ওর খেয়াল ছিল না। রিসেপশন থেকে বেরিয়ে রাকা তারপর ফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, ঋষিকা তখনও ওভাবেই বসে।

পরপর দু'টো গাড়ি এসে থামল হাসপাতালের গেটের সামনে। একটা থেকে নামল বোধিরূপ। অন্যটার থেকে জনি আর ধীরা। বোধিরূপ ছুটে এসে ঋষিকাকে জড়িয়ে ধরল। তারপর তাকে মাটি থেকে টেনে তুলে চেয়ারে বসাল। ঋষিকা দেখল, বোধিরূপ, বাচ্চা ছেলের মতো কেঁদে চলেছে।

ধীরার এমন ধারাল ব্যক্তিত্ব, প্রথম দর্শনেই অচেনারাও ধীরাকে সমীহ করতে শুরু করে। ধীরা রিসেপশনের দিকে এগিয়ে গেলেন। বসে থাকা স্টাফেদের কিছু বললেন। তারপর আলতো ঘাড় নেড়ে ঋষিকার পাশে এসে বসলেন।

লিফ্‌ট বারবার উঠছিল, নামছিল। ঋষিকা বোধিরূপের হাত ধরে বসে দেখছিল লিফ্‌টের ওঠা নামা। আসলে দেখছিল না। তাকিয়ে ছিল মাত্র! লিফ্‌ট থেকে একজন ডাক্তার নামলেন। তাকালেন তাদের দিকেই। তারপর হাত তুলে ধীরার দিকে ইঙ্গিত করলেন। ধীরা উঠে দাঁড়ালেন, এগিয়ে গেলেন। পিছনে পিছনে রাকা আর তার বাবা। ঋষিকার একবারও মনে হল না তারও ওঠা উচিত। সে যেমন বসেছিল, তেমনই বসে থাকল। আর বোধিরূপ। সেও যেন সমুদ্রের স্ত্রীর মতোই বোধহীন, চলৎশক্তিহীন!

ডাক্তারবাবু নিজেই পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন এই মূর্তিবৎ যুগলের দিকে।

"মিসেস মুখার্জি.."

ঋষিকা নয়। বোধিরূপ বলে উঠল, "অ্যাঁ!"

ডাক্তারবাবু গলা খাঁকরিয়ে বললেন, "মিসেস মুখার্জি, ইয়োর হাজব্যান্ড হ্যাজ হ্যাড আ সেরিব্রোভাসকুলার... আই মিন সেরিব্রাল অ্যাটাক... থার্টি থ্রিতে দিস ইজ় নট ভেরি কমন... এনিওয়ে, অপারেশন ইজ় অন। উই উইল রিমুভ দ্য ক্লট বাই সার্জারি.... প্লিজ় বিলিভ ইন আস অ্যান্ড

গড.... এভরিথিং শুড বি ফাইন... মিসেস মুখার্জি, আপনি শক্ত থাকুন... প্লিজ... উই আর ট্রায়িং আওয়ার বেস্ট।"
ঋষিকার কাঁধে পেশাদার টোকা মেরে ডাক্তার ফের লিফ্‌ট-বাহিত হয়ে ওপরে উঠে গেলেন। ঋষিকা ভ্যাবলা মুখে কথাগুলো শুনল। বোধিরূপের হাত ধরে যেমন বসে ছিল, বসেই রইল। নড়ল না এতটুকু। বাকি যারা জড়ো হয়েছিল ডাক্তারবাবুর চারপাশে তারাও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।
"সমুদ্র বাঁচবে তো বোধি?" এই প্রথম একটা স্পষ্ট বাক্য বলল ঋষিকা।
বোধিরূপ খানিকটা সামলেছে এতক্ষণে। সে লাল চোখে ঋষিকার দিকে তাকাল। তারপর হাতের তালুতে ঘুসি মেরে বলল, "ওকে বাঁচতেই হবে মিঠু... ওকে বাঁচতেই হবে... তুই শক্ত থাক। আমি তোকে কথা দিচ্ছি ওকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাব।"
বোধিরূপ ঋষিকাকে এর আগে কোনও দিন 'তুই' বলেনি। বন্ধু কাম সহকর্মীর স্ত্রীর সঙ্গে যতটা দূরত্ব বা ঘনিষ্ঠতা থাকা উচিত, ঋষিকা আর বোধিরূপের মধ্যে ঠিক ততটাই আছে। ঋষিকার কান এড়াল না এই নতুন সম্বোধন, কিন্তু সে কথা বলার অবস্থায় নেই। সে কিছুই বলল না। মাথাটা সিটের পেছন দিকে দেওয়ালে হেলিয়ে দিয়ে চোখ বুজল। কিন্তু চোখ বোজা মানেই বিভীষিকার মুখোমুখি হওয়া।
ঝলকে-ঝলকে তার মনে পড়ে যাচ্ছে সমুদ্রের লাল মুখ, উদভ্রান্ত চাহনি, বিহ্বল, চূড়ান্ত দিশেহারা ভাব... ঋষিকা চোখ খুলে নিল। আশপাশে ছড়িয়ে আছে তার কাছের সব লোকেরা। সে চোখ মেলে দেখতে থাকে তার আত্মীয়-স্বজনকে। ততক্ষণে শিবদাসবাবুও চলে এসেছেন।
ধীরা আর শিবদাসবাবু রিসেপশনের সামনে দাঁড়িয়ে। শিবদাসবাবু শরীরটা ঝুঁকিয়ে মন দিয়ে শুনছেন ধীরার কথা। ধীরা ভাবলেশহীন মুখে ফিসফিস করে শিবদাসবাবুর কানে কানে কথা বলছেন।
সমুদ্রের বাবা কাচের দরজার পাশে কপালে হাত দিয়ে বসে আছেন। জনি কাচের দরজার ওই দিকটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে রাকার সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত।
ঋষিকা মিয়ানো গলায় বলল, "বোধি মাকে একটা ফোন করে দাও... মা বাড়িতে একা আছেন।"
"ধীরার সঙ্গে মাসিমার একটু আগেই কথা হয়েছে। শি হ্যাজ্ড বিন টোল্ড এভরিথিং।"
"তুমি ফোন করেছিলে?"
"না, আমি করিনি। স্বৈপায়ন করেছিল। ওকে তো মিট করেছ তুমি, আমাদের এমডি..."
"ও। আচ্ছা..."
"শোন মিঠু...তোকে আমার কিছু বলার আছে..."
"জানি...সমুদ্রকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাই, তারপর শুনব।"
বোধিরূপ চমকে তাকাল ঋষিকার দিকে। এ কে? শান্ত, দৃঢ় কণ্ঠস্বর! কেমন প্রত্যয়ী ভঙ্গি! দোলাচলদুষ্ট, সব সময়ে কমপ্লেক্সে ভুগতে থাকা মেয়েটা এক ঘণ্টার মধ্যে নিজেকে এমন পাল্টে ফেলল? বোধিরূপ তার বাঁ হাতের তালু দিয়ে মুখটা ঢেকে ফেলে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে। এমন বিভ্রান্ত, আঁধার ঘেরা মুহূর্ত তার জীবনে এর আগে কোনওদিন আসেনি।
"শান্ত হও বোধিরূপ। ওই দ্যাখো ডাক্তারবাবু আসছেন। আমাদের জন্য ভাল খবর, দেখতে পাচ্ছ না?"
বোধিরূপ চকিতে মাথা তুলল। ডাক্তারবাবুকে দেখে বাকিরা উঠে দাঁড়াল যে যার জায়গা থেকে। সমুদ্রের নিকটজন ওই এগিয়ে যাচ্ছে লিফ্‌টের দিকে।
এসো, সুসংবাদ এসো...
ঋষিকা জানে, তিনি কী বলবেন। এই পিতৃ-মাতৃহীন মেয়েটির তেমন কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধু নেই। নেই রূপ বা তুখোড় ব্যক্তিত্ব। বিশ্বাস নেই ঠাকুর-দেবতায়, পূজা, প্রার্থনায়। নেই তেমন জোরালো প্রতিবাদ বা প্রতিদানের লিপ্সা। সমুদ্রকে ঘিরেই ওর বেঁচে থাকা। সঙ্গে ফাউয়ের মতো কল্পনার শব্দবুনন...
ঋষিকা জানে ডাক্তারবাবু বলবেন, সমুদ্র ভাল আছেন। অপারেশন সাকসেসফুল...

৮

ধীরার সঙ্গে নালককে নিয়ে বিশাখার দর্শনগত সংঘাত লেগে গেল। উত্তেজিত না হয়েই ধীরা বললেন, "তোমার হয়তো এই সম্পর্কটা নিয়ে কোনও অপরাধবোধ আছে, তাই লুকোতে চাইছ। দ্যাট ইজ় নট দ্য ওয়ে টু হ্যান্ডল থিংস বিশাখা। লুকিয়ে কোনও লাভ হয় না। এটা তোমার জীবন। সবার প্রতি তুমি সহৃদয় থাকবে, জাস্ট থাকবে, এ তো হয় না! কারও প্রতি তোমায় নির্মম হতেই হবে।"
বিশাখার চোখে উষ্মার আঁচ লাগল। একে ধীরার বাড়ি থাকতে এসেছে সে, তার ওপর ধীরা তার বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। সে বিরক্তি লুকিয়ে রেখে কেটে-কেটে বলল, "ডিভোর্স ফাইল করে জানাতাম। আগ বাড়িয়ে এসব বললেই কেস গুলিয়ে যায়। যে যা শুনতে চাইছে, আপাতত তাকে তাই শোনাতে চাইছি... আমার ভালবাসা-টাসার কথা ওরা বুঝবে? ওরা বিয়ে ভাঙার গদগদে কারণ চায়। স্বামী আমাকে ঠ্যাঙায় বা খেতে দেয় না বা সিনেমায় নিয়ে যায় না, এই সব! আমার রোহিতকে ছাড়ার সেই অর্থে কোনও স্পষ্ট কারণ নেই। আমি নালকের প্রতি যে প্যাশনটা ফিল করি, রোহিতের প্রতি সেটা করি না। আমার জন্যে এইটুকু কারণই এনাফ... মায়েদের কাছে, প্যাশনের কারণে বিয়ের মতন পবিত্র বন্ধন ভাঙা মানে ছ্যাবলামি! আমি তো ঠিক করে নিয়েছিলাম মাকে বলব রোহিত ইম্পোটেন্ট, সেই জন্য তাকে আমি ছেড়ে এসেছি। তাও ডিভোর্সের পর। এখন তুমিই ক্যাঁচাল বাড়ালে মাইরি।"
ধীরা গভীরভাবে কিছু ভাবছিলেন। খানিক চুপ করে থেকে বললেন, "মে বি ইউ হ্যাভ আ পয়েন্ট! কী জানি... তবে রোহিত সম্বন্ধে এত বড় মিথ্যে কথাটা বলবে কি না ভেবে নিও... ওটাও কি গোদা কারণ নয়? এতটা কষ্ট কাউকে দিও না বিশাখা। আমি তোমার থেকে অনেকটা বেশি জীবন দেখেছি... রোহিতকে ছেড়ে যাচ্ছ যাও, কিন্তু..."
বিশাখা নিষ্ঠুর হাসি হেসে বলেছিল, "উঃ। লোককে কষ্ট দেওয়ার যে কী আনন্দ, তোমরা বুঝবে না! রোহিত একটা অতি সাধারণ পাওয়ারলেস ক্যারেক্টার। পাওয়ারলেসকে অত্যাচার করতেই তো মজা! তাছাড়া আমি নালকের জন্য সব করতে পারি। মানুষ খুনও! আমি একটা

ঋষিকা জানে, তিনি কী বলবেন। এই পিতৃ-মাতৃহীন মেয়েটির তেমন কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধু নেই।

টোটাল খারাপ মেয়ে, এটা মনে রেখো। আমি বিষ!"

ধীরা অনামনস্ক গলায় বলেছিলেন, "এসব নাটকীয়তার সময় এটা নয় বিশাখা। ব্যাপারটা এত সহজে মেটাবে না রোহিত। ও নিরীহ বটে কিন্তু ছেলেরা কোণঠাসা হলে মরিয়া হয়ে যায়... ও নালকের ব্যাপারটা জানে?"

বিশাখা কিছু বলতে গেল। কিন্তু বলা হল না। একটা কোলাহল শোনা গেল বাড়ির নীচে। ছাদে ছুটল ওরা দু'জনে। উঁকি মেরে দেখল বাড়ির মেন গেটের সামনে রোহিত দাঁড়িয়ে। মাতাল গলায় সে কিছু বলছে হাত নেড়ে-নেড়ে। রোহিতের সঙ্গে আর-একজন, যার গাড়িতে রোহিত এসেছে। তাকে ধীরা চিনতেও পারলেন। এ পাড়ারই ছেলে। নামটা...নাঃ! ঠিক মনে আসছে না ধীরার। তবে এ ছেলেটা আগে ইলেকট্রিকের কাজ করত, হালে প্রোমোটার হয়েছে। হাতে প্রচুর কাঁচা টাকা।

ধীরা একতলায় নেমে দেখলেন, টলটলায়মান রোহিতের হাতে একটা ছুরি। এবং রোহিতকে সামলানোর চেষ্টা করছে তার সেই সঙ্গীটি। ধীরা রোহিতের পিঠে হাত রেখে বললেন, "ভেতরে চলো।"

রোহিত কোনও কথা না বলে ধীরার দিকে বড়-বড় চোখ মেলে তাকিয়ে রইল। হুবহু বিরহী ও ল্যাং-খাওয়া প্রেমিকের লুক! মউসিজি বলে পায়ের ওপর না লুটিয়ে পড়ে! ভাবছিলেন ধীরা। রাত বেড়েছে বলে মসৃণ গালে কিছু রুক্ষতা। শার্টের বোতাম প্রায় সব ক'টাই খোলা, খালি পায়ে, রোহিত একেবারে বেসামাল, বিধ্বস্ত বউহারা।

ধীরা আলতো করে রোহিতকে ঠেলে দেন সিঁড়ির দিকে। সেই ধাক্কাই কাল হল। প্রথমে ফোঁপানি, তারপর হেঁচকি, শেষে বমি। ধীরার ইচ্ছে করছিল রোহিতের কানদু'টো মুচড়ে দিতে। ভীষণ পুরুষ শিবদাসের সঙ্গে ঘর করে, এমন ব্যবহার তাঁর মেয়েলি ন্যাকামি মনে হয়। বিরক্ত লাগে খুব। শিবদাসের সব কিছু পলিটিক্যালি কারেক্ট নয় বলে রাগ হতে পারে। কিন্তু তাঁকে মেয়েলি ভাবার কোনও স্কোপ শিবদাস দেন না!

রোহিত বিলাপ বকছে। ধীরা মন দিয়ে শুনছিলেন না ওর সব কথা। তবে মাঝে যেন একবার 'প্রেশারের ওষুধটা খেয়েছিলাম, বেরিয়ে গেল' কথাটা শুনলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরা ভাবছিলেন বিশাখার মুখোমুখি একে আদৌ দাঁড় করাবেন কি না!

ধীরা এক বোতল জল এগিয়ে দিলেন রোহিতের দিকে। রোহিত জল খেল ঢকঢকিয়ে। তারপর বলল, "আয়াম ডাইং ধীরামাসি। মাই ডেড্ আর নাম্বার্ড। বিশকে এটা বলে দাও প্লিজ..."

ধীরা গলা নামিয়ে বললেন, "অনেক রাত হয়ে গেছে রোহিত। বিশাখার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে, ওপরে এসো। কিন্তু বুঝতেই পারছ, বাড়ির লোকজন ঘুম থেকে উঠে পড়লে বড্ড এমব্যারাসিং হবে। গলা নামিয়ে, মাথা ঠান্ডা রেখে কথা বলবে। ইজ দ্যাট ওকে?"

রোহিত বাধ্য ছেলের মতো ঘাড় নাড়ল। তারপর এলোমেলো পায়ে, বুঁ-বুঁ করতে-করতে সিঁড়িতে উঠতে লাগল। ধীরা সন্তর্পণে শ্বাস ছাড়লেন। আজ 'বাড়ির

বিশাখা কিছু বলতে গেল। কিন্তু বলা হল না। একটা কোলাহল শোনা গেল বাড়ির নীচে।

লোকজন' বলতে শুধুই নালক। ধীরা একেবারেই চান না নালক আর রোহিতাশ্ব আজ এই অবস্থায় মুখোমুখি হোক।

রোহিত সিঁড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গী ছেলেটি এগিয়ে এল সিঁড়ির দিকে। ধীরার দিকে সবজান্তামার্কা হাসি হেসে বলল, "ওনার মিসেসকে নিয়ে যাব বলে গাড়িটা আনলাম। ভোম্বলের গাড়ি চালানোর ক্ষমতা নেই..."

ধীরার ব্যাপারটা ভাল লাগছিল না। এ তাঁর বেডরুম অবধি যাবে নাকি? গলা খাঁকরিয়ে ধীরা বললেন, "আপনি বুঝি ভোম্বলের বন্ধু?"

ছেলেটি তেড়িয়া হতে গিয়েই, সম্ভবত পুরনো দিনের সম্মানে নিজেকে সামলে নিল। বলল, "বন্ধু-ফন্দু জানি না। ভোম্বল সাহায্য চাইল... বলল ওর ওয়াইফ ওকে কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে... ঘরের বউকে ঘরে ফেরত দেওয়া আমাদের কর্তব্য... হাজব্যান্ড-ওয়াইফের ঝামেলায় আপনি কেন ঢুকছেন। ম্যাডাম...দেখছেন তো ভোম্বল কেমন ভেঙে পড়েছে! আপনার উচিত ছিল বোনঝিকে হাজব্যান্ডের ঘরে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া। সধবা মেয়েছেলেকে রাতে বাড়ির বাইরে থাকতে দেওয়া কি ঠিক? ম্যারেজ ম্যাডাম ম্যারেজ... তার তো কিছু নিয়মকানুন আছে নাকি!"

ধীরা স্মিত হাসলেন। বললেন, "নিশ্চয়ই আছে! নিয়ম মানতে চায় বলেই তো আমার কাছে চলে এসেছে বিশাখা। ও ভোম্বলকে ঠকাতে চায় না। একজনকে ভালবেসে আর-একজনের সঙ্গে থেকে ঘর করা ম্যারেজের নিয়মের বাইরে, তাই না... ইয়ে আপনার নামটা ভুলে গেছি, তারক বোধহয়... তাই তো।"

ছেলেটি কী একটা বলল, ধীরা শুনতে পেলেন না। তিনি শুনলেন রোহিত আবেগমাখা গলায় ডাকছে, "হোয়্যার আর্ট দাও? সুইটহার্ট, আই বেগ দি... প্রে ডোন্ট লিভ মি। আয়াম ডাইং... মে বি অলরেডি ডেড..."

বিশাখা ঘরের লাগোয়া বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। মুখে আলাভোলা দার্শনিক হাসি। ভ্রু দু'টো ওপরে তোলা। তাকে দেখে রোহিত বলল, "তোমাকে ওয়াকার কাকার মতন লাগছে! হাউ আই মিস ইউ ডার্লিং..."

"ওয়াকার কাকা!"

মানে কি ফ্যান্টম? ভাবতে থাকলেন ধীরা। বিশাখা কথাটায় একদম গুরুত্ব না দিয়ে বলল, "আমি তোমার সঙ্গে ফিরব না রোহু। আই নিড আ ম্যান ইন মাই লাইফ। নট আ স্পাইনলেস ফুল লাইক ইউ।"

রোহিতাশ্ব ফ্যালফ্যাল করে খানিক তাকিয়ে রইল বিশাখার দিকে। তারপর খচাক করে হাতে ধরা ছুরিটা বসিয়ে দিল নিজের কবজিতে। রক্ত ছিটকে গেল ঘরের সিলিং অবধি।

রোহিতের বিশাল ছ' ফুটের শরীরটা মাটিতে গড়িয়ে পড়ার আগেই তারক নামের ছেলেটা 'খুন-খুন' বলে চেঁচাতে শুরু করে দিল। ঠিক তিন লাফে বিশাখা সেই ছেলের সামনে এসে তার কলার চেপে ধরে বলল, "আর-একটা কথা বললে, এই মুহূর্তে আমি আপনাকে খুন করব। মনে রাখবেন পুলিশ কমিশনার আমার ছোটমামা।"

ধীরার একমাত্র দাদা অর্থাৎ, বিশাখার মামা, বিশাখার জন্মের আগে সন্ন্যাসী

হয়ে বাড়ি ছেড়ে হরিদ্বার চলে গিয়েছেন! বিশাখা হরিদ্বার গিয়েছিল কয়েক বছর আগে... আত্মা আছে না-নেই, এই নিয়ে মামার সঙ্গে বিশাখার বড় ডিসকোর্স হয়েছে সেখানে... বিশাখার এই উচ্চারণে ধীরা হাঁ হয়ে গেলেন। এবং মনে-মনে বিশাখাকে কুর্নিশও জানালেন। তিনি মনে-মনে স্বীকার করেও নিলেন, এই জেনারেশন কিছু-কিছু ক্ষেত্রে অনেক বেশি কার্যকরী। এই ছেলেটাকে এভাবে চুপ করিয়ে দেওয়ার কথা ধীরার মাথায় আসত না সম্ভবত।

তারক পুলিশ কমিশনারের কথায় ভড়কেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে উঠতি বড়লোক। ভড়কালেও হম্বি-তম্বি তার যায় না। তবে গলা তার আর তেমন উঁচছে না। "বেশি কমিশন-ফমিশন দেখাবেন না... আমরাও অনেক খবর রাখি... কোথায় কী চুল্লু-বুল্লু হয়, জানেন না ভাবছেন?"

ধীরা আর শুনতে চাইছিলেন না। ভয় পাচ্ছিলেন, এবার রঙ্গমঞ্চে নালক এন্ট্রি নিলে আর বোধহয় তিনি সামলাতে পারবেন না। তিনি 'বরফ আন, এক্ষুনি বরফ আন' বলে চাপা গলায় বিশাখাকে নির্দেশ দিয়ে, নিজে তাঁর ওড়নার প্রান্ত ছিঁড়ে রোহিতের ক্ষত চেপে ধরার চেষ্টা করতে লাগলেন। বিশাখা বরফ আনতে ছুটল, তারক রোহিতকে জাপটে ধরে ঘষটাতে-ঘষটাতে সিঁড়ি দিয়ে নামাতে লাগল। পিছনে-পিছনে ধীরা।

"টিচ দিতে হবে, ল্যাবেঞ্চুস চোষা ছেলেদের সঙ্গে এই জন্যে সালা ভিড়তে নেই...," বলে তারক প্রায় পাট করা চাদরের মতো রোহিতকে কাঁধে ফেলে গাড়িতে তুলে দিল।

রোহিতাশ্ব বোধহয় জ্ঞান হারিয়েছিল আগেই। শক এবং শোক বেশিমাত্রায় হওয়ার ফল। তবে বিশাখার নার্ভ যে মারাত্মক ষ্ট্রং, তা বোঝা গেল সে রাতে। রোহিতের কবজি সেলাই করাল ঠান্ডা মাথায়, নির্বিকার মুখে, কর্তব্যরত হাউস-স্টাফটির সঙ্গে খোশগল্পও করল, এমনকী রিসেপশনের বাইরে বেরিয়ে তারককে একটা সিগারেটও অফার করল। নার্সিংহোমের বিল মেটাচ্ছেন যখন ধীরা, তখন বিশাখা এসে তাঁর পাশটিতে দাঁড়িয়ে বলল, "লোকটা গামবাট বটে তবে বলবান।"

"বলবান তো বটেই, যেভাবে রোহিতকে ঘাড়ে করে নামাল।"

বিশাখা মুচকি হেসে বলল, "এ বল সে বল নয়। লোকটা টানা আমার বুকের দিকে তাকিয়ে আছে!"

ধীরা লজ্জায় লাল হয়ে বিশাখার চুল টেনে দিলেন। পুলিশ কেস হল না। রোহিত বয়ান দিল, সে মাতাল হয়ে ফল কাটতে গিয়ে কবজিতে চোট পেয়েছে।

জমাটবাঁধা টেনশন কমছিল। রোহিতকে নিয়ে ওরা ফিরল যখন তারকের গাড়িতে, তখন রাত শেষ হতে চলেছে। রোহিত একেবারে নিশ্চুপ। তারক বকেই চলেছে। ততক্ষণে সে বিশাখার চামচায় পরিণত হয়েছে!

রোহিতকে ওর বাড়িতে ছেড়ে অত কাণ্ড করে ধীরার বাড়ি ফিরে দেখা গেল, নালক তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বিশাখা বলল, "ও একতা দামাল থেলে.... ঘুমিয়ে পল্লে কাদা!"

রোহিতের সঙ্গে বিশাখার ডিভোর্সের দিন কোর্টে গিয়েছিলেন ধীরা। বিশাখার বাবাও ছিলেন। বাবা একটিও কথা বলছিলেন না কারও সঙ্গে। বড্ড বেশি সাদা রুমালে মাঝে-মাঝে কপালের ঘাম মুছছিলেন ওদের থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে। রোহিতের সঙ্গে এসেছিল ওর এক সহকর্মী। তারা দু'জন গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে বিড়বিড় করে কথা বলছিল।

বিশাখা সটান তাদের কাছে চলে গেল। রোহিতকে বলল, "এমন আলুথালু চেহারায় এসেছ কেন? আর চুলটাই বা এমন গোবর-গণেশের মতন কেন কেটেছ? পৃথিবীকে দেখাতে চাও তুমি কত খারাপ আছ?"

রোহিত লাল মুখে কিছু বলতে গিয়েছিল। বিশাখা তাকে ও তার বন্ধুকে দু'টো সিগারেট অফার করে বলল, "তোমার কষ্ট আমি বুঝি রোহিত... কিন্তু তোমার এই দাসা ভাব দেখলে আমার পিত্তি চটে যায়। এনিওয়ে আমি খুব খারাপ মেয়ে, আমি জানি। আমায় ভুলে যাওয়ার চেষ্টা কোরো। আর আমার গয়নাগুলো প্লিজ আমার ঢাকুরিয়ার বাড়িতে পৌঁছে দিও। আমার ঠিকানাটা আমি তোমায় টেক্সট করে দেব।"

রোহিতকে ছেড়ে এসে মাসখানেক ধীরার বাড়ি থেকেছিল বিশাখা। তারপর ঢাকুরিয়ায় একটা এক কামরার বাড়িতে উঠে গিয়েছিল। সঙ্গে নালক। নালকের সঙ্গে আদৌ বিয়ের প্ল্যান ছিল না বিশাখার। কিন্তু আচমকা বিশাখা প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়ল।

ল্যাদ খেয়ে, প্রেমে মশগুল বিশাখা, ডাক্তারের কাছে যেতে সময় নিয়েছিল। দ্বিতীয় ট্রাইমেস্টারের পর হ্যাঁচোরপ্যাচোর করে তারই এক প্রাক্তন প্রেমিক, গাইনিকলজিস্টের চেম্বারে গিয়ে হাজির হয়েছিল। সে বিশাখাকে দেখে জানিয়েছিল ভ্রূণ নষ্ট করতে গেলে লাইফ রিস্ক হয়ে যাবে।

অতএব আবার বিয়ে!

রোহিতের সঙ্গে যখন তার ডিভোর্স হচ্ছে, সে তখন চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা। বিবাহবিচ্ছেদ ও নালকের সঙ্গে পুনর্বিবাহ বিশাখার মা-বাবা কিছুতেই মেনে নিলেন না। নিজের বাড়ির দরজা বিশাখার জন্য বন্ধ হয়ে গেল। ডিভোর্স পাওয়ার পরদিনই বিয়ে হল নালক ও সন্তান-সম্ভবা বিশাখার। বিশাখা-নালকের বিয়ের দিন ধীরা ছিলেন। ছিল বিল্বমঙ্গল, পারিখ, শিবদাসবাবু এবং বিশাখার সেই গাইনিকলজিস্ট প্রাক্তন প্রেমিক। বিশাখা বা নালকের অভিভাবকরা কেউ এলেন না। বিশাখার মা-বাবার তখন দৃঢ় অঙ্গীকার, তাঁরা মেয়ের মুখ দেখবেন না। অন্যদিকে নালক জানাল, তার বাবার হৃদয়ের দোষ। বিশাখাকে দেখলে তাঁর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী! পিতৃহন্তারক হতে তার বাধো-বাধো ঠেকছে!

"তোমার বাড়িতে এ বিয়ের কথা জানিয়েছ তো?" প্রশ্ন করেছিলেন ধীরা।

নালক তার মাথার চুল খামচে ধরে বলেছিল, "বাড়ি? বাড়ির লোক? এখন বিশাখাই আমার বাড়ি... আশ্রয়।"

এ গোলমেলে উত্তর থেকে ধীরা বুঝে গিয়েছিলেন বিশাখার জীবনে নবনাট্যর অভাব হবে না! বিয়ে সংক্রান্ত সই-সাবুদের পর সেই ডাক্তারটি কেটে পড়ল। যাওয়ার আগে বিশাখার পেটে হাত বুলিয়ে বলল, "শালা তুই তো তোর বাচ্চাকে বাপের বিয়ে দেখিয়ে দিলি রে বিশ! বেঁচে থাক মা, ফুলেফেঁপে ওঠ!"

নালক তখন শিবদাসকে উত্তর-আধুনিকতা, নারীবাদ ও জমি-রাজনীতি নিয়ে জ্ঞান দিলেও কথাটা তার কান এড়ায়নি। ডাক্তার বেরিয়ে যেতেই সে মাথার চুল খামচে ধরে, সব বন্ধুদের সামনে বিশাখাকে বলল, "ও কি তোর ইন্টারনাল এগজ্যামিনেশন করে বিশ? আর তুই কি সেটা এনজয় করিস?"

একটা মেয়ে, যাকে পৃথিবী চেনে শক্তপোক্ত মেয়ে বলে, যাকে সবাই দাগিয়ে দিয়েছে, মায়াহীন, কর্কশ ও অমেয়েলি বলে, যে শুধু ভালবাসার কারণে ছেড়ে আসতে রাজি তথাকথিত নিরাপদ জীবন, যাকে ছেড়ে গিয়েছে তার নিজের বাবা-মা, যাকে সামলাতে হচ্ছে একা-একা তার প্রথম মাতৃত্ব, সে যদি এ কথায় কেঁদে ফেলে, তাকে কি তখন মাতাল বলা হয়?

নালক তো তাই বলেছিল এই মেয়েটিকে সে রাতে। বলেছিল, "মাতলামি করিস না বিশ, ক'টা নিয়েছিস? চারটে বোধহয়! আর খাস না। আর তুই যেরকম হিটিয়াল মেয়ে, তোর ইন্টারনাল করলে খারাপ লাগার কথা না!"

বিশাখা চোখ মুছে ফেলল। ধ্যাবড়ানো কাজলমাখা মুখটা বিকৃত করে নালককে বলল, "ভিখিরির বাচ্চা।"

বিশাখার দ্বিতীয় বিয়ের প্রথম রাত ছিল এমনই মধুময়!

নালক তখন তিড়িংবিড়িং করে লাফাচ্ছে আর বলছে, "জানি-জানি ওই ডাক্তারটার জন্য তোর এখনও ব্যথা রয়ে গেছে... তুই-ই আশকারা দিয়েছিস। নয়তো ওর সাহস হয় কী করে আমার বিয়ে করা বউয়ের পেটে হাত বোলানোর? সব জানি! সব জানি! এই বাচ্চাটাও আমার কি না কে জানে? হয়তো ওই রোহিতের পাশিয়ে দেওয়া কার্ড নিয়েই খেলতে হবে আমায়... দরকার হলে আমি ডিএনএ, টেস্ট করাব... উফ... আঃ... ওঃ... ওঃ..."

বাচ্চাটা অবশ্য বাঁচেনি।

তবে মৃত বাচ্চা প্রসব করার পর বাড়ির সঙ্গে বিশাখার সম্পর্কটা সহজ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু নালকের সঙ্গে তার বাড়ির লোকের তখনও তেমন যোগাযোগ নেই। নালকের বোন একদিন নার্সিংহোমে এসেছিল বিশাখাকে দেখতে। নালক তার সঙ্গে বিশাখার আলগা আলাপ করিয়েই তাকে নিয়ে নার্সিংহোমের বাইরে চায়ের দোকানে চলে গিয়েছিল।

নালক তখনও বেকার। একা চাকরি করে স্বামীর প্রতিপালন করছিল বিশাখা হাসিমুখে। মাস ছ'য়েক বাদে নালক একটা চাকরি জোগাড় করল। একটা কোচিং সেন্টারে ইংরেজি পড়ানোর কাজ। প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে নালক গেল তার আসানসোলের বাড়িতে। হাসি-কান্নায় খানিকটা মিটল পারিবারিক বিবাদ। ঠিক এই সময়েই ঢাকুরিয়ার বাড়িওয়ালার সঙ্গে বিশাখার ব্যাপক ঝামেলা লাগল। এই ঝগড়ায় তিতিবিরক্ত হয়ে বিশাখা ঠিক করে ফেলল এই বাড়িতে আর থাকা চলবে না। নালককে না-জানিয়েই বিশাখা গিয়ে ধরল তার কোচিং সেন্টারের মালিক রতন সাহার কাছে, নতুন বাড়ির খোঁজ পেতে। তিনি তাঁর বাড়িতে নালকদের থাকতে দিতে রাজি হলেন। বিশাখা বলল, মাসখানেকের মধ্যে বিশাখারা বাড়ি খুঁজে নেবে। সব শুনে নালক তো এই মারে সেই মারে।

"আমার একটা প্রেস্টিজ নেই? তুই আমায় না জিজ্ঞেস করে ওই হারামজাদাটার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিস কেন? জানিস লোকটা একটা টালির চালাবাড়িতে থাকে। সেখানে থাকতে পারবি তুই?"

বিশাখা তখন নালকের প্রেমে ধরাকে অধরা মাধুরী জ্ঞান করছে। সে বলল, "কেন পারব না? ডিক্লাসড হতে তুই একাই পারিস?"

"আমি ডিক্লাসড হয়েছি বাধ্য হয়ে। বড়লোকদের আমি ঘৃণা করি, আমি বড়লোক হতে পারছি না বলে। তোর এসব রোম্যান্টিক ধ্যান-ধারণা আগে তো ছিল না। তুইই তো বলছিস, আইডিয়ালিজ়ম প্রিচ করার জন্য, প্র্যাক্টিস করার জন্য নয়।"

"সে তখন বলতাম। এখন অন্য রকম বলছি! সব সময় এক কথা বলা ভাল কথা নয়। লোকে ডগম্যাটিক বলে।"

নালক রেগে গুম হয়ে রইল সারা সপ্তাহ। তারপর গুটিগুটি গিয়ে রবিবার ডেকে আনল ম্যাটাডর। সামান্য কিছু

স্থাবর সম্পত্তি (যার সত্তর শতাংশ বই), শাড়িপরা বিশাখা, কোলে মাইক্রোয়েভ আভেন নিয়ে নালক চলল নতুন বাড়ি। খোয়া বিছানো রোঁয়া ওঠা রাস্তা পেরিয়ে সেই ছিরিছাঁদ-হীন বাড়ির সামনে পৌঁছে বিশাখার মুখ শুকিয়ে গেল। বাড়িটির তিনদিক চাপা, দেখে মনে হয় প্রতিটাই ইললিগাল কনস্ট্রাকশন, সামনে কাঁচানালায় প্রস্রাবরত স্বাস্থ্যহীন কুকুর আর জানলায় পলিথিন কেটে পরদা তৈরির চেষ্টা। বাড়িতে জলের কানেকশন নেই, উঠোনে অবশ্য 'টিউকল' আছে।

বাড়ির উঠোনে পা দিয়ে বিশাখা দেখল, খালিগায়ে শাড়ি জড়িয়ে বাড়ির মালকিন, মিসেস সাহা, 'টিউকল' টিপে-টিপে বালতিতে জল ভরছেন। নালকদের ঢুকতে দেখে তিনি এক গাল হাসলেন। পরিচিতের হাসি। বিশাখা অবাক হয়ে গেল। নালকের এ বাড়িতে যাতায়াত আছে, কই সে তো জানত না!

"নালক আইসস? যাও, ভিতরে যাও গিয়া..." বলে তিনি জল ভরেই যেতে লাগলেন। ভাবখানা যেন নালক ছাড়া আর কেউ আসে নাই!

নালক হনহনিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। একটি রোগা মতো মেয়ে, যে নির্ঘাত মিস সাহা, উঠোনের তারে কাপড় মেলছিল, ওদের ঢুকতে দেখে দৌড়ে এসে বিশাখার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিল। সম্ভবত মাইক্রোয়েভ কোলে নেবে বলে। বিশাখা মাইক্রোয়েভ বিদায় দিয়ে বোকা হয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ! এমনিতেই সে শাড়ি সামলাতে পারে না, তার ওপর রাগের চোটে তার ঘাম হচ্ছিল বেশি, সে গশমশ করে বাড়ির ভিতরে পা দিল। এই যদি তার বাড়ি, তাহলে সে উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন?

কিন্তু তাদের ঘর কোনটা সে জানে না। কাউকে ডাকবে? বিশাখা জুতোর স্ট্র্যাপ ঠিক করতে থাকল। একটি বউ টাইপের মহিলা, সম্ভবত বিশাখার দিকে নজর রাখছিল, বেরিয়ে এল। টপ করে বিশাখার হাত ধরে বলল, "নালকের বউ বুঝি? শুনেছিলুম বাচ্চা হবে! কই সে চাঁদবদনীকে দেখছি না!"

বিশাখা দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "অ্যাবর্শন হয়ে গেছে। আমাদের ঘর কোনটা বলুন তো?"

বউটির মুখ শুকিয়ে গেল। ঢোঁক গিলে বলল, "আহা, তাতে কী হয়েছে? ভগবান চাইলে আবার হবে। তা, তুমি শুনলুম কলেজে পড়াও? মাস্টারনি? মুখটা কিন্তু একেবারে ঢলোঢলো... এই যে এই তোমাদের ঘর... এই যে..."

বিশাখা বাঁদিকে তাকিয়ে দেখল একখানা খুপরি, অন্ধকার মতো ঘর। চল্লিশ পাওয়ারের ডুম-সজ্জিত সে ঘরে মশার বিনবিন তার জন্য অর্কেস্ট্রা সাজিয়ে প্রস্তুত। স্যাঁতসেঁতে মেঝে আর ছাপধরা নীল রঙের দেওয়ালে ঝুলছে একটা বাঁধানো ছবি। সে ছবিতে কোনও মানুষের মুখ স্পষ্ট নয়। দেখে মনে হয় তুষারপাত হয়েছে ছবিটির উপর।

ম্যাটাডর থেকে নামানো জিনিসপত্র লাট করে রাখা ঘরের এক কোণে। মাইক্রোয়েভ আভেনটা ঘরের কোথাও নেই। নালক সেই যে কোথায় হাওয়া হয়ে গিয়েছে, তার পাত্তা নেই।

বউটি ঘর অবধি এসে ফিরে গেল। বিশাখা ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল। অনেকক্ষণ কাটল এভাবে। তারপর চুল প্রায় খাড়া-খাড়া করে নালক এল। হাতে একটা প্যাকেটে রুটি আর তড়কা। বিশাখার দিকে না তাকিয়ে বলল, "খেয়ে নে... এখানে কেস গন্ডগোল... বাবাকে মনে হচ্ছে হাসপাতালে দিতে হবে..."

বিশাখা অবাক!

"বাবা? তুই ওনাকে বাবা ডাকিস নাকি?"

"বাবাই তো! দেখছিস তো, বিপদের দিনে কেমন করছেন আমার জন্য। উনি বাবা নয় তো, বাবা কে? অ্যাই শোন, পারুলের সঙ্গে সাবধানে কথা-টথা বলবি... ও ডেঞ্জারাস মাল..."

"তুই তো এখানে আসতেই চাইছিলি না। এখন বলছিস বাবা!"

"আঃ, সে সব পরে হবে। এখন যা বলছি শোন। পারুলকে একদম ঘাঁটাবি না।"

"পারুল কে? ওই রোগা ডিগডিগে মেয়েটা! হামলে পরে মাইক্রোয়েভটা নিয়ে গেল আমার কাছ থেকে! রাখল কোথায় রে? অ্যাই আমাদের রান্নাঘর নেই? এই একটা ঘরেই থাকব আমরা? এ কোথায় এলাম রে নালক? এ তো একেবারে দারিদ্রসীমার ওদিকের কেস।"

"ওঃ, এত প্রশ্ন একসঙ্গে করিস না। শোন, ওই ডিগডিগেই পারুল। কিন্তু ওর চেহারা দেখে ওকে নিরীহ ভাবিস না। পারুল কামড়ে-ফামড়ে দেয়। ওর অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্টের সমস্যা আছে। ওকে একটু সামলে চলিস। সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যেতে হয়েছিল দু'-একবার। বুঝতেই পারছিস, আমার প্রতি ব্যথা আছে। তোকে সহ্য করতে পারছে না। ক'দিন একটু মানিয়ে নে। শাশুড়ি-ননদ কেস আর কী!"

বিশাখা হাবার মতো তাকিয়ে থেকে বলল, "মানিয়ে নেব! মানিয়ে নেব এদের সঙ্গে?"

নালক মাথার চুল খামচে ধরে তার বিখ্যাত ভঙ্গিতে বলল, "মানিয়ে নে, মানিয়ে নে... সব বলব তোকে। তুইই তো সব... তোকে তো বলতেই হবে।"

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল বিশাখার। নালককে তার সম্পূর্ণ অচেনা লাগছে। এই রহস্যময় পরিবারটির সঙ্গে নালকের কেমন সম্পর্ক সে একদম বুঝে উঠতে পারছে না। ভয় সামাল দিতে সে বলল, "খিদেতে পেট জ্বলে যাচ্ছে... আগে খেয়ে নিই, তারপর শুনছি তোর শাশুড়ি-ননদি কেস।"

নালক পা নাচাতে-নাচাতে বলল, "তুই কি ভাবছিস আমি কোপ্তা কালিয়া সাঁটিয়েছি? পারুল তো আমরা আসার পর বিছানা নিয়েছে। ওদিকে বাবাকে ছেড়ে মা-ও নড়তে পারছে না। লুকিয়ে-লুকিয়ে তড়কা খেতে যে কী খারাপ লাগছে।"

"আমি বুঝতে পারছি না, আমাদের নিয়ে যদি অতই আপত্তি তাহলে আমাদের এখানে আসতে বলল কেন ওরা?" স্তম্ভিত, ত্রস্ত গলায় বলল বিশাখা।

"ভাল মনেই ডেকেছিল। কিন্তু প্রথম রাউন্ডেই তুই যা ফাউল করলি... কাউকে পেন্নাম করলি না। ঢোকার আগে ঘোমটা দিসনি মাথায়। তারপর ঘরে ঢুকে বসে আছিস, তো আছিসই। এখন বাবাকে হাসপাতালে যদি দিতে হয়... শালা কী যে করি!"

বিশাখার তখন মাথা ঘুরছে। প্রায় জড়ানো গলায় সে বলল, "উনি অসুস্থ বলে তোকে

নালকদের ঢুকতে দেখে তিনি এক গাল হাসলেন। পরিচিতের হাসি। বিশাখা অবাক হয়ে গেল।

টাকা দিতে হবে? আমি কিছু বুঝতে পারছি না নালক... এরা তোর কে?"
নালক কেঁদে ফেলল। তারপর বিশাখাকে শোনাল তার এতদিনের না-বলা কথা। পারুলের প্রাইভেট টিউটর থাকাকালীন তার সঙ্গে নালকের একটা যৌন সম্পর্ক হয়। সাহাবাবু সেটা ধরতে পেরে নালককে বলেন পারুলকে বিয়ে করতে। নালক বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাহাবাবুর কাছে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা ধার করেছে বিভিন্ন সময়।
এসবই ঘটেছে নালকের সঙ্গে বিশাখার বিয়ের আগে। মানে যে সময়ে নালক ও বিশাখা প্রেম করছে, তখন। এদিকে বিশাখা প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়াতে কেস টোটাল জড়িস হয়ে গিয়েছে। পারুল নাকি তখন সুইসাইড করতে গিয়েছিল। পারুলের সাইকিয়াট্রিস্ট নালককে বলেছেন, পারুলের সঙ্গে তাকে স্বামী-স্ত্রীর খেলা চালিয়ে যেতে হবে। সেই থেকে সে পারুলের বাবাকে বাবা এবং মাকে মা বলে ডাকছে।
এসব শুনে বিশাখা তার হাতের বালাটা খুলে নালকের হাতে দিয়ে বলেছিল, "টাকার জন্য তোর বাবার চিকিৎসা আটকাবে না। জাস্ট টেক ইট।"
নালক ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল বউয়ের দিকে।
বিশাখা আড়মোড়া ভেঙে বলেছিল, "জানিস নালক, দিন-দিন আমার বিস্ময়বোধ কমে যাচ্ছে! আমি আর কিছুতেই চমকাই না আজকাল। আমি বিশ্বাস করি, আমার জীবনে যারা যারা এসেছে, প্রত্যেকের কিছু না কিছু পারপাস আছে। এই যেমন তুই... তুই শেখালি..."
বিশাখা কথা শেষ করতে পারেনি। হয়তো চায়ওনি। নালক তখন সেই লাট হয়ে থাকা ঘরে উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদছে।

বিশাখা একটা ট্যাক্সি ধরে চলে গিয়েছিল তার বাবা-মায়ের বাড়ি। যে-অভিজাত পাড়ায় বিশাখার বাপের বাড়ি, সেখানে কেউ কারও জীবন নিয়ে মাথা ঘামায় না। শেষ বিকেলের মরা আলো মাথায় নিয়ে বিশাখা ট্যাক্সি থেকে নামল বাড়ির সামনে। রাস্তায় তখন অনেক প্রতিবেশী। কেউ পোষা কুকুর নিয়ে হাঁটছে, তো কেউ কানে হেডফোন লাগিয়ে ইভনিং ওয়াক সারছে...সবার চোখের সামনেই বিশাখা ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে বাপের বাড়ির বেল বাজাল।
তার মুখ তখন উত্তেজনা আর অপমানে লাল হয়ে থাকলেও, কান্নার চেয়ে ক্রোধচিহ্ন বেশি। ডোর বেলের আওয়াজে বিশাখার বাবা এমনভাবে দরজা খুলে দাঁড়ালেন, যেন বিশাখার এই 'ফিরে আসা' সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাশিত, পূর্বপরিকল্পিত!
"ওঃ তুমি!" বলে তিনি তাড়াতাড়ি ফিরে গেলেন টিভির সামনে। সেখানে হিন্দি সিরিয়াল চলছে। বিশাখার বাবা রিটায়ার করার পর সারাদিন হিন্দি সিরিয়াল দেখেন। সন্ধেবেলা দেখেন বাংলা টিভির ডিবেটরঙ্গ আর রাতে খেতে বসে দেখেন খবর। ডিসিপ্লিন পছন্দ করা এই লোকটির এই রুটিনে নড়চড় হয় না।
ডোরবেলের শব্দ শুনে বিশাখার মা বেরিয়ে এসেছিলেন রান্নাঘর থেকে। ওঁর বাঁ হাঁটুতে ব্যথা। তাই হাঁটার সময় শরীর বেঁকে যায়, বাঁ হাত দিয়ে হাঁটু চেপে ধরে

নালক কেঁদে ফেলল। তারপর বিশাখাকে শোনাল তার এতদিনের না-বলা কথা।

রাখেন। বিশাখার দিকে একঝলক তাকিয়ে বললেন, "জামাই কই? সে আসেনি? ক'দিন ধরে জামাইকে খুব স্বপ্নে দেখছি। এবার খুব ভাল ফুলকপি উঠেছে।"
বিশাখা স্তম্ভিত হয়ে গেল। দু'জনকেই তার কেমন অসংলগ্ন লাগতে থাকে। বয়স! বয়সের কারসাজি নাকি এই সব? নাকি একমাত্র সন্তানের উদ্ভট জীবনযাপনে এরা এমন হয়ে গিয়েছে? নালকের প্রতি মায়ের কোনও দিন দরদ ছিল না। নালক এ বাড়িতে একবারই মাত্র এসেছে।
কুচি যেদিন মারা গেল, সেদিন। নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে নালক দেখেছিল বুড়ো-বুড়ি ট্যাক্সি খুঁজছে হন্যে হয়ে। নালক ট্যাক্সি ধরে দিয়েছিল। চক্ষুলজ্জার খাতিরে তাঁরা নালককে তুলে নিয়েছিলেন তাঁদের ট্যাক্সিতে। নালক ওঁদের বাড়িতে নামিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। সাদার্ন অ্যাভিনিউ থেকে যোধপুর পার্কের সে যাত্রা ছিল সম্পূর্ণ বাক্যহীন, শব্দহীন।
ফ্ল্যাটের সামনে নামার সময় বিশাখার মা শক্ত গলায় নালককে চা খেয়ে যেতে বলেছিলেন। নালক হাসিমুখে 'না' জানিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে নিজের বাড়ি চলে গিয়েছিল।
পুরো ঘটনাটা বিশাখা পরে নালকের মুখ থেকে শুনেছিল। ওর বলার ভঙ্গির মধ্যে কোনও অপমানবোধ বা বিদ্বেষ প্রকাশ পায়নি। আসলে নালক এমনই। খুব হালকাভাবে বাঁচতে চায় ও। নালকের মতো সম্পূর্ণ বিবেক-বর্জিত মানুষ বিশাখা খুব কম দেখেছে।
গলা শুকিয়ে কাঠ, ভোম্বল-মার্কা মুখ নিয়ে বিশাখা বাবার পাশে বসে পড়ল।
জীবন তাকে কোথায় কোথায় তাড়িয়ে নিয়ে যাবে? নালক প্রায়ই তাকে ছিটিয়াল মেয়ে বলে গাল দেয়।
তাকে এভাবে অস্থির যাপনে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে কি তার বেশিমাত্রার যৌনকাঙালপনা?

পরদিন সকালেই নালক এল। মুখে হাসি। অতি স্বাভাবিক চালচলন। যেন কিছুই হয়নি! বিশাখার মায়ের কাছে আবদার করে বলল, "সরষের তেলে ভাজা ডিমের ওমলেট, পরোটা আর লাল করে ভাজা আলু দিয়ে ব্রেকফাস্ট খেতে ইচ্ছে করছে। সঙ্গে একটু বেশি দুধ দিয়ে চা। দেবেন?"
মাকে ফরমাশ করে নালক এল বিশাখার ঘরে। সটান বউয়ের পায়ের ওপর ডাইভ দিয়ে বলল, তাকে যেন বিশাখা ক্ষমা করে। নালক আর সাহা পরিবারের সঙ্গে কোনও রকম সম্পর্ক রাখবে না! সে ও বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে। পরে সময়মতো গিয়ে বইপত্তর নিয়ে আসবে।
"চলে এসেছিস মানে? তাহলে তুই থাকবি কোথায়?"
নালক চুল খামচে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "দেখি... ওয়ান্স-এ রেফিউজি, অলওয়েজ আ রেফিউজি... বাস্তুহারার গল্পটা তুই বুঝবি না বিশাখা... তুই জমিদার ফ্যামিলির মেয়ে।"
"তুই আবার বাস্তুহারা হলি কবে? তোর বাবা তো ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট কাম জোতদার।"
"বললাম তো, তুই বুঝবি না। দেখি, আবার হোস্টেলেই থাকব ভাবছি। আমার আর ঘর হল নারে! একটা ঘর পেলাম না। জীবনে একটা ঘর পেলাম না।"
নালক প্রায় ঘ্যানঘ্যানে আইবুড়ো মেয়ের মতো কোঁকাচ্ছে দেখে বিশাখা খরখর করে বলেছিল, "হোস্টেলে শিফ্‌ট করার আগে

আমার ফ্রিজ আর মাইক্রোয়েভ আমি ফেরত চাই।"

"পারুল ওগুলো কিছুতেই ছাড়তে চাইছে নারে। ছেড়ে দে-ছেড়ে দে, ভুলে যা ওসব। এই মানুষটাকে তো তুই-ই পেলি, ওকে কয়েকটা যন্ত্র নিয়ে খুশি থাকতে দে।"

বাক্‌রহিত বিশাখা হাঁ করে নালককে দেখছিল!

না হোস্টেল নয়, বিশাখার বাড়িতেই নালক থেকে গেল। ক্ষমা চাওয়া-চাওয়ি, কান্নাকাটির পর। একদিন কলেজে যাওয়ার পথে বিশাখা নালককে ওর এটিএম কার্ড দিল, সংসার খরচের টাকা তুলে আনার জন্য। পরের মাসে বিশাখা দেখল ওর অ্যাকাউন্টে প্রায় হাজার দু'য়েক টাকা কম। তার পরের মাসে আবার... স্বভাবে ল্যাদ খাওয়া, মুখে জঙ্গি এই মেয়ে কিছুই সন্দেহ করেনি। ভেবেছিল তারই হিসেবে ভুল হচ্ছে। প্রায় সাত-আট মাস বাদে ব্যাঙ্কে গিয়ে বিশাখা তার জীবনে বেশ মনে রাখার মতো শকটা পেল।

প্রায় কুড়ি হাজার টাকা তার অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব!

বাড়ি এসে বিশাখা নালকের কলার চেপে ধরল। নালক অবিশ্বাস্য নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, "তোর টাকা কি আমার নয়?"

বিশাখা হতবাক ও স্তব্ধ হয়ে নালকের কলার ছেড়ে দিয়ে যেন নিজেকেই শোনাচ্ছে, এমন ফিসফিসিয়ে বলেছিল, "তা বলে চুরি করবি? আমার কাছে চাইলে আমি দিতাম না?"

এ হতাশ উক্তির উত্তর এল। আরও চমকপ্রদ উত্তর।

"তোর কাছে চাইতে আমার লজ্জা করে বিশ। নিজেকে ছোট লাগে। আমার কোনও রোজগার নেই। আমি তোর আশ্রিত! না চাইতেই তুই এত দিস। তাই এই চ্যালেঞ্জটা নিয়েছিলাম। আমার জীবনে তো কোনও উত্তেজনা নেই। এটাই ছিল আমার নিজস্ব উত্তেজক খেলা! তুই কষ্ট পেলি?"

আরও মাস দু'য়েক পর, ঘরের ঝুল ঝাড়তে-ঝাড়তে নালকের পাঞ্জাবির পকেটে বিশাখা আবিষ্কার করল একটা ঝাঁ চকচকে মোবাইল ফোন। নালক তখন বাড়িতে নেই। বিশাখার মন বলছিল, ওই ফোনে তার জন্য কোনও চমক অপেক্ষা করে আছে। কারণ নালকের যে আর একটা ফোন আছে, সে মোটেই জানত না। মেসেজ বক্সে গিয়ে বিশাখা পড়ল গুনে-গুনে সাতটা মেসেজ। পারুলের লেখা তিনটে আর পারুলকে পাঠানো চারটে। গ্যাদগ্যাদে নোংরা ভাষা, পর্নোগ্রাফিকেও হার মানায়। বিশাখা সবক'টা মেসেজ পড়ল। তারপর গুনগুন করে গান গাইতে-গাইতে ঝুল ঝাড়তে লাগল। দুপুরে ভাত খাওয়ার পর মশলা চেবাতে-চেবাতে সে নালকের সামনে তুলে ধরল সেই মোবাইল ফোন।

নালক একটুও না চমকে বলল, "ওঃ, তুই নিশ্চয়ই ভাবছিস, ওগুলো পারুলের সঙ্গে আমি এক্সচেঞ্জ করেছি। শোন বিশাখা, তুই হয়তো খুব শকড্ ওগুলো পড়ে। কিন্তু ওগুলো সত্যি পারুলের বা পারুলকে লেখা নয়। ওই নম্বরটায় তুই ফোন করলেই সব জানতে পারবি। তোকে জানানো হয়নি...গত মাস থেকে আমি একটা চাকরি পেয়েছি। সেই চাকরির সূত্রেই এই মোবাইল। ভদ্রলোক, মানে ব্যবসাটার মালিক নিজের নাম ডিজক্লোজ্ হয়, চান না। তাই পারুলের নামে নম্বরটা সেভ করা আছে।"

"কী চাকরি?"

"আমি এখন একজন পর্নোগ্রাফি লেখক। বই-প্রতি পাঁচ হাজার পাই। যে সব পড়েছিস তুই, তা আমার লেখারই অংশ। নায়ক-নায়িকার মধ্যে মেসেজিং হচ্ছে আর কী! মডার্ন পর্নোতে মোবাইল ফোন এক জরুরি উপাদান।"

নাঃ, বিশাখা কাউকে ফোন-টোন করেনি। তবে ডিভোর্স ফাইল করেছিল পনেরো দিনের মধ্যেই। পর্নোগ্রাফি লেখকটি ইদানীং একটা কলেজে পার্ট টাইম পড়ানোর চাকরি পেয়েছে, সে খবরও পেয়েছে বিশাখা। ডিভোর্স হওয়ার পর বিশাখা তার মা-বাবার সঙ্গেই থাকে। বাপের বাড়ির এক কোনায় বিশাখার আলাদা ঘর। আলাদা বাণিজ্য, বনসাই, বেলেল্লাপনা। বিশাখার নিজের মা-বাবার সঙ্গে সম্পর্কটা সুচতুর বিনিময়ের। বুড়ো বয়সে তাঁরা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। বিশাখার তাঁদের সঙ্গে থাকতে আসায় তাঁরা খানিক নিশ্চিন্ত হলেন। বুড়ো বয়সে দেখার লোক জুটল! মেয়ের সন্ত্রাসবাদী মেজাজ সহ্য করেন তাঁরা সেই সব সাত-পাঁচ ভেবে।

বিশাখা একসময় ভাল ওড়িশি নাচত। কিন্তু নাচ-টাচ বিদায় করেছে সে অনেক কাল হল। না, কোনও অত্যাচারী, শ্বাসরোধকারী, ব্যক্তিত্বহরণকারী পুরুষের জন্য বা রক্ষণশীল শাশুড়ির কারণে নয়। সে নাচ ছেড়েছে তার নিজের খেয়ালে। তার আর মেক আপ নিয়ে স্টেজে উঠতে ভাল লাগে না বলে। নাচ ছেড়ে দেওয়ার কারণে বা অত্যধিক মদ্যপানের কারণে সে এখন প্রায় ফুটবলের মতন গোল। তার কাটা-কাটা চোখ মুখ হাওয়া হয়ে গিয়েছে থোকা-থোকা মেদের আড়ালে। তবু ভাল করে খেয়াল করলে বোঝা যায় তাকে দেখতে সুন্দর ছিল একসময়। শিক্ষার ছাপ, রুচিশীল পোশাক, প্রখর ব্যক্তিত্ব আর দারুণ সুন্দর চুলে বিশাখা তাই এখনও অনেক মাথা ঘোরাতে পারে তার দিকে। মাস্টারির চাকরিতে দিনে অনেকটা সময় হাতে পাওয়া যায়। সে উদ্বৃত্ত সময়টা বিশাখা কাটায় ইন্টারনেটে প্রেম করে। বিশাখার বর্তমান প্রেমিক এক খ্যাতনামা বিজ্ঞানী। বিশাখার কলেজে বিগ ব্যাং-এর ওপর লেকচার দিতে এসেছিলেন। তুমুল প্রেম হয়ে গেল বিশাখার আর বিজ্ঞানীর, যাঁকে বিশাখা 'বিগার বি' বলে ডাকে। ভদ্রলোক সায়েন্সের লোক বটে তবে 'আবার' বলেন না। বলেন 'পুনরায়!' এতেই বাজি মাত।

বিশাখা বিল্বমঙ্গলকে মাঝে-মাঝেই বলে, "পুনরায়? কি মিষ্টি! কি মিষ্টি! এই লোকটার জন্যে আমি এখনও জ্যোৎস্না দিয়ে এঁকে ফেলতে পারি এক প্রচণ্ড কুঠার!"

বিল্ব মুখ ভেটকে বলল, "আঁশবটি আঁক বরং। পরের বার অ্যাকাউন্ট লুঠ করেছে খবর পেলে সেটা কাজে লাগবে," এখন বিল্বমঙ্গলের অফিসে বিশাখা ভদ্রলোকের মেলের অপেক্ষায় ক্লান্ত হয়ে নিদ্রারত। হয়তো মনে-মনে জ্যোৎস্না-মাখা কুঠারের স্বপ্ন দেখছে সে!

৯

সমুদ্রর প্রিয় পোশাক পাজামা-পাঞ্জাবি। সেই পোশাকেই তাকে সাজানো হল তার শেষযাত্রায়। মৃত্যুর পর মানুষের মুখে কোনও কষ্ট বা যন্ত্রণার ছাপ থাকে না। ঋষিকার কোমর জড়িয়ে ধরা সমুদ্রর সেই কাতর মুখ হারিয়ে গিয়েছে তার প্রাণের সঙ্গেই। সমুদ্রর প্রাণহীন মুখে এখন শুধুমাত্র ঘুমের ছাপ। সেই সুন্দর মুখ দেখে ঋষিকার সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ার কথা ছিল, অথচ জ্ঞান হারাল বোধিরূপ। বোধিরূপ থাকতেই পারল না সমুদ্রর শেষযাত্রায়। তার প্রেশার বিপজ্জনভাবে ওঠা-নামা করছে, তাকে ভরতি করা হয়েছে নার্সিংহোমে।

সমুদ্রর মা-বাবার এই বয়সে এই শান্তি প্রাপ্য ছিল না কিন্তু জীবন এক চূড়ান্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন ফাজলামি! সে বয়স, লজিক, উন্নয়ন বা জেব্রা ক্রসিং কিছুই মানে না। স্বাভাবিকভাবেই এই শোকের কশাঘাতে তাঁরা শয্যা নিয়েছেন। বিছানা ছেড়ে ওঠার অবস্থা নয় তাঁদের। রাকাকে সামলানো যাচ্ছিল না। শিবদাসবাবু মোটামুটি শক্ত ছিলেন বলেই তিনি রাকাকে আগলে বাড়ি নিয়ে গেলেন। জনি ঘাবড়ে গিয়ে প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়ছিল কাঁদতে-কাঁদতে...

ঋষিকা দেখল তার পাশে ধীরা ছাড়া কেউ

নেই।
ধীরা আর ঋষিকা মিলে সমুদ্রর মৃতদেহ সাজাচ্ছিল। ধীরা সহজে ভেঙে পড়েন না। আজ আরও শক্ত ছিলেন ঋষিকার মুখের দিকে চেয়ে। এই মেয়েটি তাকে প্রতি মুহূর্তে হতবাক করে দিচ্ছে। এত কঠোর, এত শান্ত এ রয়েছে কী ভাবে ভাবছিলেন ধীরা। ঋষিকাকে তার স্বাভাবিক লাগছে না। তিনি সংযম বোঝেন কিন্তু একে ঠিক শান্ত বলা যায় না... একটু বেশি স্বাভাবিককে কী বলে?
পাথর? পাষাণ? ধীরা শব্দ হাতড়াতে থাকেন, মেয়েটির দিকে আড়ে চেয়ে। ঋষিকার এমন সমাহিতভাব তাঁর সহ্য হচ্ছে না। ঋষিকাকে কাঁদাতে হবে। হবেই..
ধীরা সমুদ্রর কপালে হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন, "কী ভাল স্কিন ছিল ছেলেটার, ঝকঝকে, মসৃণ। তোমার বয়স বাড়লেও সমুদ্র আর বুড়ো হবে না। এইভাবেই থেকে যাবে তোমার সঙ্গে-সঙ্গে... যত দিন থাকবে তুমি।"
ঋষিকা তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ সমুদ্রর মুখের দিকে। তারপর বিহ্বল গলায় ধীরার দিকে তাকিয়ে বলল, "কে জানে, থাকবেই কি না! হয়তো ধীরে-ধীরে ভুলে যাব ওকে। মানুষ তো পুত্রশোকও ভোলে। জানো ধীরাদি, ও খুব ভেটকি মাছ ভালবাসত। কোনও দিন আর মুখে তুলতে পারব না মনে হচ্ছে আজ... কিন্তু সময় তো খুব নিষ্ঠুর! হয়তো সেসবও একদিন..."
এই টুকু বলে ঋষিকা স্তব্ধ হয়ে গেল। একদম পাথরের মতো। আর ধীরা কাঁদতে লাগলেন হাউহাউ করে। সকালবেলা রুকুকে যখন ঋষিকার সামনে দিয়ে রাকার বাড়ি নিয়ে যাওয়া হল, তখন ধীরা ভেবেছিলেন ঋষিকা কাঁদবে। নাঃ, তখন ঋষিকা শুকনো চোখে, ভ্যাবলা মুখে সমুদ্রর গলার কাছটায় হাত দিয়ে বসেছিল। ভাবলেশহীন মুখে রুকুর চলে যাওয়া দেখছিল। একবার উঠে গিয়ে রুকুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল...ব্যস, তারপর আবার সমুদ্রর কাছে এসে বসে পড়ল। ঠায় সমুদ্রর মুখ দেখছে...ধীরা পাশে ছিলেন। শুনলেন ঋষিকা বিড়বিড় করে বলল, "আর কয়েক ঘণ্টা, তার পরেই সমুদ্র নেই হয়ে যাবে।"
নিউ আলিপুরের বাড়িতে সমুদ্রর দেহ এসেছে সকালবেলা। সারারাত এ বাড়িতে মানুষ আনাগোনা করেছে, দমচেপে বিলাপ করেছে, দুষেছে নিজেদের দুর্ভাগ্য, তখন রুকু বেচারা ঘুমোচ্ছিল। সকালে তাকে দুধ খাইয়ে তৈরি করে দিয়েছে বাড়ির রাতদিনের কাজের লোক। তার সঙ্গেই তার চলে যাওয়ার কথা পিসির বাড়ি। গোলাপি জামা আর সাদা জুতো পরা সাত বছরের মেয়ের, সিঁড়ির মুখে দেখা হয়ে গেল মৃত বাবার সঙ্গে। একতলা থেকে দু'তলায় ওঠার সিঁড়ির বাঁকে। এদিকে সেই বাঁকে তখন একটা ছোট্ট মাকড়সা পিনপিন করে প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। একনম্বর সিঁড়ি থেকে সে উঠতে চায় দু'নম্বরে... সেখান থেকে তিন চার, পাঁচ...
শুয়ে থাকা বাবাইকে দেখে রুকু যত না বিস্মিত, তার চেয়ে বেশি সে থমকে গিয়েছে মাকড়সাকে দেখে। চোখ বিস্ফারিত করে সে দেখছে লিকলিকে পা, হন্তদন্তভাবে তার এগিয়ে চলা... হয়তো এক্ষুনি চাপা পড়বে, ফিচিক করে বেরিয়ে যাবে রস-রস কী যেন একটা... অ্যাঃ... গা শিরশির করে রুকুর... মরে গুটলি পাকিয়ে পড়ে থাকলে পিঁপড়ে আসে... তুলে নিয়ে চলে যায় বডিটা... আচ্ছা পিঁপড়ে কি মাকড়সা খায়?
ওদিকে বাবাইকে দ্যাখো, শুয়ে আছে তো আছেই! বাবাই কিন্তু জানে রুকু মাকড়সা ভয় পায়। তবু যে কেন চোখ খুলছে না, বলছে না কিছু!
"বাবাই, বাবাই, বাবাই... ওই যে ওই ওই," বলে সে হঠাৎ চুপ করে গেল। এক অজানা কারণে সে বুঝতে পারছে, সব অন্যরকম অন্যরকম, বিচ্ছিরি। খালি কান্না পায়। রুকু ঢোঁক গিলল। চুপ করে গিয়েছে সে। সবাই তাকেই দেখছে। রুকু ওর জামার কলারটা চেবাচ্ছে। তার রোমকূপ শিরশির করছে... বুক করছে ধকধক...ওরা কেউ কেউ কাঁদছে... মুখ লুকিয়ে ফেলে কাঁদার চেষ্টা করছে অনেকে... কেন?
"নমো করো রুকু, বাবাকে নমো করো," বলল মিনতিমাসি। মাসির আঙুল ধরে রুকু, দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ, এবার ঠক করে বাবাইকে একটা নমস্কার করে দিল। ওকে আলতো করে ঠেলে সরিয়ে বাবাইকে নিয়ে উঠে চলে গেল সবাই। দোতলার ল্যান্ডিংয়ে বাবাইকে ধরাধরি করে শুইয়ে দিল। ঠিক তখনই রুকুর ঠাকুরদাদা বেরলেন ঘর থেকে। কাঁপছেন ঠাকুরদাদা... বাবাইকে জড়িয়ে ধরে ঠাকুরদাদা কাঁদছেন তো কাঁদছেনই।
গোলাপি জামাটার কলারটা প্রাণপণে চুষে যাচ্ছে রুকু। আর দেখছে সবার কাণ্ড! ঠাম্মাকে ধরে-ধরে আনছে বড় ঠাম্মা। ও ঠাম্মার বড়দিদি। বড় ঠাম্মা খুব রাগী, গোঁফ আছে। এসব ভাবতে-ভাবতেই পরক্ষণেই, রুকুর বুক ঠেলে একটা কষ্ট হতে লাগল। ওই তো মাম্মা। চুপ করে তার দিকে তাকিয়ে দোতলার ল্যান্ডিংয়ে বসে আছে। নাঃ, মাম্মা কাঁদছে না! মাম্মা কাঁদলে মাম্মার ঠোঁট বেঁকে যায়, রুকু দেখেছে... এখন মাম্মার ঠোঁট সোজা আছে...
রুকু তাকিয়ে আছে ঋষিকার দিকে কিন্তু তার মুখ ফুটে কোনও শব্দ বেরচ্ছে না। মাম্মা কি একবার এসে তাকে কোলে নেবে? মনে হয় না। মাম্মা তার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু দেখছে না কিচ্ছু। তার মানে মাম্মার মন ভাল নেই।.. ও মাম্মা তুমি একটু কাঁদো, প্লিজ কাঁদো... তাহলে রুকু তোমায় আদর করে দেবে...ওইটা ধীরাদিদিয়া, মাম্মা ওকে ওই নামেই ডাকতে শিখিয়েছে...
"রুকুকে নিয়ে যাও মিনতি, ও বাড়ি পৌঁছে রাকাকে একটা ফোন করতে বলবে... যাও রুকু... বাবাইকে বাই বলে যাও," ধীরাদিদিয়ার গলা শুনে রুকু তার ছোট্ট ঘাড় তুলে দেখল দিদিয়া তার মাথার ওপর হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। না, না আছেন বলতে হয়... এই ধীরাদিদিয়াকে রাকাপিসি পছন্দ করে না... চিলি চিকেন খেতে দিয়েছিল পিসি ওদের, ধীরাদিদিয়া একটা খাম হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন দরজার কাছে, পিসি বলছিল,"খাবে, তুমি খাবে?" পিসির ভয়েস শুনে বোঝা যাচ্ছিল পিসির দেওয়ার ইচ্ছে নেই... জনিজনিকে ধীরাদিদিয়ার নামে বলছিল 'ফিলদি রিচ'... জনিকে রুকু জনিজনি বলে ডাকে... উজান বাবাইকে ডাকে বাসুবাসু... অ্যাই উজান, দ্যাখ তোর বাসুবাসু কেমন ঘুমোচ্ছে... আচ্ছা বাসুবাসু ঘুমোচ্ছে না ঘুমোচ্ছেন?
বাবাই চুপ করে শুয়ে আছে, বাবাইকে জিজ্ঞেস করা যাবে না। এত কাণ্ডেও বাবাইয়ের ঘুম ভাঙছে না মানে কি বাবাই মরে গেছে? মরে গেলে কী হয় কে জানে? কোথায় চলে যায়? ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েই যায়, না ঠাকুর এসে নিয়ে যায়... মাম্মা আসবে একবার, ও মাম্মা, কোলে নেবে?
মিনতিমাসি কাঁদছে...রুকুর হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল। কিন্তু এখানে কেউ হাসছে না...
"আঃ, মিনতি, তুই দাঁড়িয়ে রইলি কেন, তুই যা না... রুকুবাবু... যাও সোনা... আমি পরে আসব তোমার কাছে, মাম্মা আসবে... আমরা সবাই আসব..." ধীরাদিদিয়া বকুনি দিল মিনতিমাসিকে। মিনতিমাসি রুকুকে খপাং করে পাঁজাকোলা করে কোলে তুলে নিল। তারপর তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকল।
"খপাং, ঝকাং, ভতাং... কটাত, মতাট, ঘটাৎ..." বিড়বিড় করতে থাকল রুকু। কেউ অবশ্য শুনতে পেল না।
নার্ভাস হয়ে গেলে রুকু এসব আবোলতাবোল বকে। কেউ জানে না... টপ সিক্রেট... সিক্রেট... ট্যানটাট্যান... সিক্রেট... সিক্রেট সিক্রেট... বাবাইকে

বলবে রুকু... রাতে বাড়ি ফিরেই বাবাইকে বলবে...
রুকুর ঘ্যানঘ্যানের মধ্যেই ওদের পাশে ফুটপাতে এসে দাঁড়িয়েছে সান্তাক্লজ। সাদা গোঁফ-দাড়িতে ঢাকা মুখে তার স্মিত হাসি। হাতে ধরা ঘন্টা নাড়িয়ে-নাড়িয়ে বলছে, "মেরি ক্রিসমাস সোনা... যিশু তোমায় ভালবাসেন।"
রুকু তার প্রশ্ন ভুলে হাঁ করে সান্তা-ক্লজকে দেখছে। সান্তা তার জোব্বার ভিতর থেকে রুকুর জন্য বের করে আনল একটা চকোলেট। রুকু ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না চকোলেট সে নেবে কি না...
এই সময় আরও অনেক বাচ্চা এসে সান্তাকে ঘিরে ধরে দারুণ হইহই শুরু করে দিল। সান্তা সবার হাতে হাতে চকোলেট বিলোচ্ছে আর বলছে, "যিশু তোমায় ভালবাসেন।"
চোখের জলে রুকুর জামা তখন একেবারে নয়ছয়, নয়ছয়...
নেড়ে রুকুকে নিয়ে বাড়ির ভিতর চলে এলেন।
বাড়িতে রুকুর অনেক চেনা মানুষ। তারা রুকুকে সবাই খুব আদর করতে লাগল। রুকু প্রথমে গোঁজ হয়ে বসেছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। এ বাড়িতে একটা মামা আছে, যে সবার জন্য রান্না করে দেয়। সেই গোপালমামা গতকাল মোবাইল ফোন কিনেছে। কিন্তু গোপালমামা মেসেজ পড়তে জানে না, লিখতেও জানে না! উজান সেই জরুরি খবরটা রুকুকে দিতেই রুকু আর উজান হেসে কুটিপাটি হতে থাকে। সঙ্গে গোপালও। তখন তারা তিনজন ব্যস্ত হয়ে পড়ে ফোনের মেসেজ কাণ্ড নিয়ে!
এসব ঘটছে রাকার বেডরুমে। রাকা, শিবদাসবাবু, জনি, জনির মা কাবেরীদেবী ড্রয়িংরুমে টিভি চালিয়ে বসে আছেন। চোখের জল মুছতে-মুছতে তাঁরা ভাবতে থাকেন রুকুর জীবনের অঘটন নিয়ে। টিভিতে খবর হচ্ছে। কবি বিতান বসুর দেহ

কাবেরীর হঠাৎ কেমন কান্না পেল। সত্যিই তো, মেয়েটা এত কম বয়সে স্বামীকে হারাল।

ও বাড়িটা একতলা। বাগান আছে। বাগানে আছে মস্ত পাখির খাঁচা। সেই সব বন্দি পাখিরা রুকুকে দেখে কিচিরমিচির করে ওঠে। অন্যদিন রুকু প্রথমেই ওদের কাছে গিয়ে বকবকায়। আজ সে সেসব কিছুই করল না। মিনতিমাসির হাত ধরে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল মূল দরজার সামনে।
শিবদাসবাবু দরজা খুলে রুকুকে কোলে নিলেন।
"তুমি চলে যাও... ধীরাকে বোলো আমি আসছি একটু পরে।"
মিনতি ঘাড় নেড়ে চলে গেল। রুকু শিবদাসের ঘাড়ে মাথা হেলিয়ে দেয়।
"রুকু, চলো আমরা পাখি দেখে আসি," বলে শিবদাসবাবু বাগানের দিকে পা বাড়ালেন।
রুকু শিবদাসের পাঞ্জাবি আঁকড়ে ধরে বলল, "নাঃ, আমি পাখি দেখব না। জানো না আমি বড় হয়ে গেছি?"
শিবদাসবাবু থমকে গেলেন। তারপর মাথা নিয়ে শোকমিছিল বেরবে বাংলা অকাদেমি থেকে, একটার সময়। দাহ নয়। দেহ দান করা হবে সরকারি হাসপাতালে। সেই খবরে চোখ বুলোতে বুলোতে কাবেরীদেবী বললেন, "আহা, মেয়েটা এত কম বয়সে বাবাকে হারাল! বেচারা, বোঝেও না কিছুটি!"
জনি বলল, "না বোঝাই ভাল। বুঝলে তো বেশি কষ্ট।"
কাবেরীদেবী স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তা যা বলেছিস। আমিও তো ভগবানকে কতবার বলেছি, আমি কিছু বুঝতে চাই না। জানতে চাই না। বুঝলে তো কষ্ট বেশিই। তারপর অবশ্য সব সয়ে-বয়ে যায়। ওরও সয়ে যাবে একদিন। ঠাকুর সব সইয়ে দেন। তোরা চা খাবি আর একবার? বসাব?"
নাঃ, কেউ চা খাবে না। রুকুর জন্যেই সবাই অপেক্ষা করছিল। এবার সবাই ও বাড়ি যাবে।
"ঋষিকা শ্মশানে যাবে? না গেলেই পারত!" মিনমিন করে বলেন কাবেরী।
"আঃ, মা, কী পারত না পারত এখন তুলো না তো! ওর যা প্রাণ চায়, তাই করতে দাও," বলল রাকা।
কাবেরীর হঠাৎ কেমন কান্না পেল। সত্যিই তো, মেয়েটা এত কম বয়সে স্বামীকে হারাল। যা প্রাণ চায়, তাই করুক বেচারি।
এমন সময় শিবদাসবাবুর ফোন বেজে উঠল। কাবেরী স্বামীর দিকে একঝলক তাকিয়েই বুঝলেন ধীরার ফোন। স্থির দৃষ্টিতে তিনি তাঁর স্বামীকে দেখছিলেন। তেমন তলিয়ে কিছু ভাবছিলেন না। শুধুই দেখছিলেন। খানিকক্ষণ পর সংবিৎ ফিরে পেলেন কাবেরী। মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। কান লাল হয়ে গেল তাঁর। ছি-ছি, এভাবে ছেলেমেয়েদের সামনে স্বামীর দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকা... ওরা অবশ্য খেয়াল করেনি!
চটি ফটফটিয়ে কাবেরী তাঁর সংসার সামলাতে বাড়ির অন্দরমহলের দিকে পাড়ি দেন। এখন তাঁর ওপর অনেক দায়িত্ব! বাপমরা মেয়েটা এসেছে।... বাচ্চাটাকে ভুলিয়ে রাখতে হবে... আহা ওর বাবা নেই! ওর কত কষ্ট!
রুকু উজানের সঙ্গে হুটোপাটি করে খেলছে। বাড়ি ফাঁকা হয়ে যাওয়ার পর, পরম যত্নে কাবেরী দু'টো বাচ্চাকে স্নান করালেন, খাওয়ালেন। তারপর গল্প বলে বলে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। ঘুমোতে যাওয়ার সময় রুকু মাম্মাকে মিস করছিল। পিসিমাম্মামের গায়ের গন্ধটা রুকুকে ভুলিয়ে দিল তার মায়ের দুঃখ। এই গন্ধটা ও পেয়েছিল সেই জলপাইগুড়ির হোটেলের বাথরুমে। জলপাইগুড়ি বলে একটা শহরে মাম্মাম থাকত ছোটবেলায়। ওরা খুব 'গরিফ' ছিল।
রুকুর সব গন্ধ মনে থাকে। আর সব গন্ধের রং দেখতে পায় ও। এসব টপ সিক্রেট! কাউকে বলা যায় না। গড প্রমিস, গড ক্রস, কাউকে নয়! উজানকেও নয়।
ধীরাদিদিয়ার গায়ের রং স্কাই ব্লু। শিবদাদুর ইয়েলো... মাম্মামের স্মোকি গ্রিন... বাবাইয়ের হোয়াইট... বোধিরূপ আঙ্কেলের রেড...
বাবাই আবার কবে রুকুর কাছে ফিরবে কে জানে? মরে গেছে, বাবাই এখন মরে গেছে, রুকু ঠিক জানে... রুকু বড় হলে বাবাই ফিরে আসবে? এসো বাবাই, প্লিজ এসো। না তো রুকুর বড্ড মন কেমন করবে যে! অবশ্য বড় হয়ে তো রুকুর বয়ফ্রেন্ড হয়ে যাবে, বাবাইকে তখন রুকু বেশি সময় দিতে পারবে না! বয়ফ্রেন্ডটা কার মতো দেখতে হবে রুকু মনস্থির

করতে পারে না! শাহরুখের মতো... না, না, বাবাইয়ের মতোই হোক... টল অ্যান্ড হ্যান্ডসোম... শাহরুখের মুখ মিলিয়ে যায় রুকুর চোখের সামনে থেকে... ভেসে থাকে বাবাইয়ের মুখ... নাঃ, বড় হওয়া অবধি রুকু অপেক্ষা করতে পারবে না। তার আগেই বাবাইকে ফেরত চায় সে।

বেডরুমের টিভির ভল্যুম অফ করে কাবেরী একজন বয়স্ক কবির বিতান বসুর ওপর বাইট দেওয়া দেখছিলেন। রুকু ফুঁপিয়ে কেঁদে বিছানায় উঠে বসল।

"আমি বাবাইয়ের কাছে যাব। আমায় ও বাড়ি নিয়ে চলো দিদিমাম্মাম।"

কাবেরী থতমত খেয়ে গেলেন। রুকুকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে বললেন,

"বাবাই, মাম্মাম সবাই একটা কাজে গেছে বাবু, ও বাড়িতে কেউ নেই... তুমি এখন ঘুমু করো, আমরা বিকেলে যাব ও বাড়ি।"

"বাবাই তখন থাকবে তো?" কান্না ভেজা গলায় প্রশ্ন করল রুকু।

"থাকবে। থাকবে বাবু... এখন ঘুমোও তুমি... এসো আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিই..."

রুকু শুয়ে পড়ল। কান্নার দমকে তার ছোট্ট পিঠ কেঁপে-কেঁপে উঠল কিছুক্ষণ। তারপর স্থির হয়ে গেল।

রুকু ঘুমিয়ে পড়েছে। কাবেরী বিছানা ছেড়ে উঠে চলে গেলেন। তাঁর মন বড় উচাটন হয়ে আছে আজ। অমন চনমনে ছেলেটা এমনভাবে মরে গেল, মন কি আর ভাল থাকে?

ঋষিকাকে নিয়ে ও বাড়ির কেউ খুশি নয়। মেয়েটা রূপহীনা, বাপ মায়ের অবস্থাও তেমন নয়। সমুদ্র নিজেই বিয়ে করেছিল, শেষ দিন পর্যন্ত বউকে নিয়ে তার উৎসাহ উদ্দীপনার খামতি ছিল না!

নিজের অজান্তেই কাবেরীর বড় করে শ্বাস পড়ল। ভগবান কার কপালে কী লিখে যে পাঠান! মেয়েটা অত সুখ পেয়েও হারাল। কাবেরী ফের করজোড় করলেন, "ঠাকুর, ওকে দেখো ঠাকুর," বিড়বিড় করে বললেন। বিধবার জীবন তাঁকে যেন না ভোগ করতে হয়!

"মাসিমা খাবার দিয়েছি।"

গোপালের হাক শুনে কাবেরী টিভি বন্ধ করলেন। ঝুঁকে পড়ে রুকুর মুখটা আর-একবার দেখে নিলেন। তারপর অন্যমনস্ক পায়ে হেঁটে গেলেন ডাইনিং রুমের দিকে। দ্বিপ্রাহরিক খাবারের আয়োজন দেখে গোপালের প্রতি সদয়ও হলেন। লোকটার বুদ্ধি আছে। আজ নিরামিষ রেঁধেছে।

ধোঁকার ডালনা দিয়ে ভাত মাখতে-মাখতে ভাবছিলেন নানা কথা। ছেলেদের কথা। কেমন ভাসিয়ে চলে যায় এরা! ঋষিকার অমন কচি বয়স, কী নিয়ে থাকবে মেয়েটা এখন? স্বামী মরে গেলে আর কী থাকে মেয়েদের? যতই লেখালেখি করো আর ঝিয়ের রোল করো। মেয়েটার আর কি কিছু রইল! কত যন্ত্রণা এখন সইতে হবে মেয়েটাকে!

তিনিও কিছু কম সয়েছেন নাকি? ধীরার সঙ্গে ওনার যখন আশনাই শুরু হল, তখন তো ওনার বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। কানাঘুষোয় শুনলেন, ওই মেয়েমানুষটাও নাকি খুকি নয়। তারও চুল পেকেছে, চামড়া কুঁচকেছে। অথচ সেই আধবুড়ির জন্য উনি একেবারে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন!

সংসারের প্রতি অবশ্য কোনও অন্যায়

তাই বোধহয় তেমন রাগ-টাগ হয়নি কাবেরীর। হেরে গিয়েছেন তিনি, তেমন মনে হয়নি!

করেননি কোনও দিন। মাসে-মাসে কাবেরীর যা-যা মেটানোর, সব মিটিয়েছেন। আধিব্যাধিতে ডাক্তার-বদ্যি, ছোটাছুটিও করেছেন, কর্তব্য সবই করেন। ভালবাসাও মরেনি তাদের মধ্যে। সে উনি মানুষটার চোখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারেন। তবে এ বাড়িতে থাকেন না। সত্যি বলতে কি, কাবেরী তাঁর স্বামীকে এক রকম সমীহও করেন। উনি যা করেছেন, তা করতে বুকের পাটা লাগে। তলে-তলে দেখলে সব ব্যাটাছেলেরই মেয়েমানুষ পোষার শখ আছে! কিন্তু পারে ক'জন? তাছাড়া উনি আজ অবধি কোনও দিন কাবেরীর অধিকারে হাত দেননি। খারাপ ব্যবহারও করেননি কাবেরীর সঙ্গে। মানুষটার কর্তৃত্বের ক্ষমতা আছে। তবেই না সে তেমন তেমন পুরুষ!

প্রথমবার ধীরাকে দেখে তিনি তো অবাক। ভেবেছিলেন বেশ ছলা-কলা পটীয়সী, ন্যাকা-ডবকা হবে মেয়েমানুষটা। কোথায় কী? মাস্টারনি মার্কা ভাবভাব, দেখলে ভক্তিই হয়। এর গায়ে-গা ঘষে উনি কোন আনন্দ পান তাই বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

আর তাই বোধহয় তেমন রাগ-টাগ হয়নি কাবেরীর। হেরে গিয়েছেন তিনি, তেমন মনে হয়নি! তাঁর নিজের রূপে অনেক পতঙ্গ পুড়েছে এক সময়। তিনি তো আর পুরুষের মতো নির্লজ্জ নন যে, ওসবে ভেসে যাবেন। ছেলেরা হয় অমন চরিত্রহীন। তিনি মেয়েমানুষ। মায়ের জাত। তিনি তারিয়ে-তারিয়ে স্তুতি উপভোগ করেছেন। কিন্তু ঘর রেখেছেন ঘরের মতো। সেটাই আসল। ঘর না থাকলে মেয়ের আর থাকল কী!

যে-মেয়ের ঘরের লোভ নেই, সে আবার মেয়ে নাকি? সেও ব্যাটাছেলে। ওই ধীরার মতো। নাঃ, ধীরার সঙ্গে তাঁর কোনও কম্পিটিশন নেই। উনি তো আর ধীরাকে বিয়ে করতে যাননি। স্ত্রী-র মর্যাদা কেড়েও নেননি তাঁর কাছ থেকে। ধীরার সঙ্গে তাঁর তুলনাই হয় না। হ্যাঁ, তার মুখ পুড়েছে বটে, কিন্তু এখন সব গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। তাঁকে ঠকানো হয়েছে, এমনটা মনে হয় না তাঁর। সম্পত্তি, বাড়ি, গয়না, ছেলে-মেয়ে সব আগের মতোই আছে।

তবু মনটা খিচখিচ করে। রহস্যের সমাধান করতে পারেন না তিনি। শরীরের সুখ নয়, আরও কিছু ওই মেয়েমানুষ দেয় তাঁর মানুষটাকে। সেটা কী? যাক গে যাক, আজ আর এসব কথা ভেবে মন খারাপ করবেন না কাবেরী।

সমুদ্রটা এত অল্প বয়সে চলে গেল...

বেয়াই-বেয়ানের বুকে এখন কেমন আগুন জ্বলছে, কাবেরী বুঝতে পারেন। আজ নয়... কাল একবার ও বাড়ি যাবেন। এসব সময় পাশে গিয়ে বসতে হয়। চুপ করে বসতে হয় বইকি। জনির মুখেই শুনলেন, ধীরা নাকি ঋষিকাকে সামলে রাখছে, পাশে-পাশে থাকছে। থাকুক বাবা থাকুক, এ সময়ে কাবেরী হিংসে করবেন না। কাবেরীর মন এত ছোট নয়। ঋষিকা-বউমার কাছের মানুষ আর কে আছে তাঁর জানা নেই। এসময় যদি ধীরা ওর পাশে দাঁড়ায় তো দাঁড়াক! ফিল্ম লাইনে বউমা কাজ করে বটে, তবে কাবেরী শুনেছেন, ওইসব লাইনে কেউ কারও আপন হয় না! ননদের শ্বশুরের রাঁড়ই না হয় আপন হল! কথাটা ভেবেই কাবেরী জিভ কাটেন। ছি-ছি, তাঁর মন এমন একটা নোংরা কথা

ভাবতে পারল! রক্ষিতা বরং ভাল। রাঁড় খুব বাজে কথা। খাওয়া সেরে কাবেরী ফোন করলেন জনিকে। জনি জানাল, সমুদ্রর দেহ ওর অফিসে ঘুরিয়ে এখন ওরা শ্মশানের পথে।

"তোর বাবা কোথায়?"

"বাবা ধীরা আন্টির গাড়িতে। রাকা আর ঋষিকা রয়েছে ওদের সঙ্গে।"

"ও বাড়িতে বুড়ো-বুড়ি একা?"

"না, না, রাকার মামারা এসেছে। পিসি, জেঠু... অনেকেই আছে। বাচ্চাগুলো ঠিক আছে? রুকু খেয়েছে?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ সে চিন্তা করতে হবে না। কাজ মিটে গেলে একটা ফোন করে দিস বাবা।" ছেলের ফোন রেখে কাবেরী ফের টিভি খুলে বসলেন। বড় অস্থির লাগছে তাঁর। ঘুম আর হবে না আজ। নিউজ চ্যানেল খুললেন প্রথমে। ও বাবা! এখানে আবার কার বডি? ওঃ! বিতান বসুর শোকমিছিল দেখাচ্ছে টিভিতে।

কাবেরীর ভাল লাগল না সেসব দেখতে। তাড়াতাড়ি চ্যানেল পাল্টে তিনি সিরিয়ালে চলে গেলেন। আর কী আশ্চর্য! সেই সিরিয়ালে স্ক্রিন জুড়ে ঋষিকা। 'নন্দর মা' হয়ে চোখা চোখা ডায়লগ দিচ্ছে।

কাবেরীর মন বসে গেল সিরিয়ালে। ঋষিকার দুঃখ ভুলে তিনি 'নন্দর মায়ে'র দুঃখে ডুবে গেলেন।

দুপুর একটার কিছু পরে রবীন্দ্রসদন ক্রসিংয়ে বিতান আর সমুদ্রর দেখা হয়ে গেল। বিতান বাংলা অকাদেমি ছুঁয়ে চলেছে সরকারি হাসপাতালের মর্গের দিকে। আর সমুদ্র তার অফিস ছুঁয়ে চলেছে দাহ হতে, শ্মশানে। আস্ত দু'টো দিন বিতান ছিল হিমঘরে। বিতানের বিদেশে থাকা স্ত্রী-র জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে বিতানের পরিবারকে। ইঞ্জিনিয়ার এই মেয়েটির সঙ্গে বিতানের ইদানীং শীতল সম্পর্ক থাকলেও, খাতায়-কলমে তারা স্বামী-স্ত্রী। সম্পর্কের ভাঁজ-খাঁজ বা গোঁজের চেয়ে এই সব সময়, খাতা ও কলমের জোর বেশি। বিতানের মামা, কাকা, দাদারা খুবই সাধারণ, ভিতু মানুষ। তারা কবিতা বা কবি বোঝে না। কিন্তু জানে, কবি মানেই বিপজ্জনক এবং প্যাঁচালো একগাদা সম্পর্ক। আর বোঝে কাগজ-কলম। বউকে শেষ দেখা না-দেখিয়ে, কী করে তারা বিতানের দেহ দিয়ে দেয় মর্গে? সব খুঁটিনাটি সংসারী দৈনন্দিনতার কাব্যহীনতার মাঝে, মায়া মমতায় বড় জেরবার তারা আজও! তাদের সিদ্ধান্তেই বিতান থেকে গেল বরফ-বিছানা আঁকড়ে ধরে।

এদিকে সমুদ্রর মৃতদেহ রাতে থেকে গেল মর্গে। বাড়ির বড়রা ঠিক করলেন সৎকার হবে সকালবেলা। খুব ভোর-ভোর সমুদ্রর আত্মীয়-স্বজন সমুদ্রকে নিয়ে নিউ আলিপুরের বাড়ি ফিরেছিল।

প্রায় নিঃশব্দে সমুদ্রকে তিনতলায় তোলা হয়েছিল। তারপর সাজগোজ করিয়ে রওনা করিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার অফিসের দিকে। বাড়িতে অনেক লোক জমায়েত হওয়া সত্ত্বেও তেমন চিৎকার করে বিলাপ শোনা যায়নি। শোনা যায়নি কবিতা বা কোনও গানের লাইন।

বিতান আর সমুদ্রর মৃত্যুদৃশ্যে কোনও মিল নেই। শহর তার শোকের পরিবেশ থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। দু'দিনের কুয়াশা, স্যাঁতসেঁতে ভাব কাটিয়ে আজ কলকাতায় হাত পা মেলেছে ঝলমলে রোদ। দু'জনই শুয়ে আছে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত শববাহী গাড়িতে। ইতস্তত ফুলে ঢাকা দু'জনের দেহ।

আর কী আশ্চর্য, দু'জনের পরনেই সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি। পাশাপাশি দুটি মৃতদেহ দেখে পথচারী থমকাল, অন্যমনস্ক হল, মৃত্যুভয়ে উদাস হল কয়েক সেকেন্ড ....তারপর ফের নিজের-নিজের কাজে-অকাজে সামিল হয়ে গেল।

বিতানের শোকমিছিল আছে। অনেক কবি, সাহিত্যিক, বন্ধু হেঁটে-হেঁটে চলেছে তার দেহ নিয়ে। তাদের অনেকের হাতেই পোস্টার। তাতে কালো কালিতে বিতানের কবিতার লাইন। সমুদ্রর সঙ্গেও আছে মিছিল। তবে তারা কেউ হাঁটছে না। পাঁচটা গাড়িতে যাচ্ছে তারা সমুদ্রর সঙ্গে, তার শেষ যাত্রায়। ধীরার গাড়িতে শিবদাসবাবু, রাকা, পিন্টু আর ঋষিকা রয়েছে।

রবীন্দ্রসদনের মোড়ে গাড়ি দাঁড়াল যখন, ধীরা আড়চোখে ঋষিকার দিকে তাকালেন। ঋষিকা খুব ফিসফিস করে কী যেন বলছে। ধীরা কান খাড়া করলেন, একটু অস্থিরও হলেন...ঋষিকাকে প্রশ্ন করবেন, কী করবেন না বুঝে উঠতে পারলেন না।

'যখন আমায় ওপার থেকে গেল ডেকে...ভেসেছিলেম ভাঙা ভেলায়... গান গেয়েছিলেম...মনে রেখো...' গান ভেসে আসছিল বাইরে থেকে। ট্রাফিক সিগনালে রবীন্দ্রসংগীত। ঋষিকা কি তার সঙ্গেই গলা মেলাচ্ছে? ধীরা মেয়েটির দিক থেকে মুখ সরিয়ে বাইরে তাকান। চমকে উঠে দেখেন, তাঁদের সমুদ্রর মতো আরও এক মৃতব্যক্তি ট্রাফিক সিগনালে দাঁড়িয়ে, লাল আলো সবুজ হওয়ার অপেক্ষায়।

চারপাশে চাপা রাগ আর ধোঁয়ায় গুমরোচ্ছে যানজট। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'উপযুক্ত' বিষাদী লাইন। কী অবিশ্বাস্য এই কাকতালীয় মিলমিশ! ধীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অস্থির চোখে ঘাড় ঘোরালেন। বিতানের সঙ্গে হেঁটে চলা মানুষেরা এখন ছত্রখান। ধীরার গাড়ির পাশেই একটি রোগা ছেলে। বাঁ হাত কানে চেপে মোবাইলে কথা বলছে। তার হাতের পোস্টারে 'সর্বহারা' শব্দটা দেখতে পান ধীরা। সে ছেলের পাশেই আর-একটি মেয়ে। তার হাতে 'শোকস্তব্ধ'।

এসবের মানে কী বুঝতে পারছিলেন না ধীরা। পরক্ষণেই তাঁর মনে হল, এই বোধহয় বিতানের শোকমিছিল। আলাদা আলাদা শব্দ দিয়ে পোস্টার বানিয়ে ওরা নির্মাণ করতে চেয়েছে আস্ত কবিতার লাইন। যানজটে আটকে গিয়ে ভেস্তে গিয়েছে লাইন-বিন্যাস।

পিন্টু বসেছে পিছনের সিটে। সে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে। ধীরা ফের তাকালেন ঋষিকার দিকে। ঋষিকা একই রকম স্থির। আঠারো, সতেরো, ষোলো, পনেরো... কমছিল সিগনালের সংখ্যা। দশের নীচে নামতেই ধীরা স্টার্ট দিলেন গাড়িতে।

"ওফ, মা...মাগো!" বলে কিঞ্চিৎ জোরেই স্বগতোক্তি করলেন শিবদাস।

সবুজ হল আলো। সমুদ্রকে নিয়ে এগিয়ে গেল কাচের গাড়ি। পিছনে-পিছনে প্রায় পালানোর ভঙ্গিতে ধীরা।

বিতান থাক পিছনে পড়ে।

তবে বিতানের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা লোপ করেছে তার বন্ধুর দল। গাড়িতে থাকলেও তার গতি নিয়ন্ত্রিত। তাকে যারা ঘিরে রয়েছে, শোকে, নেশায়, মাতোয়ারা, তারা হাঁটছে। বিতানের সঙ্গে হাঁটছে।

বিতানকে তারা আরও কিছুক্ষণ নিজেদের কাছে পেতে চায়। তাদের ফেলে রেখে বিতান কোথায় যাবে? জীবদ্দশায় যে বন্ধুরা তাকে ছেয়ে ছিল, মরে গিয়ে তাদের কী করে বাদ দেবে সে? বন্ধুদের উচ্ছ্বাস, উপহাস, আর উগ্রপন্থা উপেক্ষা করার সাধ্যি তার ছিল না কোনও দিন।

এখন তো নেইই!

সিগনালে আটকে থাকা বিতানের শব ও মিছিল ঋষিকাও দেখল। আর তখনই তার ফের মনে পড়ে গেল হেমাঙ্গিনীর কথা। বিতানের বর্তমান স্ত্রী কি তার সেই হারিয়ে যাওয়া পাড়াবেড়ানি ছ্যাবলা বন্ধুটিই?

সিগনাল পেরচ্ছে যখন গাড়ি, তখন চিরদীপ আর বরুত্রীকেও দেখতে পেল ঋষিকা। দু'জন দু'জনের হাত ধরে মাথা নিচু করে হাঁটছে বিতানের শব নিয়ে।

আর ওদের ওই হাঁটার দৃশ্যতেই কাজ হল। ঋষিকা কাঁদতে লাগল হু-হু করে।

ধীরা গাড়ির গতি কমিয়ে, শান্তিতে চোখ

বুজলেন।
সমুদ্র নয়, বিতানের মৃতদেহ দেখে কাঁদছে মেয়েটাও। তাও ভাল। কাঁদছে তো!

সৎকার সেরে ঋষিকা বাড়ি ফিরে দেখল বাড়িতে আরও আত্মীয় সমাগম ঘটেছে। তিনতলার ঘরে তাকে নিয়ে গেলেন ধীরাই। দরজা বন্ধ করে দিলেন ভিতর থেকে।
"তুমি স্নান করো ঋষিকা। ভাল করে স্নান করো। আমি এই ঘরে বসছি। আপাতত এ ঘরে আর কেউ আসবে না।"
ঋষিকা কোনও কথা না বলে বাথরুমে গেল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, নিজের মৃত স্বামী নয়, তার সন্তান নয়, আবার তার মনে পড়ল চিরদীপ আর বরুত্রীর ওই মাথা নিচু করে হেঁটে যাওয়ার দৃশ্য। মুখ ভেঙে চুরে যেতে থাকে তার। গোঙানির মতো আওয়াজ বেরল তার মুখ থেকে। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে-পড়তে বলল, "সমুদ্র...ফিরে এসো সমুদ্র...আমায় ধ্বংস করলে কেন এভাবে?"
ধীরা বাথরুমের দরজায় কান পেতে রইলেন।
কান্না নয়, এক ধরনের অসহায় কষ্ট শক্তপোক্ত এই নারীকে আক্রান্ত করেছে। স্বামী মানে কী, ধীরা জানেন না। গত পনেরো বছর তিনি একটি পুরুষের ঘর করেন বটে, কিন্তু সেই পুরুষ খাতায়-কলমে তার স্বামী নন!
শিবদাসবাবু হিন্দি সিনেমার বিরাট ভক্ত। সেসব সিনেমার গোদা রসিকতায় হেসে লুটোপুটিও হন। দুঃখের দৃশ্যে খুব কাঁদেন। মাঝেমাঝেই ধীরার কোমর জড়িয়ে বলেন, "হাম আপকে হ্যায় কৌন!"
ধীরা ফিসফিস করে বললেন, "জানি ঋষিকা, বুঝি...সমুদ্রকে ছাড়া তোমার হাড় হিম করা কষ্টর সবটাই বুঝি... সহ্য করো। ঋ...সহ্য করো...যে-মেয়ে ভালবেসেছে, তার সহ্য করে যাওয়া ছাড়া আর যে কোনও উপায় নেই..."
স্নানেও তেমন মন দিতে পারল না ঋষিকা। অসহ্য, অস্থিরভাবে সে দু'-তিন মগ জল ঢেলে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। কোনও রকমে একটা হাউসকোট জড়িয়ে সে ভেজা চুলে বসে পড়ে বিছানায়।
"রুকুকে আনিয়ে নেব ঋ? ওকে অনেকক্ষণ দ্যাখনি...দেখবে ওকে?"
ঋষিকা ক্ষীণ ঘাড় হেলিয়ে দেয়। ধীরা তাঁর মোবাইলে ও বাড়ির ল্যান্ড-লাইন ধরেন। কাবেরীর সঙ্গে কথা বলতে তাঁর ভাল লাগে না একটুও। কিন্তু আজ আর কোনও উপায় নেই। বাড়ির সকলেই এখনও এ বাড়িতেই। কিন্তু কাবেরী নয়, ফোন ধরল গোপাল। জানাল কাবেরী বাচ্চা দু'টোকে নিয়ে এ বাড়ির দিকেই এসেছেন।
"কাবেরী বাচ্চাদের নিয়ে আসছে। তুমি চেঞ্জ করবে তো? তাহলে নীচে যাই?"
ধীরা ঋষিকার মাথায় হাত রেখে প্রশ্ন করেন।
"নীচে যেও না, তুমি ছাদে থাকো। আমি চেঞ্জ করে ডেকে নিচ্ছি তোমায়। নীচের মানুষগুলো কেউ তোমায় পছন্দ করে না। তুমি আমার সঙ্গে থাকো... সমুদ্র... সমুদ্র তোমায় খুব সম্মান করত ...আমিও..."
বাক্যটা শেষ করতে গিয়ে ঋষিকার গলাটা কেঁপে গেল। ব্যস ওইটুকুই। তার বেশি নয়।
মাটি ছেড়ে উঠে সে আলমারি খুলে শাড়ি বের করল। ধীরা মন্থর পায়ে ঘরের লাগোয়া ছাদে গিয়ে দাঁড়ালেন। অন্য সব সময়ের মতোই এখনও ধীরার মুখ নরম ও শান্ত। চোখ কিছুটা লালচে হয়ে আছে, নিরবচ্ছিন্ন কান্নার জন্য। এছাড়া মুখে কোনও কঠিন, কঠোর রেখা নেই। তাঁর মুখে কখনই কোন তাচ্ছিল্যের বক্রভাব থাকে না। তবে সমাজ তার রূপ বা গুণ কিছুই চোখ মেলে দেখে না। সমাজের কাছে তাঁর একমাত্র পরিচয়, তিনি এক বিবাহিত পুরুষের ঘর ভেঙেছেন। সেই পুরুষের সঙ্গে বিবাহ না করেও বসবাস করেন।
তিনি কিন্তু আদপেই বিশ্বাস করেন না তিনি কারও ঘর ভেঙেছেন বলে। কাবেরী নামক ভদ্রমহিলাটির ঘর যেমন ছিল, তেমনই আছে। কাবেরীর চাওয়া-পাওয়ার সব হিসেব শিবদাস চিরকাল যেমন ভাবে মিটিয়েছেন, তেমন ভাবেই মেটান আজও। তিনি মনে মনে সত্যিই বিশ্বাস করেন কাবেরী আর শিবদাসের সম্পর্কটাই অবৈধ। সমাজের সিলমোহর পড়লেই একটা সম্পর্ক বৈধ হয় না। যাঁদের মধ্যে সাংসারিক দেওয়া নেওয়া ছাড়া কোনও দিন আর কোনও গভীর কিছুই গড়ে ওঠে না, তাঁদের সম্পর্কটাকে ধীরা সম্পর্ক বলে মানেন না। বৈধতা বা অবৈধতা তো আরও পরের কথা।
চারপাশের গড়পড়তা জনতা ভাবে শিবদাস নব শরীরের লোভে তাঁর কাছে পড়ে আছে। কিন্তু ধীরা আর শিবদাস ছাড়া কেউ জানেই না শিবদাসের যৌন জীবনের এক গোপন তথ্য! বছর পনেরো আগে শিবদাসের একটি বিশেষ জায়গায় ক্যানসার ধরা পড়ে। এবং বিদেশে গিয়ে তাঁর চিকিৎসাও হয়। সে সময়েই শিবদাসের পুরুষাঙ্গ অস্ত্রোপচার করে বাদ দিতে হয়েছিল!
ধীরা আর শিবদাসের সম্পর্কটা শরীর ছাপিয়ে গিয়েছে অনেক যুগ আগে। এসব কথা বাইরে কাউকেই বলেননি তাঁরা। তাঁদের কাজের জন্য বহিরাগত কারও মরাল সাপোর্টও তাঁরা চাননি কোনও দিন। নাঃ, শরীর নিয়ে তাঁর কোনও ছুৎমার্গ নেই। প্রেমিকের সঙ্গে স্বাভাবিক শরীরী সম্পর্ক থাকবে, এতে লজ্জা পাওয়ার কোনও কারণ দেখেন না তিনি। কিন্তু শরীর বাদ দিয়েও তাদের টান রয়ে গিয়েছে কত কুড়ি বছর ধরে, একই রকম।
"ধীরাদি..."
ঋষিকার আঁতকে ওঠা কণ্ঠস্বর শুনে ধীরা চটপট ঘরের ভিতর চলে এলেন।
"এগুলো কী? সমুদ্রর ট্যুর ব্যাগে এসবের অর্থ কী? আমি...আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না, ধীরাদি, তুমি এসবের মানে জানো?"
ধীরা দেখলেন মাটির ওপর একটা ব্যাগ লন্ডভন্ড হয়ে পড়ে রয়েছে। তার ভেতর থেকে উঁকি মারছে একটা পরচুলা, মেয়েদের বেশ কয়েকটা অন্তর্বাস, লিপস্টিক, নকল স্তন, রঙচঙে ফ্রেমওয়ালা সানগ্লাস, লেস দেওয়া নাইটি, প্যান্টি... এটাই সমুদ্রর ট্যুর ব্যাগ! ধীরা একবার তাকিয়েই যা বোঝার বুঝে গেলেন। হাত বাড়িয়ে ঋষিকাকে ধরে তিনি বললেন, "এক্ষুনি দরজা বন্ধ করো। এই ঘরের বাইরে যারা আছে, তাদের কাছ থেকে সমুদ্রকে আমাদের বাঁচাতেই হবে!"

***

বিশাখার দ্বিতীয় বিয়ে নিঃসন্দেহে একটা বিশ্ব-রেকর্ড তৈরি করেছে। নালক আর বিশাখা বছর দেড়েক স্বামী-স্ত্রী ছিল। বিয়ে হল, বিয়ে ভাঙলও, নালকের মা-বাবার সঙ্গে বিশাখার কিন্তু একবারও দেখা হল না। বিয়ের সময় নালক বলেছিল তার বাবার হৃদয়ের দোষ! ডিম ভরা ট্যাংরা দেখলে নাকি ভিরমি খাবেন! কথাটা অশ্লীল হিসেবে ধরবে কি না বিশাখা বুঝে পায়নি। মানুষের সন্তান আর ট্যাংরা মাছের ডিম কি এক! কুচি মারা যাওয়ার পর নালকের বোন এসেছিল নার্সিংহোমে। কিন্তু মা-বাবা কখনও তাদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করেননি। বিশাখার মারাত্মক উৎসাহ ছিল এমনটাও নয়। সে নালককে নিয়ে তখন খাবি খাচ্ছে, নতুন এক জোড়া শ্বশুর-শাশুড়ি নিয়ে খাবে না মাথায় মাখবে?
"তুই তোর বাবা-মাকে মিস করিস না?"
বিশাখা মাঝে-মাঝে প্রশ্ন করত নালককে। নালক কোনও প্রশ্নের সোজা জবাব দিতে অভ্যস্ত নয়। সে নানা প্যাঁচ মার্কা উত্তর দিত এসব প্রশ্নের। বিশাখা অপরাধী

কণ্ঠে বলত, "আমার জন্যই তুই বাপ-মা খোয়ালি নালক। আমার ওপর তোর রাগ হয়?"
"তোর জন্য কেন খোয়াব? আমাকে তো বাবা আগেই ত্যাগ দিয়েছে!"
"ত্যাগ দিয়েছে মানে? ত্যাজ্যপুত্র? উঃ সে তো পঞ্চাশ বছর আগে হত। এখনও সেসব হয় নাকি? পুরনো নভেল টভেলে পাওয়া যায়.... হাউ এক্সাইটিং! বল না একটু ডিটেলে। ড্রেসিং গাউন পরা বাবা, চুরুট খেতে-খেতে শ্বেতপাথরের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন। মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ। বেরিয়ে যাও কুলাঙ্গার, তোমার মুখ দর্শন করতে চাই না। তোমায় ত্যাজ্যপুত্র করলাম আমি। আজ থেকে জানব আমার ছেলে মরে গেছে। ফাটাফাটি...এমনটাই হয়েছিল?"
নালক মুগ্ধ হত বিশাখার এ সমস্ত উচ্ছ্বাসে। বাস্তবের সঙ্গে বিশাখার তেমন সম্পর্ক নেই কোনও দিন। বইয়ের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা তুলে নিজের জীবনে বসিয়ে বিশাখা বাঁচতে চেয়েছে সব সময়। যে-কোনও সিচুয়েশন সে সামলেছে কোন ফিকটিশাস চরিত্রের আয়নায় নিজেকে মেলে ধরে। নালকের মতো আজগুবি, উড়নচণ্ডী আর দায়িত্বজ্ঞানহীন পুরুষের জন্য বিশাখার মতো মেয়ে একেবারে দৈব-প্রেরিত। নালক আনন্দে ডগমগ হয়ে তার ত্যাজ্যপুত্তুর হওয়ার গল্প শোনাতে থাকে।
"নাঃ, ঠিক এতটা সিক্সটিজের প্রেক্ষাপট নেই আমাদের বাড়িতে। তবে ওই মুখ-ফুক দেখবে না এটা বলেছিল বটে।"
"কবে বললেন? কেন বললেন, সেসব বল! কী করেছিলি তুই?"
"আমি বিহার পালিয়েছিলাম, আল্ট্রা লেফ্‌ট বিপ্লবী হব বলে...কিন্তু দুমকা পেরনোর আগেই বাবার পোষা কুত্তাগুলো আমায় ধরে আনল! আমার আর র‍্যাঁবো হওয়া হল না! বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই ক্যালানি খেলাম। যত বলি আমি র‍্যাঁবো হতে চাই, তত মারে আর বলে র‍্যাঁবো কোথায় থাকে বল, তার বাপকে গিয়ে বলব ছেলেকে সামলাতে।"
বিশাখার আনন্দের সীমা থাকে না। সে বলল, "র‍্যাঁবোর নামই শোনেনি তোর বাবা! বলিস কী রে!"
"কী করে শুনবে? র‍্যাঁবো শোনা অত সহজ না! দোকানদারি করে সংসার চালিয়েছে সারা জীবন। আমরা অবশ্য বলতাম, আমার বাবা বিজনেসম্যান! ইংরেজিতে বললে একটা গেরামভারী ব্যাপার আসে। তো যা বলছিলাম, সে যাত্রায় ত্যাগ দিল না তবে আমায় চোখে চোখে রাখত। টুয়েলভ পাশ করে কলকাতায় চলে এলাম, তখন আউট অফ সাইট, আউট অফ হিজ় মাইন্ড ছিলাম কয়েকদিন। তারপর বাড়িতে হাশিস নিয়ে ধরা পড়লাম, বাস আর ত্যাজ্যপুত্র হওয়া ঠেকায় কে?"
"হাশিস? ও মাই গড! পেলি কোথায়?"
"মেডিকাল কলেজের একজন মুর্দফরাস আমার বন্ধু ছিলেন এক সময়। তিনিই রেগুলার সাপ্লাই দিতেন। ওটা ওঁর সাইড বিজনেস।"
"মুর্দফরাস! মানে ডোম! বাবা! তুই এমন সাধু বাংলায় বলছিস! অ্যাই জানিস নালক, আমি কখনও ডোম দেখিনি। কেমন দেখতে হয় রে ওদের? সব সময় নেশা করে থাকে? লাল চোখ! ওঃ হোয়াট আ প্রফেশন! মরা-ফরা নিয়ে কোনও রোম্যান্টিসিজ়ম থাকে না ওদের। ভয়ও থাকে না। হ্যাঁরে নালক, ডোমের ছেলে ডোম হবেই? তাই নারে? স্কুল মাস্টার কিন্তু কক্ষনও চায় না তার ছেলে স্কুল মাস্টার হোক। বাট মাস্টারের তাও সমাজের সিঁড়ি বেয়ে ওঠার অপরচুনিটি আছে। ছেলেকে ঠেসে টিউটর দিয়ে দেবে! বাট ডোমের ছেলে! আই ডাউট। অবশ্য এখন জাতপাত নিয়ে মারামারি ওয়েস্ট বেঙ্গলে নেই বললেই চলে! অ্যাই, বল না, কেমন দেখতে হয় ওদের?"
নালক মুচকি হেসে বলেছিল, "কেমন আবার? গরিব মানুষের মতনই দেখতে! এরা সব সমাজের নিচুতলার মানুষ।
মেথর, মুচি, ডোম আমাদের চারপাশের কলকাতার ভাঁজে-ভাঁজে যে অদৃশ্য নগর, সেখানে এদের বাস। তোর মতন আপার মিডিল ক্লাস ভণ্ডরা এদের দেখবে না, এ আর বেশি কথা কী!"
উত্তরে বিশাখা নালককে চিমটি কেটেছিল। নালকের ধপধপে ফরসা গাল লাল হয়ে গিয়েছিল।

আজ বিতান বসুর মৃতদেহ যখন সরকারি হাসপাতালে দান করা হল তখন সেখানে বিশাখা ছিল। একজন সাধারণ দেখতে লোক, ক্ষয়াটে মতো চেহারা, রং-চটা শার্ট-প্যান্ট পরা ট্রলি ঠেলে-ঠেলে বিতানের দেহ নিয়ে চলে গেল। এই প্রথম জীবনে ডোম দেখল বিশাখা। ডোম দেখে তার নালকের কথা খুব মনে পড়ছিল। আহা ছেলেটা র‍্যাঁবো হতে চেয়েছিল!
এটাও বিশাখার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তার দুই প্রাক্তন স্বামীকেই সে এখন স্নেহের সঙ্গে মনে করতে পারে যখন-তখন।
হাসপাতালে বিশাখার সঙ্গে পারিখও ছিল। বিল্বমঙ্গল আসেনি। বিল্বর একজন প্রাক্তন প্রেমিক, সমুদ্র মুখার্জি, সেও নাকি হঠাৎ স্ট্রোকে মারা গিয়েছে আগের দিন। এই সমুদ্র নাকি বিবাহিত ছিল! বোঝো কাণ্ড! ভাবে বিশাখা!
'বাইসাইকেল কেস,' বলত নালক এই ধরনের পুরুষকে।
বিতানকে যখন স্টিলের ষ্ট্রেচারে শুইয়ে নিয়ে যাচ্ছে তখন পারিখ ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগল। কান্নার ফাঁকে-ফাঁকে জানাল পারিখের ঠেকে বিতান দিনের পর দিন কেমন পারিখকে বুঝিয়েছে টেগর ব্রামভন নয়, ব্রামভন নয়!
"পিরালি, পিরালি" অধৈর্য হয়ে বলল বিশাখা।
পারিখ চোখ মুছতে-মুছতে ঘাড় নাড়ল। বলল, "আমার একমাত্র পোয়েট বন্ধু, একমাত্র শিক্ষিত বন্ধু মরে গেল বিশাখা। আমার এ লস তুমি ভাবতে পারবে না। কত কত পোয়েম ও আমার ঠেকে বসে লিখেছে। আমায় শুনিয়েছে ফার্স্ট ড্রাফ্‌ট। ওঃ, হাউ আই উইল মিস হিম।"
বিশাখা কাঁদেনি। সে দেখছিল বিতানের স্ত্রীকে। নীল জিন্‌স আর সবুজ টি-শার্ট পরা ভদ্রমহিলার বয়স কত? চল্লিশ হয়েছে? গয়না ও মেক-আপহীন ভদ্রমহিলা চশমাটা চুলের ওপর তুলে রেখে শান্ত মুখে বিতানের গাড়ির কাচ ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। বেশ লম্বা, ঝকঝকে চেহারা, ...অনেকেই এসে সমবেদনা জানাচ্ছেন, সবার জন্যই তিনি মাপা হাসি হাসছিলেন। বিশাখা শুনেছিল ইনি পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। বিদেশে সম্ভবত, ইউরোপের কোথাও থাকেন।
পারিখ দাঁড়িয়েছিল ভদ্রমহিলার পাশে। ফিসফিস করে কথাও বলছিল মাঝেমাঝে ওঁর সঙ্গে। এক ফাঁকে বিশাখাকে এসে জানিয়ে গেল ভদ্রমহিলা ইস্তাম্বুলে থাকেন। ইস্তাম্বুল! মানে কনস্ট্যান্টিনোপোল। অটোমন সাম্রাজ্য। আহা, শুনলেই রোমাঞ্চ হয়! বিশাখা ভক্তিভরে তাকায় ভদ্রমহিলার দিকে। মনে-মনে ভাবে, বিতান লাস্ট ল্যাপটায় ভালই দাঁও মেরেছে। বিতানের দেহ গাড়ি থেকে নামানোর পর তরুণ কবির দল বিপুল উদ্দীপনায় বিতানের কবিতা আওড়াতে শুরু করল।
বিশাখা একটু দূরে, হাসপাতালের সিঁড়িতে বসে ছিল। ভদ্রমহিলা এসে তার পাশেই বসলেন। তারপর নিরাসক্ত ভঙ্গিতে ফোন ডায়াল করতে শুরু করলেন।
"শোনো রক্তিম, এয়ার টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না। তুমি দার্জিলিং মেলে করে দাও। হ্যাঁ-হ্যাঁ... না, ওখানেই আছি," ফোন রেখে তিনি বিশাখার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। হাসি। হাসি মানুষের বয়স বলে দেয়। এই ভদ্রমহিলা অবশ্যই চল্লিশ পেরিয়েছেন। বিদেশে থাকেন বলে হয়তো বোঝা যাচ্ছে না। বিশাখা ওঁর হাত দুটো ধরে বলল,

"জল খাবে? আছে আমার কাছে।"
ভদ্রমহিলা বিশাখার দেওয়া জলটা খেলেন। তারপর হাতের পিঠে মুখ মুছে বললেন, "আমার নাম হেমাঙ্গিনী... তুমি?"
বিশাখা মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, "আমি বিশাখা। আমরা যারা তিরিশ ছুঁই-ছুঁই, তারা প্রত্যেকে প্রেমে পড়ে বিতানের কবিতার লাইন প্রেমিকদের মেসেজ করেছি...আমি, আমরা এখন আর কেউ চিঠি লিখে প্রেম করি না।"
হেমাঙ্গিনী আবার হাসলেন। বললেন, "বিতান নিজেও ইদানীং মোবাইলেই প্রেম করত। চিঠিতে নয়।"
বিশাখা অল্প হেসে বলল, "হুঁ। বিতানদার টেকনোলজির প্রতি টান ছিল, শুনেছিলাম।"
"ওর প্রথম স্ত্রী-র লেখা প্রেমপত্র ফেলে দিয়েছিলাম বলে আমার ওপর যা চোটপাট করেছিল! রাশি-রাশি চিঠি ও বাড়ির এদিক, ওদিক। বিভিন্ন বয়সের, নানা ধরনের মেয়েদের লেখা! আমাকে বিতান অনেকক'টা পড়িয়েওছে! একজন লিখেছিল, এ লেটারের উত্তরে তুমিও আমায় একটা লেটার ঝেড়ে দিও!"
বিশাখা হেসে ফেলে সামলে নিল।
হেমাঙ্গিনী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, "প্রেমে না-পড়েও মানুষ কী দারুণ প্রেমে মশগুল থাকতে পারে। প্রেমের লাইন লিখতে পারে, তাই না?"
বিশাখা থতমত খেয়ে গেল। হাসি আপনা-আপনিই মুছে গেল তার।
হেমাঙ্গিনী কোনও প্রতিক্রিয়ার তোয়াক্কা না করে বললেন, "বিতান কোনও দিন কারও প্রেমে পড়েনি। অথচ কী তুখোড় ওর প্রেমের কবিতা—আজও পড়তে বসলে কাহিল-কাহিল লাগে। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না, আসল লোক কোনটা? যে লেখে ওইসব অনন্য লাইন, যে আট টাকার জন্য রিকশাওয়ালার সঙ্গে হাতাহাতি করে, যে যৌনকর্মীর ঘরে গিয়ে মদ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, নাকি যে এক বাচ্চা কবিকে দিয়ে পেডিকিওর করায়! হয়তো সব কটাই, সব কটাই, যত দিন পাঠক ছিলাম, ততদিন এই আশ্চর্য কন্ট্রাস্ট, এই অনিশ্চিত, অ-নিরাপদ যাপনে মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু বউ হয়েই হল কাল...বউরা কেবল মেলানোর চেষ্টা করে যায়। যার পরিণাম...নাঃ। তুমি নিশ্চয়ই জানো! বিশাখা তুমি বিয়ে করেছ?"
বিশাখা আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বলল, "করেছি, হেমাঙ্গিনী। দু'বার। টেকেনি। আসলে ছেলেরা..."
"নাঃ, ছেলেরা-টেলেরা কিছু নয়। বউ মানেই নির্মম বেনে।"
"ওরেব্বাবা! তুমি ছেলেদের পক্ষে নাকি?"
"উঁহু। আমি মেয়েদের পক্ষে। কিন্তু বউ-বাদের বিপক্ষে! এই আমাকেই দ্যাখো না, বিতানকে দূর থেকে মেয়ে হিসেবে চিনলে, আমিও ওই ওদের মতন লাগামছাড়া উন্মত্ততায় বিলাপ করতে পারতাম, পারছি না। আর পারছি না বলেই বড্ড কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে, বিতানের প্রতি এ আমার অবিচার। এতটা অপমান, এতটা তাচ্ছিল্য আমার কাছ থেকে বিতানের প্রাপ্য নয়। আসলে এটা হেমাঙ্গিনীর তাচ্ছিল্য নয়। এ একটা বউয়ের অবহেলা! ওই বানিয়াগিরি প্রসূত হতশ্রদ্ধা! ওঃ...ভালবাসা মরে গেলে যে কী একা লাগে!"
বিশাখাকে প্রস্তুত হওয়ার সময় না-দিয়ে আচমকা হেমাঙ্গিনী কাঁদতে থাকলেন। বিতানকে কেন্দ্রে নিয়ে যে-গুঞ্জনের বিস্তার হচ্ছিল চত্বর জুড়ে, তা মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল।
বিশাখার মনে হয় এরা সবাই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল এই পবিত্র সংকেতের! জড়ো হওয়া সবাই এক পা-এক পা করে এগিয়ে এল হেমাঙ্গিনীর দিকে। হেমাঙ্গিনীকে ঘিরে ফেলল তারা। গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চুপ, নিস্পন্দ। সদ্য স্বামীহারার কান্না তাদের স্বস্তি দেয়। তারা হাঁফ ছাড়ে। এ রোদন থেকে নিস্তার পায় না বিতানের পরিজন।
একে একে সবার চোখ উপচিয়ে ওঠে। কাব্য নয়, কোন ইজম নয়, দর্শন নয়, সঙ্ঘ নয়, হঠাৎ ছুটি নিয়ে নেওয়া আত্মহত্যাকামী, পাপী, জীবনের সঙ্গে গোপন জুয়ারি মানুষটার কথা ভেবে আর্ত শোকধ্বনি ছেয়ে ফেলল সরকারি হাসপাতালের চরাচর। বিশাখার মনে হল, সে কোনও প্রাচীন প্রায় বিলুপ্ত উপজাতির অন্ত্যেষ্টি শাস্ত্রাচারে ঢুকে পড়েছে। কান্না নয়, হাহাকার নয়, স্তবগান গেয়ে বিতানের পরপারের পথ নির্মাণ করছে একদল প্রাগৈতিহাসিক ফসিল মানুষ!
"থেমো না, থেমো না। শোকগাথা জারি রাখো, সারা রাত্রিদিন..." বিড়বিড় করে বলল বিশাখা।

পারিখ হাসপাতাল থেকেই সোজা অফিস চলে গেল। চটিতে কাঁকর ছিল বোধহয়, বিশাখা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে রাস্তার ধারের একটা চায়ের দোকানে বসল, পায়ের শুশ্রূষা করবে বলে। চায়ের দোকানের নড়বড়ে কাঠের বেঞ্চে বসে এক কাপ বিচ্ছিরি রকমের মিষ্টি চাও খেতে হল তাকে। নাঃ, কাঁকর-টাকর কিছুই পাওয়া গেল না, তবে সেই চায়ের দোকানে অবিশ্বাস্যভাবে বিশাখার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল নালকের বোনের।
প্রথমে মেয়েটিকে বিশাখা একেবারেই চিনতে পারেনি। প্রবল গরম চায়ে চুমুক দিয়ে জিভ পুড়িয়ে ফেলে বিশাখা রাগের চোটে তার ওড়না দিয়ে চেপে চেপে মুখ মুছে নিচ্ছিল। নিজের ওপরেই রাগ জমছিল তার। তাড়াহুড়ো করতে গেল কেন সে? তার তো এখন কোথাও যাওয়ার নেই। কিছুই করারও নেই! তা ছাড়া এই হতকুচ্ছিত চা-টাই বা সে নিয়েছে কেন? এই সব দোকানে সাত-আট বছরের শিশু-শ্রমিক জন্তুর মতো খাটে, এই সব দোকান ইট মেরে ভেঙে দেওয়া উচিত... চা খাওয়া মানে এই জঘন্য ও বেআইনি প্রথাকে প্রশ্রয় দেওয়া। কেন বসতে গেল এখানে সে? এখন পোড়া জিভে কোনও স্বাদ পাওয়া যাবে না... উঃ...
গনগনে চোখ নিয়ে সে বাঁদিকে তাকিয়ে দেখল একটা সুন্দর মতো মেয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ফরসা, রোগাটে, দেখেই বোঝা যায় আত্মবিশ্বাসের অভাব। ওমা! মেয়েটা তার দিকে তাকিয়ে দ্বিধাজড়ানো হাসি হাসছে কেন? বিশাখা ভ্রু তুলেছিল। এবার হঠাৎ মনে পড়ে গেল! আরে! এ তো নালকের বোন!
এর সঙ্গে, সেই কুচ্ছির মৃত্যুর দিনে দেখা হয়েছিল... সেদিন বিশাখা কথা বলার অবস্থায় ছিল না। কোনও কথা হয়নি নালকের বোনের সঙ্গে। আধা ঘুমের ঘোরে বিশাখা দেখেছিল মেয়েটি দেখতে সুন্দর। নালকের মতো গায়ের রং...মুখ চোখও কাটাকাটা।
সব কিছুতেই নালকের নাটক। বোনকে ডাকত 'নয়নের মণি' বলে। অথচ বোনের সঙ্গে তেমন কিছু যোগাযোগ ছিল এমনটা নয়। ফোনে মাঝেমাঝে মেসেজ বিনিময় করত, এই পর্যন্ত।
বিশাখা ভ্রু নামিয়ে বলল, "আরে! নয়নের মণি! কেমন আছ?"
গলাটা উঠে গিয়েছিল। এই অদ্ভুত শব্দবন্ধে অনেকেই ঘুরে তাকাল বিশাখা আর নালকের বোনের দিকে। নয়নের মণি হেসে বলল, "আমি ভাবলাম, তুমি আমায় চিনতে পারনি। ভাল আছ বিশাখাদি?"
"তা আছি...তা তুই? এখানে? তুই এখন কী করিস রে?"
"আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি বিশাখাদি। দুর্গাপুরে। শ্যাম্পুদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। শ্যাম্পুদি আমাকে পড়াতেন। এখন অবশ্য আর এখানে থাকেন না। বিদেশে থাকেন। শ্যাম্পুদি মানে হেমাঙ্গিনী নস্কর। ওই কবি বিতান বসুর স্ত্রী।"

"ওঃ! তাই বল! শ্যাম্পু! বাপস্! বেশ মজার নাম তো!"
বিশাখা নালকের বোনকে চোখ মেলে দেখছিল। চেহারায় ভিতু-ভিতু ভাব থাকলেও, হাবভাবে বেশ সাবলীল। মোটেও আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই। বিশাখা অনেক সময়েই ভুল দেখে। ভুল বোঝে।
নালকের সঙ্গে ওর বাড়ির যোগাযোগ আছে? বিশাখা জানে না। বিশাখা জানতেও চায় না। 'উত্তরে যদি তোমার উৎসাহ না থাকে, তাহলে প্রশ্ন কোরো না'—এই দর্শন মেনে চলে বিশাখা।
"শ্যাম্পুদি নর্থ বেঙ্গলের মেয়ে। জলপাইগুড়ির। চার বোন ওরা। সবার নামই অদ্ভুত। শ্যাম্পু, রিবন, খেলনা, লকেট। বিরাট ষ্টাগল করে বড় হয়েছেন। আমি ওনাকে আমার গুরু বলে মানি। উনিই আমায় শিখিয়েছেন জীবন মানে শুধু বড়-বড় কথা নয়, তার বেশি কিছু," একনাগাড়ে এত সব কথা বলে নয়নের মণি চুপ করে গেল।
বিশাখা মুগ্ধ হয়ে মেয়েটিকে দেখল। এ তো নালকের একেবারে উল্টো পিঠ! এত আলাদা ধরন এক পরিবারে হয়? "তোমার মা-বাবার সঙ্গে আমার কখনো আলাপ হয়নি। ওনারা হয়তো আমায় পছন্দ করেন না। ওনারা ভাল আছেন তো?"
মেয়েটি ভারী মিষ্টি হাসল। বলল, "তুমি কবে থেকে এমন ভদ্র হয়ে গেলে বলো তো? আমার মা-বাবাকে নিয়ে তোমার তো কোনও মাথাব্যথা থাকার কথা নয়। দাদার তো নেই। আমার বাবা-মায়েরও অবশ্য নেই। আমাদের পরিবারের সবাই খুব ছাড়া-ছাড়া। শুধু টাকার বশ ওরা। খুব টাকা ভালবাসে। তুমি অবশ্য এক পিস স্যাম্পেল দেখেছ।"
বিশাখা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। বলল, "টাকা? কী জানি! হবে হয়তো। তবে টাকা না-থাকাটা আরও খারাপ, বুঝলে নয়নের মণি।"
"আমাদের পরিবারের তো অনেক টাকা! টাকার অভাব নেই একদম। দাদাও কম রোজগার করে না। ব্যাচের পর ব্যাচ টিউশন দেয়। দামি ল্যাপটপ, দামি মদ, দামি সিগারেট। দাদা খুব বড়লোকি করতে ভালবাসে। তুমি বুঝতে পারনি?"
"বিতানদার ল্যাপটপটা কাউকে দেবেন না কিন্তু...ওনার শেষ লেখাগুলো যত্ন করে বের করা দরকার"
বিতানের নাম শুনে বিশাখা আর নয়নের মণি দুজনেই একসঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। নয়নের মণি স্মিত হেসে হেমাঙ্গিনীর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল "শ্যাম্পুদি..."
"ওমা, নয়নতারা! তুমি!"
"টিভিতে শুনলাম বিতান বসুর মৃত্যুর কথা। বলল তুমি আসছ, তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে, আজ তো বড়দিন, আমার ছুটি। তাই চলে এলাম।"
নয়নতারা। মেয়েটির নাম নয়নতারা। অদল বদল করে নালক সেটাকে করেছে নয়নের মণি! নালকের শব্দ-খেলা ভেবে বিশাখার মুখে হালকা হাসি ফুটে ওঠে। র‍্যাঁবো হতে চাওয়া নালক আজকাল টিউশানি করে বড়লোক হয়েছে! একে কি অধঃপতন বলে! কে জানে?
ভাবতে মজাই লাগছে বিশাখার। রাগ হয় না এতটুকু! বিশাখার এই রাগহীনতাও কি ইগোর লক্ষণ? তার বিজ্ঞানী প্রেমিক তো এমনটাই বলে থাকে। প্রেমিকের মুখ ভেবে, বিশাখার মুখের হালকা হাসি আর-একটু ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু প্রিয় কবির মৃতদেহ দান করে এসে, পোড়া জিভ নিয়ে একা-একা বসে হাসা মোটেই ভাল কথা নয়। তাই বিশাখা তার হাসিটা পোড়া জিভের ডগায় চালান করে দিল।
"আমি কাল জলপাইগুড়ি চলে যাচ্ছি, আজ রাতটা তাহলে তুই আমার সঙ্গে সল্টলেকের বাড়িতে থাক। রক্তিমও আসবে ওখানে। রক্তিম তোর কথা খুব বলে। ভালই হল তুই এলি। অনেক দিন পর...ভাল করেছিস এসে..."
"সল্টলেক? আচ্ছা।"
"রক্তিমের তো এখন কলকাতায় থাকার কথাই নয়! একটা কাজে আটকে গেছে তাই..."
"দিদি, ল্যাপটপটা মনে রাখবেন। আমার নাম দিব্য। বিতানদা আমায় খুব পছন্দ করতেন। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি। এই তো গত মাসে আমরা দিঘা ঘুরে এলাম। কত গল্প হচ্ছিল..."
হেমাঙ্গিনী ছেলেটিকে এবারও পাত্তা দিলেন না। বিশাখার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার চায়ের দামটা আমি দিই? বিতানের সঙ্গে এসেছ তুমি...এইটুকু না হয়..."
বিশাখা বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হেমাঙ্গিনী আরও কিছু বলছেন, কিন্তু ঘড়ঘড় করে ট্রাম চলে গেল, কথাটা শোনা হল না। বিশাখা দেখল হেমাঙ্গিনী সন্তর্পণে এক ফোঁটা চোখের জল মুছলেন চোখের কোণ থেকে। ততক্ষণে হাসপাতাল চত্বর থেকে কবির বন্ধুরা ছোট-বড় নানা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। তারা অবশ্য কেউই হেমাঙ্গিনীকে খেয়াল করল না। নিজেদের মতো ভিড়ে মিশে গেল। হেমাঙ্গিনী তাদের দেখছেন নির্লিপ্ত মুখে। আর বিশাখা দেখছিল হেমাঙ্গিনীকে।
ট্যাক্সিতে ফেরার সময় পারিখের ফোন পেল বিশাখা। পার্ক ষ্ট্রিটের ঠেকে ওরা সব জড়ো হচ্ছে বিতানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে।
"তুম ভি চলে এসো বিশাখা...লেট আস পে আওয়ার রেসপেক্টস টু দ্য ডিপার্টেড সোল।"
"বিতান ওয়জ আ মার্কসিস্ট। সোল-টোল বিশ্বাস করত বলে মনে হয় না।"
"আহা...ও না করুক। আমরা তো করি।"
"হুম! ইউ হ্যাভ আ পয়েন্ট ...দাঁড়াও আমায় আজ একবার মাসির বাড়ি টুঁ মারার কথা ছিল। সেটা ক্যানসেল করি।"
"করো, করো। লেট আস ড্রাউন আওয়ার সরোজ ইন স্পিরিট। এসো বিশাখা। আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।"
বিশাখা ট্যাক্সি ঘুরিয়ে নিল। পকেট থেকে ফোন বের করে বিশাখা কথা বলছিল তার প্রিয় মাসির সঙ্গে।
ধীরা সেই মুহূর্তে শ্মশানে ছিলেন, সমুদ্রের মৃতদেহ দাহ হওয়ার অপেক্ষায়।
"ধীরামাসি, তুমি বাড়িতে আছ?"
"না রে সোনা। আমি শ্মশানে।"
"অ্যাঁ! সে কী? কে? মানে..."
"শিবদাসের আত্মীয় রে। ইয়ং বয়। হি ওয়জ ওনলি থার্টি থ্রি। পরে কথা বলছি।"
"হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক আছে... শোনো আজ আমি আসছি না তোমার বাড়ি। পরে কথা বলব..."
বিশাখার মনটা একটু খারাপই হয়ে গেল। এত অল্পবয়সি কেউ মারা গেলে কেমন যেন লাগে। ফোন রাখার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রুং করে মেসেজ এল বিশাখার ফোনে। তাতে বিশাখার মন আরও এক ধাপ মেঘলা হল। বিজ্ঞানীর মেসেজ। সেমিনার শেষ। কিন্তু সঙ্গে বিদেশি ডেলিগেটরা আছে, তাই কথা হওয়া সম্ভব নয়। এর পর আছে ডিনারের ইনভিটেশন। ফিরতে রাত হবে। অর্থাৎ, এরপর ফোন কল, মেসেজিং, মেল কিছুই আর আসবে না হায়দরাবাদ থেকে।
এরপর বিতান অর নো-বিতান, ঠেকে গিয়ে মদ খাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে! ঠেকে পৌঁছল যখন বিশাখা, শোকপ্রস্তাব তখন সদ্য গৃহীত। আবেগে থরোথরো দু'-একটা ভাষণও হল, যার মূল বক্তব্য বিতান কত বড় মাতাল ছিল! কত রকমারি 'মদো-পরিস্থিতি'তে তার বন্ধুরা তাকে আবিষ্কার করেছে, সেই নিয়ে অনেক শ্রদ্ধাঞ্জলি আদায় করে নিল মৃত বিতান। এবং তারপরই সভার কাজ সমাপ্ত হয়ে গেল। সবাই গেলাসে ঢালিয়া দিল মন।
বিশাখার মন বসছিল না। সে উঠে পড়ল।

পারিখ তখন 'হাসান রাজার' গান নিয়ে কী সব বলছে এক মুগ্ধ বালিকাকে, বিশাখা পারিখের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "হাসন...হাসন...হাসান নয়!"
পারিখ মাতাল গলায় বলল, "বিতান আমায় এই কবির গান শুনিয়েছিল। খুব ভাল গান, খুব ভাল গান..."
পারিখ গান ধরতে পারে তার বেসুরো গলায় সেই ভয়ে ভীত হয়ে পড়ল বিশাখা। তাড়াতাড়ি বলল, "তুমি হেমাঙ্গিনীকে চেনো?"
"হেমাঙ্গিনী, মানে বিতানের বউ? ওই তো, আজই দেখলাম। কেন?"
"না এমনি জিজ্ঞেস করলাম। আর আমাদের বিশ্ব? তার কী খবর? সে সামলেছে? নাকি এখনও প্রাক্তনের শোকে কাহিল?"
"সামলেছে খানিক...কাল অফিসে আসবে বলেছে। সমুদ্রকে আমিও দেখেছি। হেবি লম্বা-চওড়া চেহারা। লোকটা মারা গেছে, স্যাড কেস, কিন্তু দেখে কেউ বলবে না ব্যাক ফায়ার কেস!"
"ব্যাক ফায়ার?"
"ওমা! জানো না লেসবিয়ানিজমের ফিল্মের নাম যদি 'ফায়ার' হয়, তাহলে..." বিশাখা তার গজদাঁত দেখিয়ে হেসে বলল, "ওঃ! বুঝেছি!"

সমুদ্রের মৃত্যুর পর ঋষিকার আচরণ তাকে এক লাফে বৈশিষ্ট্যহীন থেকে করে তুলল বিশেষ। একেবারে মামুলি একটি মেয়ের এমন উচ্ছ্বাসহীন শোক-প্রকাশ। কেউ তেমন ভাল চোখে দেখল না। তাকে নিয়ে শুরু হল কানাঘুষো ও বিস্ময়ের জল্পনা। রোগা, কালো ও বেঁটে মেয়ে, যে-কি না লটারি জিতেছিল এক এলেমদারকে বিয়ে করে, সে কী করে থাকে, স্বামীহারা হয়ে, এত সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ! ঋষিকার চারপাশ মেয়েটাকে গভীর উদ্বেগে মাপজোক করতে লেগে গেল। হিসেব যে মিলছে না! ঋষিকা নিজে ভয় পেল। সে নিজেও নিজেকে মাপছিল। আর অবাক হয়ে বুঝতে পারছিল, সমুদ্রের মৃত্যুতে তার তেমন গভীর কোনও শোকবোধ নেই। তা কি এই জন্য যে সমুদ্র তাকে লুকিয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখত! পুরুষ হোক বা নারী, সমুদ্র জড়িয়ে ছিল পরকীয়ায় এ নিয়ে তো সন্দেহ নেই! সে নিজে কত বার সমুদ্রর বিবাহ-বহির্ভূত প্রেম নিয়ে ভেবে কাহিল হয়েছে। যতক্ষণ তা ছিল কল্পিত, ততক্ষণ সে নিজেকে কত 'আহা-উহু' করেছে। অথচ এখন সেটা বাস্তব, অথচ তার কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। প্রতিপক্ষ নারী হলে সে কি 'যথাযথ' বিচলিত হত?
"তোমার কি মনে হয়, সমুদ্র তোমায় ঠকিয়েছে?" ধীরা গাড়ি চালাতে-চালাতে প্রশ্ন করলেন ঋষিকাকে।
ঋষিকা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমার সমুদ্রর জন্য মায়া হচ্ছে। মানুষ কী বেচারা বলো তো! সে জানে না তার ভবিষ্যৎ। ওই ব্যাগটা অন্যত্র সরিয়ে ফেলার সুযোগই পেল না বেচারা। তাহলে অন্তত নির্ভেজাল সচ্চরিত্র স্বামীর তকমাটা সেঁটে থাকত ওর গায়ে!"
ধীরা কিছু ভাবছিলেন। বললেন, "তোমার রাগ হচ্ছে না কেন ঋষিকা? তোমার অপমানিত লাগছে না?"
ঋষিকা মাথা নামিয়ে নিয়ে বলল, "আমার নিজেকে খুব মুক্ত আর স্বাধীন লাগছে ধীরাদি। তুমি বলেই কথাটা মুখ ফুটে বললাম। তুমি জান কি না জানি না, আমি ভীষণ কমপ্লেক্সে থাকতাম সমুদ্রকে নিয়ে। আর সমুদ্র এত সঠিক, এত সাচ্চা, এত আন্তরিক...আমার কেমন অবিশ্বাস্য লাগত! এত নিখুঁত কেন ও, ভাবতাম মনে মনে।"
"এখন কী মনে হচ্ছে? এই কলঙ্ক ওকে বিশ্বাস্য করে তুলেছে?"
"ঠিক অতটা সরল নয়। সমুদ্রর জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছে! শুধু শারীরিকভাবে মারা গেলে এক রকম হত...এমন দাগ নিয়ে চলে গেল...সুযোগ পেল না বেচারা ব্যাগটা সরিয়ে ফেলার। নিজের ট্যুর ব্যাগ ও নিজে গোছায় বলে আমার খুব অভিমান ছিল...এখন বুঝতে পারছি, কী ছিল তার কারণ!"
"তুমি একটু প্রাণখুলে কাঁদো ঋষিকা। তাতে স্বস্তি পাবে। এত চাপ মনের মধ্যে রেখো না। রুকু রয়ে গেল তোমার একার দায়িত্বে... সেটা ভুলে যেও না।"
"নাঃ, তা ভুলব কী করে? একদম ভুলিনি। যেমন ভুলিনি, পরোক্ষভাবে সমুদ্রর মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। সেদিন যদি বিশ্বমঙ্গল ক্লাবে না আসত, তাহলে বোধিরূপের সঙ্গে ওর অফিসে ওই শো-ডাউন হত না...ব্যাপারটা অফিসে ছড়িয়ে পড়েছিল। মান রাখতে সমুদ্র রিজাইন করেছিল অফিস থেকে...ত্বৈপায়ন আমায় সব বলেছে...বেচারা সমুদ্র...সমুদ্র সত্যিই বেচারা..."
"এসবের মধ্যে তোমার তো কোনও রোল নেই। তুমি নিজেকে দায়ী করছ কেন?"
"বোধিরূপ ওকে আল্টিমেটাম দিয়েছিল...আমায় সব জানিয়ে দেবে।"
"হ্যাঁ, সে তো জানি... তাতে কী?"
ঋষিকা যেন শুনতেই পেল না ধীরার কথা। অন্যমনস্ক গলায় বলল, "হ্যাঁ! হয়তো মৌখিক ধমক, কিন্তু সমুদ্র সামলাতে পারেনি। আমাকে ও বড্ড ভালবাসত।"
"তাতেও তোমার দায় নেই ঋষিকা। সব বিবাহিত মানুষই পরকীয়া লুকোতে চায়। এই যে আমার বোনঝি, বিশাখা, তোমার বন্ধু, যে নাকি বিরাট নারীবাদী...অথচ..."
ঋষিকা তার পুরনো বন্ধুর বিষয়ে ঢুকল না। নিজের সঙ্গেই কথা বলছিল সে, "বিশ্বমঙ্গলকে কেন সেদিন সমুদ্র এড়িয়ে যাচ্ছিল, আমি ধরতে পারিনি...আমি আবার ভাবছিলাম সমুদ্র লুকিয়ে কাউকে ফোন করছে! আমি যে কী বেচারা!"
"সমুদ্রকে একটু আগে বেচারা বলেছ। এখন নিজেকে বলছ? কে বেচারা, ঠিক করে ভেবে বলোতো!"
"দু'জনেই ধীরাদি...দুজনেই!"
"বিশ্বমঙ্গল জানত না তুমি সমুদ্রর বউ... সমুদ্র যে বিবাহিত তাই জানত না ও! সমুদ্রকে বেচারা ভাবাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল ঋষিকা। বেচারা তুমি।"
"বোধিরূপ আমাকে মেনে নিয়েছিল এক রকম...হয়তো বউ বলে। বউ ব্যাপারটা বোধহয় সেফ, তাই না? কিন্তু বিশ্বমঙ্গলকে ক্লাবে দেখে বোধিরূপের ধারণা হয়েছিল বিশ্ব সমুদ্রর টানে ক্লাবে এসেছে...হিংসুটে, বিপন্ন, বেচারা বোধিরূপ। প্রেমিকরা যে কী বেচারা!"
ধীরা বড় করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "তোমার ভোকাবুলারিতে বেচারা ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই মনে হচ্ছে!"
"আমি খুব সাধারণ, ধীরাদি। তোমার মতন ব্যক্তিত্ব বা মনের জোর কিছুই নেই আমার। কমপ্লেক্সের জন্যই বোধহয় আমি ভাল মিশতে পারি না কারও সঙ্গে। একা-একা থাকি, একা-একা ভাবি অনেক কিছু। সেই সব ভাবনাগুলোই তোমার সঙ্গে শেয়ার করছি...তোমাকে ইমপ্রেস করতে নয়... তোমার মতন করে কেউ আমার কাছে কিছুই জানতে চায়নি এই দু'দিনে। হয় সহানুভূতি দেখিয়েছে বা এড়িয়ে গেছে..."
"তুমি সমুদ্রকে মিস করছ না?"
"করছি তো...কিন্তু নির্ভেজাল মিস করা যাকে বলে, সেটা হচ্ছে না...বিচার এসে পড়ছে। মনে হচ্ছে ওই যে সমুদ্র সব সময় বড্ড কারেক্ট ব্যবহার করত সেটা ছিল ভণ্ডামি...সন্দেহের উর্ধ্বে থাকার ছল...এভাবে একটা লোককে বিচার করা কি ঠিক? তুমি বলো? বিশেষত ও যখন নেই, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য।"
ধীরা চুপ করে গাড়ি চালালেন কিছুক্ষণ। বোধিরূপকে নার্সিংহোম থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। তার বাড়িতে ধীরা চলেছেন এখন ঋষিকাকে নিয়ে।
"তুমি ভালবাসতে তো সমুদ্রকে। ভালবাসতে না?"

"উত্তরটা খুব জটিল। এত দিন মনে-মনে জেনে এসেছি, সমুদ্রকেই আমি ভালবাসি, সমুদ্রকে ছাড়া বাঁচবই না...মনে-মনে চাইতাম সমুদ্র আমায় একদম গ্রাস করে নিক, যাতে আমি ভুলে যাই আমার কমপ্লেক্স ...লজ্জা...দ্বিধা ...আর এখন..."
"কী? এখন কী?"
"জানো ধীরাদি...আমি আজকাল মুখ খুলতেই ভয় পাই..."
"বলো, বলো, বলে হাল্কা হও। কথাই হোক তোমার কান্নার ফোঁটা।"
"জানো ধীরাদি... আমি খুব কল্পনাপ্রবণ মানুষ। ছোট থেকেই। বাস্তবটা যাদের সাদামাটা, তারা হয়তো এমনটাই হয়। তেমন বন্ধু-টন্ধু আমার কোনও কালেই ছিল না। সমুদ্রর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পরে, চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম আমি প্রায় লটারি জিতে গেছি। তখন শুরু হল এক অন্য রকম কল্পনার জগতে পালিয়ে যাওয়া।"
"তোমার লেখালিখি?"
"একদম না। আমি যা নই, তা হয়ে ওঠার চেষ্টা! সমুদ্রর মনের মতন হওয়ার চেষ্টা! আমি নিজে কী চাই, তাই যেন ভুলতে বসলাম! ভাল বউ, ভাল মা, ভাল পুত্রবধূ...এই যে এতগুলো নাটকের রোলে অভিনয় করা এও কি এক ধরনের কল্পনার রাজ্যে বিচরণ নয়? সেটা যত বুঝতে পারতাম, তত আমার ফেলে আসা অতীতকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করতাম। সে যে কী কষ্ট! সেই প্রচেষ্টাতে সমুদ্র আর রুকুকেও অকারণ টেনে নিয়ে গেছি জলপাইগুড়ির বাড়ি দেখতে বা পাইস হোটেলে খেতে! এ সব আমার কমপ্লেক্স। নিজেকে বোঝানো আমি অতীত ভুলিনি! অথচ আমার সাদামাটা, ধুলোমাখা অতীত এখন আর আমার বাস্তব নয়! তাহলে, এখন যে সব পেয়েছির দেশে বেঁচে আছি, সেটাই কি আমার বাস্তব? তাও তো নয়! এই ভজকট টানাপোড়েন থেকে সমুদ্র আমায় মুক্তি দিয়ে গেল ধীরাদি...এটাই সত্যি। সমুদ্রর জন্য আমার আরও অনেক কাঁদা উচিত ছিল। কিন্তু আমি আর কল্পনার নাটকে অভিনয় করতে পারব না ধীরাদি..."
"তুমি কী বলতে চাইছ ঋষিকা? স্বামীর মৃত্যু না হলে স্ত্রী তার আইডেনটিটি খুঁজে পাবে না?"
"যাঃ! আমি কখন এ কথা বললাম? আমার সমস্যা একান্তই আমার নিজস্ব! আমার বড্ড বেশি ভাল বিয়ে হয়েছিল ধীরাদি, অতটা উচিত হয়নি! বিয়ে হওয়া উচিত সমানে-সমানে। বিদ্যে, মেধা, রূপ, টাকা। সবের সামঞ্জস্য থাকা চাই, আমি মনে মনে চিরকাল সমুদ্রের কাছে হেরে বসে ছিলাম। হেরো মানুষ কি আর সুখী হয়?"
ধীরা মনে-মনে চমৎকৃত হচ্ছিলেন। এই মেয়েটিকে তিনি যতটা সরল, সাদামাটা ভেবেছিলেন, এ বোধহয় তা নয়। খুব নতুন কথা কিছু বলছে না। কিন্তু গড়পড়তা মেয়ে হলে এ সব ভাবনা এর মাথায় আসত না।
"কিছু যদি মনে না করো, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তোমার কী মনে হয়, সমুদ্রর ডুয়েল লাইফ যদি তোমার গোচরে না আসত, তাহলেও এতটা স্পষ্ট করে তুমি ভাবতে পারতে?"
"কী হলে কী হত জানি না। তবে সমুদ্রের পরকীয়াও আমি এক সময় কল্পনায় দেখেছিলাম, জান? আমার মনে হয়েছিল, অমন একটা কিছু হলে বেশ হয়, আমি তাহলে সেই পরকীয়ার আয়নায় দেখে নেব আমাদের সম্পর্কটা। খুব কাঁদব, খুব কাঁদব। আহারে, বেচারা ভাবব নিজেকে, বেশ হবে। আমার বোধহয় সন্দেহ ছিল মনের গভীরে সমুদ্রের পরকীয়া থাকতে বাধ্য। আমার মতন এলেবেলেতে ও এত দিন মজে থাকতে পারেই না। কী করুণ আর অসুস্থ ভাবনা, তাই না ধীরাদি?"
"এখন তো জেনে গেছ ওর পরকীয়ার কথা, তো এখন খুব কাঁদছ না কেন ঋষিকা। বোধিরূপ পুরুষ বলে?"
"কাঁদব, কাঁদব। দেখো, একদিন ঠিক কাঁদব। এখন কেমন নিশ্চিন্ত লাগছে জান? মনে হচ্ছে আমার অ্যাসেসমেন্ট ভুল নয়। যেদিন নিজেকে আবার পুরোপুরি খুঁজে পাব, সেদিন দেখো সমুদ্রের জন্যেই সব চেয়ে বেশি কাঁদব।"

বোধিরূপের ফ্ল্যাট কলকাতার নতুন গজিয়ে ওঠা অভিজাত পাড়ায়। সতেরো তলার ওপর। লিফটে ওঠার সময় ঋষিকার মনে পড়ে গেল নার্সিংহোমের লিফটের স্মৃতি। রিসেপশনের ধার ঘেঁষে অক্লান্ত ওই যন্ত্রটি উঠে যাচ্ছিল বা নেমে আসছিল যতিবিহীন। তার সঙ্গে কত আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বস্তি বা শোক সংবাদ। লিফটের দরজা খুলছিল আর ছুটে-ছুটে যাচ্ছিল অসহায়, উৎসুক, উদ্বিগ্ন বেচারা মানুষ।
বেচারা! ধীরা ঠিকই বলেছেন। আজ ঋষিকার ভোকাবুলারিতে বেচারার কিছু আধিক্য।
ডক্টর নেমে এসে জানালেন, "আয়্যাম সরি... সমুদ্র এক্সপায়ার্ড অন দ্য অপারেটিং টেবল।"

এই সাতদিনে বোধিরূপ যেন কেমন রোগা আর কালো হয়ে গিয়েছে। ওর ঘরের সব জানলা খোলা। উঁচুতে বলেই হু-হু করে উত্তুরে বাতাস ঢুকে ওর বেড়ে ওঠা অবিন্যস্ত চুল এলোমেলো করে দিচ্ছে। ঋষিকাকে দেখে বোধিরূপের ঠোঁট কাঁপতে লাগল। লাল চোখ উপচিয়ে উঠল জলে। ধীরা বিছানার লাগোয়া সোফায় বসলেন। ঋষিকা ঘরের লাগোয়া বারান্দার দরজায় হেলান দিয়ে।
"মাটিতে বসলে কেন ঋ?"
"আমার ভাল লাগে বোধিরূপ।"
বোধিরূপ আধশোয়া হয়ে বসেছিল। কোলের ওপর ল্যাপটপ। সেটা শাট ডাউন করতে করতে বলল, দ্বৈপায়ন তোমার কাছে যাবে। মে বি হি হ্যাজ় সামথিং টু অফার। ওর ডিউক্সের ব্যাপারটা আমিই দেখছি। দিন পনেরোর মধ্যে চেক তৈরি হয়ে যাবে।"
"অফার মানে? চাকরি?"
"হুম..."
"আমি চাকরি চেয়েছি নাকি? এটা কি কমপ্যাশন না কমপেনসেশন?"
"বোধহয় দুটোই। তুমি চাকরি করবে না? রুকুর তো ভবিষ্যৎ আছে। তোমার ওই আনসার্টেন লেখালেখি, তাতে কী এমন... মানে বলছিলাম যে... তুমি সারা জীবন ওই সব ছাইভস্ম ইয়ে..."
"আমি এসব আলোচনা করতে তোমার কাছে আসিনি বোধিরূপ।"
বোধিরূপ এই প্রথম হাসল। প্রাণহীন হাসি।
"জানি। সেই জন্যই তো এসব আলোচনা করছি। আই কান্ট ফেস ইউ ঋষিকা।"
"লজ্জা পাচ্ছ? পেও না। দরকার হলে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকো। আমার দিকে তাকাতে হবে না। কিন্তু আমি শুনতে চাই তোমাদের সম্পর্কের কথা। তোমরা তো সমান ছিলে বিদ্যায়, মেধায় বুদ্ধিতে। সেই সমান-সমান সম্পর্কের কথা বলো আমায়।"
বোধিরূপ চমকে গেল। 'সমান-সমান' সম্পর্ক কথাটা তাকে ভোঁতা যন্ত্রের মতন আঘাত করে। 'সমান' বা 'অসমান', এটাই কি বিবেচ্য এখন? এই মুহূর্তে? যখন সমুদ্র মৃত আর সে ও সমুদ্রের স্ত্রী মুখোমুখি?
বোধিরূপ এতটা আশা করেনি। এই রোগা কালো আর সাদাসিধে মেয়েটিকে নিয়ে তার মায়া ছিল। একে সে কোনও দিন হিংসে করেনি। সমুদ্র তেমন কোনও সুযোগ দেয়নি একে হিংসে করার। সমুদ্র এই মেয়েটিকে ভালবাসত বলে তার ভালবাসায় কিছু কম পড়েনি কোনও দিন। সে আর সমুদ্র সব অর্থে ছিল সহধর্মী। তার কারণ কি এই 'সমান-সমান' সম্পর্ক!
ঋষিকা শান্ত হয়ে বসে বোধিরূপকে দেখছিল। এই পুরুষ-পুরুষ দেখতে লোকটা

তার স্বামীর প্রেমিক? না প্রেমিকা?
"আমি তোমাদের যৌনতা বিষয়ে কিছু জানতে চাই না। আমি শুনতে চাই তোমরা তোমাদের সম্পর্কে কতটা সমকক্ষ ছিলে!"
"সমকক্ষ! সমান-সমান। কী জানি! এভাবে তো ভাবিনি! সম্পর্কে সমান থাকা না থাকাটা কি কোনও বিষয়..." বোধিরূপ কথা শেষ করতে পারল না। সে মাথা নামিয়ে নিয়ে বসে রইল।
"ধীরাদিকে তো আমি ভাল চিনতামই না। কেমন দূরের মানুষ মনে হত। শক্তপোক্ত। কষ্ট পেলে কাঁদেন কি না জানা নেই। রেগে গেলে হাত পা ছোড়েন? কে জানে? মনের ভাব গোপন করতে আমিও পারি, কিন্তু ধীরাদির মতন আত্মবিশ্বাসী কাউকে আপন মনে হয় না। কেমন ভয়-ভয় করে। অথচ তোমাকে বোধিরূপ, আমার বরং অনেক কাছের মনে হত। একটু বেশি-বেশি ভাল লাগত যেন। ইদানীং তোমার সামনে গেলে একটু যেন অস্বস্তিই হত, মনে হত, আমি কি তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছি? সমুদ্রকে, অজান্তেই ঠকাচ্ছি না তো? যে কোনও পার্টিতে গেলে চোখ আগে তোমায় খুঁজত। তোমাকে দেখলে তবে নিশ্চিন্ত। সমুদ্র কি কখনও সেটা খেয়াল করেছিল? কে জানে? সমুদ্র হয়তো আমায় সেভাবে লক্ষই করেনি কখনও। নয়তো খেয়াল না-করার কথা নয়। অথচ সমুদ্রই ছিল আমার সবটুকু। আসলে কী জান, যতই ভালবাসি সমুদ্রকে নিয়ে আমার কমপ্লেক্স ছিল। ভগবান, হ্যাঁ ভগবান মনে হত ওকে! অমন রূপ, অমন গুণ। একেবারেই টালহীন, নিখুঁত পুরুষ! আর আমি? তুমি বুঝবে না বোধিরূপ। আমার অবস্থানে না থাকলে তুমি বুঝবেই না সমান-অসমানের সমস্যা।"
ঋষিকা হঠাৎ চুপ করে গেল। ঘাড় হেলিয়ে কী যেন দেখল। কথা হাতড়াচ্ছে সম্ভবত। বোধিরূপ তার বাঁ হাতটা দিয়ে মাথার চুল খামচে ধরে বলল, "তোমায় আমি সব বলব ঠিক করেছিলাম। সেই নিয়েই সেদিন সমুদ্রর সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটি। আমায়, আমায় চড় মেরেছিল সমুদ্র সেদিন। তারপর অফিস ছেড়ে বেরিয়ে গেছিল। এত উত্তেজিত ওকে এর আগে কখনও দেখিনি। আমি...আমিই সমুদ্রর মৃত্যুর জন্য দায়ী ঋষিকা। আর আমাকেই তুমি অবলম্বন করতে চেয়েছিলে?"
যেন দীর্ঘদিন ধরে রাখা শ্বাস ফেলল ঋষিকা। অদ্ভুত ক্লান্তি আর হাল ছাড়া কণ্ঠে বলল, "চেয়েছিলাম বললে ভুল হবে বোধি। আমায় অনেক কিছু জানতে হবে বোধি। তোমাকে অবলম্বন না-করা ছাড়া যে আর আমার কোনও উপায় নেই।"
ঘরে আলো কমে আসছিল। সেই নিভু-নিভু আলোয় ধীরা দেখলেন, মুখোমুখি বসে আছে দুটো পুড়ে যাওয়া মানুষ। ধীরার হঠাৎ মনে হল, আপাতত ওরা শুধুই দুটো শোকবিধ্বস্ত মানুষ। সমুদ্রকে মাথায় রাখলে ওর হয়তো প্রতিপক্ষ। কিন্তু সমুদ্র যখন নেই, তখন সমুদ্রের পরিপ্রেক্ষিতও নেই। অনেক তফাত দু'জনের মধ্যে। তার মধ্যে প্রধান, ওদের লিঙ্গভেদ। কিন্তু সে সবের উর্ধ্বে উঠে বন্ধু হতে তবু ওদের কোনও বাধা নেই। কথা বলুক ওরা। শুনুক একে অন্যের প্রেম আর জীবন বিষয়ে উপলব্ধি।
"কথা...কথা...কথা...কথায় কিছু প্রকাশ হয় না ঋষিকা। দেখবে পুরোটা শোনার পরেও তোমার মনে হবে তুমি কিছুই শোনোনি! এসো ঋষিকা, আমরা বরং একটু প্রাণখুলে কাঁদি এসো।"
ঋষিকা মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে এল বোধিরূপের পাশে। আর ধীরা বাক্‌রহিত হয়ে দেখলেন ঋষিকার বুক মোচড়ানো কান্না।
এই কান্না কাঁদাতে তাকে কত চেষ্টা করতে হয়েছে গত সাতদিন। কই, এভাবে তো ঋষিকা একবারও কাঁদেনি এর আগে। কী অবিশ্বাস্য আর পবিত্র এ দৃশ্য। কী মায়াময়।
বোধিরূপ আর ঋষিকা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে চলে, কেঁদেই চলল। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থানের বা প্রেমের প্রেক্ষিতের উর্ধ্বে, লিঙ্গচিহ্ন বিভেদের তোয়াক্কা না করা এ পবিত্র কান্না। এই কান্না যাঞ্চা করে না কোনও সান্ত্বনাবাক্য।
ধীরা চোখ মুছে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

***

বিশাখার বিজ্ঞানী প্রেমিকের বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে। সুলক্ষণা ও শান্ত, উজ্জ্বল, শ্যামবর্ণা সে মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কার্ড বিলি করতে আজ বিজ্ঞানী এসেছিলেন বিশাখার কলেজে।
বিশাখাকেও নেমন্তন্ন করেছেন বিজ্ঞানী। বিশাখা সবার অলক্ষ্যে বিজ্ঞানীকে জানিয়েছে, বিয়েতে কিছু হেরফের হবে না। সে বিজ্ঞানীকে যেমন ভালবাসে, তেমনই এর পরেও ভালবেসে যাবে!
"হোয়াটস ইন আ ম্যারেজ?" প্রশ্ন রেখেছে বিশাখা, সিগারেটের ধোঁয়া গিলে নিতে-নিতে।
কলেজ চত্বর ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে বিজ্ঞানী তাঁর সব চেয়ে সেক্সি হাসিটা হেসে বলেছেন, "আমিও... আমিও প্রতিটা দাম্পত্য-মুহূর্তে তোমার কথা ভাবব বিশা। তুমিই আমার আত্মাসঙ্গী। বিশ্বাস করো।"

***

ঋষিকার বাল্যকালের 'শ্যাম্পু'। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রফেসর 'হেমাঙ্গিনী নস্কর'। ইস্তাম্বুলের কৃষক সভার সদস্যা 'ন্যাসক্যার'। বিতান বসুর 'হেমা-ধরম'। টুকরো-টাকরা তথ্যের ভিত্তিতে ধরে নেওয়া যায়, এরা প্রত্যেকেই আদতে একটি মানুষ। যেমন ধরে নেওয়া যায়, বাউন্ডুলে রক্তিম, ঋষিকার সেই শক্তি চট্টজো-আওড়ানো বাল্যপ্রেমিক। ঋষিকার ইচ্ছে থাকলেও শ্যাম্পুর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন হয়ে উঠল না। সমুদ্রর আচমকা প্রয়াণ তার একটা কারণ। তার চেয়েও বড় কথা, জো-লো বা চিরদীপ, কেউ তেমন গা লাগালো না বিষয়টিতে। আমাদের জীবনের বেশির ভাগ যোগাযোগগুলোই নিয়তি নির্ধারিত। হয়তো অন্য কোনও ঘটনার হাত ধরে শ্যাম্পু আর মিঠুর দেখা হবে অন্য কোনও নগর, অন্য কোনও যৌবনের ভুবনডাঙার মাঠে!
একটুর জন্য কত কিছু হয় না।
শ্যাম্পুর সঙ্গে যোগাযোগ হলে হত না কি ঋষিকার রক্তিমের সঙ্গে দেখা?
তারপর রক্তিমের কুমির শিকারের গল্প।
নাঃ, সেসব কিছুই হয়নি।
শ্যাম্পু সময় মতো ফিরে গিয়েছে ইস্তাম্বুলেই। এখন সেখানে গভীর রাত।
'ক্যাফে কনস্ট্যানটিনেপোল' নামের একখানা গোপন ঠেকে বসে হেমাঙ্গিনী এখন ব্যস্ত মিশরের গৃহযুদ্ধ সংক্রান্ত একটা লেখা নিয়ে। লেখাটা শেষ করে সে অন-লাইন হবে।
কী মনে হল লেখার শেষে বিতানের লেখা কবিতার লাইন ঢোকাবে বলে ওর শেষ কাব্যগ্রন্থটি খুলল হেমাঙ্গিনী।
ওই যে বিতানের হেমা-ধরম এক হাতে কফির কাপ, একটু ঝুঁকে পড়ে চোখ কুঁচকে পড়ছে বিতানের কবিতা...নরম কোঁকড়া চুলে ক্যাফের মিটমিটে আলো এসে পড়েছে মুখে। অদ্ভুত মায়া আর কৌতুক নিয়ে ওই মেয়ে এখন বিতানের কবিতায় নিবিষ্ট।
হেমা বইটা বন্ধ করল।
নাঃ, বিতান নয়। তার লেখার শেষ লাইন হোক, 'কার মিলন চাও বিরহী!'

অলংকরণ: দেবাশিস দেব